সিডনি শেলডন

রেজ অভ অ্যাঞ্জেলস

অ নু বা দ অনীশ দাস অপু



রেজ অভ অ্যাঞ্জেলস সিডনি শেলডনের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সাড়াজাগানো উপন্যাসগুলোর একটি। এ গল্পের নায়িকা জেনিফার পার্কার নি:সন্দেহে শেলডনের অন্যতম সৃষ্টি। সুন্দরী, বুদ্ধিমতি এবং অপ্রতিরোধ্য জেনিফার উঠে এসেছে এক ধ্বংসস্তূপ থেকে। সে পেশায় উকিল। ওকালতি করার প্রথম দিনেই এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয় জেনিফার যা তার গোটা জীবন বদলে দেয়। দুই প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ভালোবাসেন জেনিফারকে। তাঁদের একজন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, অপরজন দুর্ধর্ষ এক মাফিয়া সর্দার। জেনিফারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে প্রেম-দ্বন্দ্ব-সংঘাত-ষড়যন্ত্রের এক আশ্চর্য গতিশীল কাহিনী। যা পাঠককে ধরে রাখে চুম্বকের মত!

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেসকে* নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে—*দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট, ব্লাড লাইন, রেজ অভ এঞ্জেলস, ইফ টুমরো কামস, দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, মাস্টার অব দ্য গেম, দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস, মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

ISBN 978 984 90661 8 7

সিডনি শেলডনের ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার

রেজ অভ অ্যাঞ্জেলস

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

 অনিন্দ্য প্রকাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৯, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১৮০৮২৫৪৫

অক্ষর বিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

REGE OF ANGELS by sidney Sheldon
TRANSLATED BY ANISH DAS APU
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1 Ka Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2009
Second Print : February 2013

Price : Taka 300.00
US $ 15

ISBN 984-70082-0062-6

উৎসর্গ

রোকসানা নাজনীন
এক সময় যার লেখার দারুণ ভক্ত ছিলাম আমি।
এখনও আছি। তবে আফসোস–
প্রবাসী এই লেখিকা লেখার দারুণ শক্তিশালী
একটি হাত থাকা সত্ত্বেও ইদানিং লিখছেন না।
আমরা খুব মিস করছি তাঁকে!

ভূমিকা

'রেজ অভ অ্যাঞ্জেলস' সিডনি শেলডনের সর্বাধিক জনপ্রিয় থ্রিলারগুলোর একটি। জেনিফার পার্কার নামে চব্বিশ বছরের এক তরুণীর জীবন সংগ্রাম এবং প্রেম অসাধারণ দক্ষতায় উঠে এসেছে এ বইতে। শেলডনের উপন্যাসগুলোতে যা হয়–শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনার কোনও ঘাটতি নেই এ বইতেও। পাঠক *'রেজ অভ অ্যাঞ্জেলস'* পড়ার সময় নানান অনুভূতিতে সিক্ত হবেন। শংকা এবং টেনশন ঘিরে থাকবে আপনাকে, চোখে জল চলে আসবে জেনিফারের ছয় বছরের ছেলে যোশুয়ার করুণ-মৃত্যুতে। বইয়ের প্রতিটি পরিচ্ছেদে রয়েছে দারুণ সব চমক। তবে বিশাল আকারের বইটি খানিকটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। পুরো বইয়ের অর্ধেকেরও বেশি জুড়ে রয়েছে আদালত এবং মামলা সংক্রান্ত নানান ঘটনাবলী। পাঠকের বিরক্তি লাগতে পারে ভেবে অনাবশ্যক কিছু বর্ণনা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। তবে এতে মূল বইয়ের রস কোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি বলেই আমার ধারণা। আশা করি *'রেজ অভ অ্যাঞ্জেলস'* শেলডনের অন্যান্য বইগুলোর মতই পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

অনীশ দাস অপু
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

এক

নিউইয়র্ক : সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৬৯

হত্যার জন্য ক্রমে কাছিয়ে আসছে শিকারিরা।

দু হাজার বছর আগে রোমে, প্রতিযোগিতা মঞ্চস্থ হতো সার্কাস নেরোডিস বা কলোসিয়ামে। যেখানে ক্ষুধার্ত সিংহের দল রক্ত আর বালুর ফেনার মাঝে দাপিয়ে বেড়াত শিকারকে, ধারালো দাঁত এবং নখের আঘাতে ফালাফালা করে ফেলার উদগ্র কামনায় থাকত অস্থির। কিন্তু এটি বিংশ শতাব্দী, সার্কাসটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যানহাটানের ক্রিমিনাল কোর্ট বিল্ডিং-এ, ১৬ নাম্বার আদালত কক্ষে।

Suetonius-এর জায়গায় বসেছে এক কোর্ট স্টেনোগ্রাফার, সে বংশকুলুজির রেকর্ড রাখছে। উপস্থিত রয়েছে প্রেসের ডজনখানেক সদস্য এবং ভিজিটরের দল। তারা পত্রিকার পাতায় মার্ডার ট্রায়াল পড়ে আদালতে এসেছে। এদের অনেকেই সকাল সাতটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল কোর্টরুমে বসার একটু জায়গা পাবার জন্য।

শিকারির লক্ষ্যবস্তু মাইকেল মোরেত্তি চুপচাপ বসে আছে টেবিলে। সে বেশ সুদর্শন, বয়স ত্রিশ/বত্রিশ। লম্বা, রোগা মুখখানায় বেড়ালসুলভ রমণীয় একটা ভাব আছে। তার কুচকুচে ঘন কালো চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, থুতনিতে গভীর একটি ভাঁজ, চোখের রঙ কালো। তার পরনে চমৎকার ছাঁটাইয়ের ধূসর রঙা সুট, হালকা নীল শার্ট, গভীর নীল টাই এবং পায়ে চকচকে দামি জুতো। চোখজোড়া শুধু কোর্টরুমের চারপাশে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়া মাইকেল মোরেত্তি সম্পূর্ণ স্থির, একদম নড়াচড়া করছে না।

যে সিংহটি ওকে হামলা করছেন তিনি রবার্ট ডি সিলভা, কাউন্টি অভ নিউইয়র্কের ভয়ংকর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। ভদ্রলোক একমুহূর্তের জন্যও কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। যেন সারাক্ষণ অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে শ্যাডো বক্সিং করে চলেছেন। লম্বায় খাটো তিনি, তবে বেশ গাটাগোট্টা শরীর, মাথার চুলে ক্রুকাট ছাঁট। ডি সিলভা যৌবনে যে বক্সিং লড়তেন তার সাক্ষ্য বহন করছে নাক এবং মুখের কাটা দাগ। একবার বক্সিং লড়তে গিয়ে তিনি এক লোককে মেরে ফেলেন। এ নিয়ে

কখনও মন খারাপ কিংবা আফসোস করেননি। তবে এখনও তিনি করুণা প্রদর্শন করতে শেখেননি।

রবার্ট ডি সিলভা প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী একজন মানুষ যিনি বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছেন টাকাপয়সা কিংবা অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই। ওপরে তিনি দেখান জনগণের সেবক কিন্তু অভ্যন্তরে তিনি একজন অশ্লীল যোদ্ধা যে কখনও কিছু ভোলে না কিংবা কাউকে ক্ষমাও করে না।

সাধারণ কোনও ঘটনা হলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ডি সিলভা আজ কোর্টরুমে হাজির থাকতেন না। তিনি রাঘব বোয়াল, তার যে-কোনও সিনিয়র সহকারীই এই কেস চালানোর যোগ্যতা রাখে। কিন্তু সবাই জানে ডি সিলভা শুরু থেকেই মোরেট্টিকে এক হাত দেখে নেয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। অবশেষে সেই সুযোগ এসেছে।

মাইকেল মোরেট্টি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার খবর। সে পুবের সবচেয়ে বড় পাঁচটি মাফিয়া পরিবারের প্রধান অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লির জামাই। অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লির বয়স বাড়ছে। শোনা যায়, মাইকেল মোরেট্টি শ্বশুরের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে গড়ে তুলছে। মোরেট্টির বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে খুন এরকম ডজনখানেক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তবে কোনও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তার বিরুদ্ধে আজতক কোনও কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। মোরেট্টির সঙ্গে রয়েছে একঝাঁক ক্ষুরধার উকিল, যারা তাঁর আদেশ পালন করে অক্ষরে অক্ষরে। ডি সিলভা নিজে তিনটি ব্যর্থ বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মোরেট্টির বিরুদ্ধে প্রমাণ আনার জন্য। তারপর হঠাৎ করেই তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।

ক্যামিল্লো স্টেলা, মোরেট্টির সোলদাতি বা অনুচর ডাকাতি করার সময় হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পুলিশ হাতেনাতে তাকে গ্রেফতার করে। নিজের জীবন রক্ষার বিনিময়ে গান গাইতে রাজি হয়েছে স্টেলা। এমন সুন্দর সংগীত ডি সিলভা জীবনে শোনেননি, এ গান পুবের সবচেয়ে প্রভাবশালী মাফিয়া-পরিবারকে নতজানু হতে বাধ্য করবে, মাইকেল মোরেট্টির জন্য ইলেকট্রিক চেয়ার হবে অনিবার্য। আর এর বিনিময়ে আলবানিতে গভর্নরের অফিসে প্রবেশ ঘটবে ডি সিলভার। নিউইয়র্কের অন্যান্য গভর্নররা হোয়াইট হাউজেও যেতে পেরেছেন। এদের মধ্যে আছেন মার্টিন ভ্যান কুরেন, গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড, টেডি রুজভেল্ট এবং ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট। ডি সিলভা আশা করছেন এর পরে তিনি ওই সারিতে দাঁড়াতে পারবেন।

সময়টিও যথার্থ। প্রাদেশিক গভর্নর ইলেকশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী বছর।

ডি সিলভাকে এ মামলায় নিয়ে এসেছেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পলিটিক্যাল বস্। 'এ কেসে তুমি যে পরিমাণ পাবলিসিটি পাবে, তোমার নমিনেশন

কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তারপর তুমি হবে নির্বাচিত গভর্নর, ববি। নেইল মোরেট্টি এবং তুমি আমাদের ক্যান্ডিডেট।'

রবার্ট ডি সিলভা কোনও ঝুঁকি নেননি। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি মাইকেল মোরেট্টির বিরুদ্ধে মামলা সাজিয়েছেন। তিনি তাঁর সহকারীদের প্রমাণ সংগ্রহের কাজে লাগিয়েছেন, সুতোর ফাঁসে কোথাও আলগা গেঁরো আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এবং ফাঁসগুলো শক্ত করে বেঁধেছেন মোরেট্টির উকিল বৈধ কোনও উপায় আবিষ্কার করে যাতে তার বস্‌কে বাঁচাতে না পারে, সে রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছেন ডি সিলভা। এক এক করে বুজিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিটি গর্ত।

জুরি নির্বাচনে প্রায় দু'হপ্তা সময় লেগেছে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি 'স্লেয়ার টায়ার' বা বিকল্প জুরি সদস্য নির্বাচনে গোঁ ধরেছিলেন। যেসব মামলায় গুরুত্বপূর্ণ মাফিয়া ব্যক্তিত্ব জড়িত সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় জুরি সদস্যরা অদৃশ্য হয়ে যায় কিংবা অব্যাখ্যাত ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আর মামলায় হাজির হতে পারে না। কিন্তু ডি সিলভার এই জুরিকে শুরু থেকেই সবার কাছের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে, তাকে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে যার কথা কেউ জানেও না। কিংবা ওখানে প্রবেশ করার ক্ষমতাও কারও ছিল না।

মাইকেল মোরেট্টির এই মামলার চাবি হলো ক্যামিল্লো স্টেলা। ডি সিলভার রাজ সাক্ষীর জন্য নেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রবার্ট ডি সিলভা নিজে ক্যামিল্লো স্টেলার জন্য রক্ষী নির্বাচন করেছেন। বিচার শুরুর আগে স্টেলাকে প্রতি রাতে বিভিন্ন লোকেশনে সরিয়ে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন, বিচার যখন শুরুর পথে, স্টেলা আছে নির্জন একটি কারা-প্রকোষ্ঠে, তার চারজন সশস্ত্র ডেপুটি পাহারা দিচ্ছে। তার কাছে কারও যাওয়া নিষেধ। স্টেলা রাজসাক্ষী দিতে রাজি হয়েছে কারণ তার বিশ্বাস মাইকেল মোরেট্টির প্রতিহিংসা থেকে ডি সিলভাই একমাত্র তাকে রক্ষা করতে পারবেন।

আজ বিচারের প্রথম দিনের সকালবেলা।

বিচারে আজ জেনিফার পার্কারের প্রথম দিন। সে প্রসিকিউটর টেবিলে অপর পাঁচজন তরুন সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে বসেছে। তারা সবাই আজ সকালে শপথ গ্রহণ করেছে।

জেনিফার পার্কার সুগঠিত শরীরের, কৃষ্ণকেশী, চব্বিশ বছরের এক তরুণী। সে বুদ্ধিমতী, সুশ্রী, বড় বড় সবুজ চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। তার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর নয় তবে আকর্ষণীয়–যে চেহারায় খেলা করে অহংকার, সাহস এবং সংবেদনশীলতা। এ

এমন একখানা মুখ যাকে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। সে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে নিজের আসনে।

আজ জেনিফার পার্কারের দিনটা শুরু হয়েছে অত্যন্ত বাজেভাবে। ডিস্ট্রিক্ট অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা সকাল আটটায়। জেনিফার আগের রাতে ঘড়িতে সকাল ছ'টার সময় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল যাতে চুলটুল ধুয়ে অনুষ্ঠানে যেতে পারে।

কিন্তু অ্যালার্ম বাজেনি। আতঙ্ক নিয়ে জেনিফার পার্কারের ঘুম ভেঙেছে সকাল সাড়ে সাতটায়। সে যখন তাড়াহুড়ো করে মোজা গলাচ্ছে পায়ে এমন সময় গেল জুতোর হিল ভেঙে। আর জামাকাপড় পরা তখনও বাকি। জেনিফার তার ছোট অ্যাপার্টমেন্টের দরজা সশব্দে বন্ধ করার পরে মনে পড়ল চাবিটি সে ঘরের ভেতরে রেখে এসেছে। ভেবেছিল বাসে চড়ে ক্রিমিনাল কোর্টস বিল্ডিং-এ পৌঁছাবে, কিন্তু এখন তার প্রশ্নই নেই। সে ছুটল ট্যাক্সি ধরতে যার ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য তার নেই। তবে যে ট্যাক্সিঅলাকে সে পেল সেই লোকটা গন্তব্যের পুরোটা রাস্তা 'পৃথিবীতে কেয়ামত কেন আসন্ন' সে বিষয়ে বিরামহীন বকবকের চোটে জেনিফারের কানের পোকা নড়িয়ে দিল।

জেনিফার অবশেষে যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ১৫৫, লিওনার্ড স্ট্রিটের ক্রিমিনাল কোর্টস বিল্ডিং-এ পৌঁছুল, ততক্ষণে পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেছে তার। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে পঁচিশজন আইনজীবী জড়ো হয়েছে, বেশির ভাগ ল স্কুল থেকে মাত্র বেরিয়েছে। এই তরুণ এবং উৎসাহী আইনজীবীরা কাউন্টি অভ নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে কাজ করার উত্তেজনায় অস্থির।

অফিসটি চমৎকারভাবে সাজানো গোছানো। তাতে সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট। একটি বড় ডেস্ক আছে তিনটি চেয়ারসহ, তার পেছনে আরামদায়ক চামড়ার কেদারা, একটি কনফারেন্স টেবিলকে ঘিরে রেখেছে ডজনখানেক চেয়ার। ওয়াল কেবিনেট বোঝাই আইনের বইতে।

দেয়ালে ঝুলছে জে. এডগার হুভার, জন লিভসে, রিচার্ড নিক্সন এবং জ্যাক ডেম্পসির অটোগ্রাফ সম্বলিত বাঁধাই ছবি।

ক্ষমা প্রার্থনা করতে জেনিফার যখন তড়িঘড়ি ঢুকল অফিসে, ওই সময় ডি সিলভা তার বক্তৃতার মাঝপথে এসেছেন। তিনি থেমে গেলেন, ঘুরলেন জেনিফারের দিকে, বললেন, 'তুমি এটাকে কী ভেবেছ– টি-পার্টি?'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি-'

'তোমার দুঃখিত হওয়াতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি যেন আর কখনও তোমাকে দেরি করতে না দেখি।'

অন্যরা তাকাল জেনিফারের দিকে, তবে সমবেদনা প্রকাশ করতে সাহস পেল না।

ডি সিলভা দলটির দিকে ফিরে ঘেউঘেউ করে উঠলেন। 'আমি জানি তোমরা সবাই এখানে কেন এসেছ। তোমরা যখন ভাববে তোমরা রেডি, তোমরা হটশট ল ইয়ার হওয়ার জন্য বিদায় নেবে। তবে তোমাদের মধ্যে হয়তো একজন–হয়তোবা একজন একদিন আমার জায়গাটা দখল করতে পারবে। সহকারীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ডি সিলভা। 'ওদেরকে শপথ পড়াও।'

ওরা একসঙ্গে সবাই শপথ নিল।

শপথ নেয়ার পরে গাট্টাগোট্টা চেহারার খাটো একটা সিগার ধরিয়ে ডি সিলভা ওদেরকে বললেন, 'আমি এ মুহূর্তে একটি মামলা লড়ছি। তোমরা হয়তো মামলাটি সম্পর্কে খবরের কাগজে পড়েছ।' তাঁর কণ্ঠে শ্লেষ। 'তোমাদের মধ্যে জনা ছয়েককে আমি এ মামলার জন্য নিতে চাই।'

সবার আগে জেনিফারের হাত উঠল। একটু ইতস্তত করে ডি সিলভা ওকেসহ বাকি পাঁচজনকে নির্বাচন করলেন।

'তোমরা ষোলো নাম্বার কোর্টরুমে যাও।'

ওদের সবাইকে আইডেন্টিফিকেশন কার্ড দেয়া হলো। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ব্যবহারে কিছু মনে করেনি জেনিফার। *এ লোককে কঠিন তো হতেই হবে,* ভাবল ও। *কারণ উনি কঠিন একটি কাজ করছেন।*

আর জেনিফার সেই কঠিন লোকটির সঙ্গে এখন কাজ করছে। সে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অভ দা কাউন্টি অব নিউইয়র্কের স্টাফদের একজন সদস্য। ল স্কুলের অন্তহীন বছরগুলোর অবশেষে সমাপ্তি ঘটেছে। জেনিফার দ্বিতীয় হয়ে গ্রাজুয়েট শেষ করেছে। পড়েছে ল রিভিউ নিয়ে। প্রথমবারের চেষ্টাতেই উতরে গেছে বার পরীক্ষা, অথচ ওর সঙ্গীসাথীরা ফেল মেরেছে। ওর ধারণা ও রবার্ট ডি সিলভাকে বুঝতে পেরেছে এবং নিশ্চিত ভদ্রলোক ওকে যে কাজই দিন না কেন ঠিকই তা সম্পূর্ণ করবে জেনিফার।

জেনিফার হোমওয়ার্ক করেছে। সে জানে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অধীনে চারটি আলাদা ব্যুরো রয়েছে–ট্রায়াল, আপিল, র‍্যাকেট এবং ফ্রড। জেনিফার জানে না কোন্‌টির দায়িত্ব তাকে দেয়া হবে। নিউইয়র্ক মহানগরে সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সংখ্যা দুইশতাধিক, আছেন পাঁচজন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি, একেকটি ব্যুরোর জন্য একজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যুরো হলো ম্যানহাটান এবং রবার্ট ডি সিলভা।

জেনিফার এখন আদালতকক্ষে প্রসিকিউটরের টেবিলে বসে আছে। লক্ষ করছে রবার্ট ডি সিলভাকে। শক্তিশালী, নির্দয় এক ইনকুইজিটর।

বিবাদী মাইকেল মোরেত্তির দিকে আড়চোখে তাকাল জেনিফার। এ লোকটি সম্পর্কে সবকিছু জানে ও, তবু মেনে নিতে পারছে না যে মাইকেল মোরেত্তি একজন খুনী, মার্ডারার। *মুভি তারকার মতো লাগছে ওকে,* ভাবল জেনিফার। নিশ্চল বসে আছে মোরেত্তি, গভীর, কালো চঞ্চল চোখজোড়া দেখে বোঝার জো নেই তার মনের ভেতরে কী চলছে। অস্থিরভাবে ঘরের প্রতিটি কোণে ঘুরে ফিরছে মাইকেল মোরেত্তির চোখ, পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু পালাবার পথ নেই। সে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন ডি সিলভা।

ক্যামিল্লা স্টেলা এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। কোনও জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করলে স্টেলাকে মনে হবে একটা বেজী। একটু বেশি সরু, চিমসানো মুখ, পাতলা ঠোঁট, হলুদ দাঁত। ছোট ছোট চোখ, চোরের মতো চাউনি। রবার্ট ডি সিলভা তার সাক্ষীর ঘাটতিগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তবে এতে কিছু এসে যায় না। স্টেলা কী বলবে তাতেই কেবল এসে যায়। সে এমন এক ভয়ংকর গল্প শোনাবে যা আগে কখনও বলা হয়নি এবং এর মধ্যে এতটুকু রঙ মেশানো নেই, পুরোটাই সত্যি।

ক্যামিল্লো স্টেলা শপথ পাঠ করার পরে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হেঁটে গেলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি। শুরু করলেন জেরা।

'মি. স্টেলা, আপনি কি বিবাদী মাইকেল মোরেত্তিকে চেনেন?'

'জ্বী, স্যার,' স্টেলা সাহস করে মোরেত্তির দিকে তাকাতে পারল না।

'তার সঙ্গে আপনার কী রকম সম্পর্ক?'

'আমি মাইকের সঙ্গে কাজ করতাম।'

'আপনি মাইকেল মোরেত্তিকে কতদিন ধরে চেনেন?'

'প্রায় দশ বছর,' স্টেলা ঘাড় চুলকাতে শুরু করল।

'বিবাদীর সঙ্গে কি আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?'

'অবজেকশন!' লাফ মেরে খাড়া হলেন টমাস কোলফ্যাক্স। তিনি মাইকেল মোরেত্তির উকিল। লম্বা, রুপোলি কেশ, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। তিনি সিন্ডিকেটের কনসিলিয়ারি, দেশের ধূর্ততম ক্রিমিনাল ল ইয়ারদের একজন।

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি উইটনেসকে লিড করার চেষ্টা করছেন।'

বিচারক লরেন্স ওয়াল্ডম্যান বললেন, 'সাসটেইনড।'

'আমি প্রশ্নটি অন্যভাবে করছি। মি. মোরেত্তির সঙ্গে আপনি কী ধরনের কাজ করেন?'

'ট্রাবলশূটারের কাজ।'

'একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?'

'জ্বী। যদি কোনও সমস্যার উদ্ভব হয়– কেউ হয়তো লাইন থেকে বেরিয়ে গেল– মাইক আমাকে বলে ওই লোককে সোজা রাস্তায় নিয়ে আসতে।'

'কীভাবে কাজটা করেন আপনি?'

'পেশিশক্তির সাহায্যে।'

'জুরিকে একটি উদাহরণ দিতে পারবেন?'

আবার লাফিয়ে উঠলেন টমাস কোলফ্যাক্স। 'অবজেকশন, ইয়োর অনার। এ ধরনের প্রশ্ন তাৎপর্যহীন।'

'ওভাররুলড। সাক্ষী জবাব দিতে পারেন।'

'বেশ। মাইক সুদে টাকা ধার দেয়। ঠিক? বছর কয়েক আগে জিমি সেরানো তার পাওনা শোধ করতে গড়িমসি করছিল। তখন মাইক আমাকে পাঠাল জিমিকে একটা শিক্ষা দিতে।'

'শিক্ষাটা কীরকম ছিল?'

'আমি তার পা-জোড়া ভেঙে দিই,' সোৎসাহে জবাব দিল স্টেলা।

'সুদের ব্যবসা ছাড়া মাইকেল মোরেট্টি আর কী কী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত?'

'জেসাস! এমন কোনও ব্যবসা নেই যা সে করে না।'

'আপনার কাছ থেকে ব্যবসার নাম শুনতে চাইছি, মি. স্টেলা।

'ওয়াটার ফ্রন্টের কথাই ধরুন। ইউনিয়নের সঙ্গে ভালো খাতির আছে মাইকের। গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, জুয়া, জুক বক্স, গারবেজ কালেকশন, লিনেন সাপ্লাই ইত্যাদি সব।'

'মি. স্টেলা, এডি এবং আলবার্ট রামোসকে হত্যার অভিযোগে মাইকেল মোরেট্টির বিচার করা হচ্ছে সেকথা কি আপনি জানেন?'

'অবশ্যই।'

'ওরা খুন হওয়ার সময় কি আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?'

'ইয়াহ্,' স্টেলার পুরো শরীর এখন চুলকাতে শুরু করেছে।

'খুনটা আসলে কে করেছিল?'

'মাইক,' এক সেকেন্ডের জন্য মাইকেল মোরেট্টির চোখে চোখ পড়ল স্টেলার। দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল স্টেলা।

'মাইকেল মোরেট্টি?'

'ইয়াহ্।'

'বিবাদী কেন আপনাকে বলল সে রামোসকে খুন করতে চায়?'

'ওয়েল, এডি এবং আল একটি বই–'

'বুক মেকিং অপারেশন? অবৈধ বেটিং?'

'জ্বী। মাইক দেখে ওরা সরটা খেয়ে নিচ্ছে। তাই সে ওদেরকে একটা শিক্ষা

দিতে চায়। মাইক আমাকে বলে আমি যেন ওদেরকে আমন্ত্রণ জানাই–'

'এডি এবং আলবার্ট রামোসকে?'

'ইয়াহ্। পেলিক্যানে ছোট একটি পার্টির আয়োজন করা হয়। ওটা একটা প্রাইভেট বিচ ক্লাব।' স্পেলার হাত চুলকাতে শুরু করেছে। সে অজান্তেই হাত চুলকাচ্ছিল। ব্যাপারটা টের পেয়ে এক হাত দিয়ে অন্য হাতখানা চেপে ধরল।

জেনিফার পার্কার ফিরে তাকাল মাইকেল মোরেট্টির দিকে। সে নির্বিকারচিত্তে দেখছে, মুখ এবং শরীর স্থির; নিষ্কম্প।

'তারপর কী ঘটল, মি. স্টেলা?'

'আমি এডি এবং আলকে গাড়িতে করে নিয়ে আসি। গাড়ি পার্ক করা হয় পার্কিং লটে। মাইক সেখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা গাড়ি থেকে নামে, আমি ওখান থেকে সরে যেতেই গুলি করতে শুরু করে মাইক।'

'রামোস ভাইদেরকে আপনি মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছেন?'

'জ্বী, স্যার।'

'আর ওরা লাশ হয়ে পড়ে ছিল?'

'জ্বী।'

কোর্টরুমে একটা গুঞ্জন উঠল। গুঞ্জন মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ডি সিলভা।

'মি. স্টেলা, আপনি এ ব্যাপারে সচেতন যে এই আদালত কক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা স্বেচ্ছায়?'

'জ্বী, স্যার।'

'আপনি দেখেছেন বিবাদী, মাইকেল মোরেট্টি ঠাণ্ডা মাথায় দুজন লোককে গুলি করে হত্যা করেছে এ কারণে যে তারা তার টাকা মেরে দিয়েছিল?'

'অবজেকশন! উনি উইটনেসকে লিড করছেন।'

'সাসটেইনড।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ডি সিলভা জুরি-সদস্যদের দিকে তাকালেন। ওদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন তিনি এ মামলা জিতে যাচ্ছেন। তিনি ক্যামিল্লো স্টেলার দিকে ফিরলেন।

'মি. স্টেলা, আমি জানি এ আদালতে এসে সাক্ষ্য দিতে আপনাকে বহুকষ্টে সাহসে বুক বাঁধতে হয়েছে। আমি এ রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' ডি সিলভা ফিরলেন টমাস কোলফ্যাক্সের দিকে।

'ইয়োর উইটনেস ফর ক্রস।'

রাজকীয় ভঙ্গিতে সিধে হলেন টমাস কোলফ্যাক্স। 'ধন্যবাদ, মি. ডি সিলভা।'

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে এলেন বেঞ্চে। 'ইয়োর অনার, আরেকটু পরেই লাঞ্চ-বিরতি হবে। আমি চাই না আমার ক্রস-এক্সামিনেশন বাধাগ্রস্ত হোক। লাঞ্চের জন্য আদালত মুলতবির অনুরোধ কি আমি করতে পারি? বিকেলে ক্রস-এক্সামিন করব?'

'বেশ,' জাজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান তাঁর হাতুড়িটা দিয়ে বাড়ি মারলেন বেঞ্চে। 'বেলা দুটো পর্যন্ত আদালত মুলতবি রাখা হলো।'

বিচারককে আসন ছেড়ে দাঁড়াতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। সাইড ডোর দিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন বিচারক। জুরি সদস্যরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে লাগল। চার সশস্ত্র ডেপুটি ঘিরে ফেলল ক্যামিল্লো স্টেলাকে, কোর্টরুমের কাছের একটি দরজার দিকে এগোল ওকে নিয়ে।

তৎক্ষণাৎ ডি সিলভাকে ছেঁকে ধরল সাংবাদিকের দল।

'আপনি কি আমাদেরকে কোনও বিবৃতি দেবেন?'

'এ পর্যন্ত মামলা কেমন এগোল, মি. ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি?'

'মামলা শেষ হওয়ার পরে স্টেলাকে আপনি কীভাবে রক্ষা করবেন?'

অন্যদিন হলে আদালতকক্ষে সাংবাদিকদের এই অনুপ্রবেশ সহ্য করতেন না রবার্ট ডি সিলভা, কিন্তু এদেরকে এখন তাঁর দরকার, প্রয়োজন তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। প্রেসকে নিজের পক্ষে রাখতে হবে তাঁকে। কাজেই সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়ে গেলেন বিনীত ভঙ্গিতে।

জেনিফার পার্কার বসে বসে দেখছে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কীভাবে স্বচ্ছন্দে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

'মাইকেল মোরেত্তিকে কি দোষী সাব্যস্ত করা যাবে?'

'আমি জ্যোতিষী নই,' জেনিফার শুনল নম্র গলায় জবাব দিচ্ছেন ডি সিলভা। 'এজন্যই তো জুরিরা আছেন, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন মি. মোরেত্তি অপরাধী নাকি নিরপরাধ।'

জেনিফার দেখছে সিধে হয়েছে মাইকেল মোরেত্তি। তাকে শান্ত, ধীর এবং রিল্যাক্সড লাগছে। শিশুসুলভ চেহারাটা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন এর বিরুদ্ধে এতসব ভয়ংকর অভিযোগ আনা হয়েছে।

অপরাধী যদি হয় তো স্টেলা, মোরেত্তি নয়, মনে মনে বলল জেনিফার।

সাংবাদিকরা চলে যাওয়ার পরে ডি সিলভা তাঁর স্টাফদের নিয়ে মিটিঙে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জেনিফার ওদের আলোচনা শোনার জন্য উৎকর্ণ।

জেনিফার লক্ষ করল এক লোক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে ঘিরে থাকা দলটা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ডি সিলভাকে কী যেন বলল। তারপর দ্রুত কদম ফেলে চলে

এল জেনিফারের কাছে। লোকটার হাতে বড় সড় একটি ম্যানিলা খাম। 'মিস পার্কার?'

বিস্মিত চোখে মুখ তুলে চাইল জেনিফার, 'জ্বী।'

'চিফ আপনাকে এ জিনিসটা স্টেলাকে দিতে বললেন। ওকে বলবেন সন-তারিখগুলো যেন ভালোভাবে লক্ষ করে। কোলক্যাক্স ওকে আজ ছিঁড়ে খেতে চাইবেন। চিফ চান না স্টেলা উল্টোপাল্টা কিছু বলে ফেঁসে যাক।'

খামটা জেনিফারের হাতে তুলে দিল লোকটা। জেনিফার ডি সিলভার দিকে তাকাল। *উনি আমার নামটা মনে রেখেছেন,* মনে মনে বলল ও। *এটা একটা* শুভ *লক্ষণ।*

'জলদি যান। স্টেলার পড়তে সময় লাগবে।'

'জ্বী, স্যার,' জেনিফার ঝট করে সিধে হলো।

স্টেলাকে যে দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকতে দেখেছে সেখানে চলে এল ও। এক ডেপুটি ওর রাস্তা আটকে দাঁড়াল।

'ক্যান আই হেল্প ইউ, মিস?'

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে কাজ করি আমি,' ফুরফুরে গলায় বলল জেনিফার। একটা আইডি কার্ড বের করে দেখাল। 'মি. ডি সিলভা মি. স্টেলাকে একখানা প্যাকেট দিতে বলেছেন।'

গার্ড কার্ডে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল, তারপর খুলে দিল দরজা। উইটনেস রুমে ঢুকল জেনিফার। ছোট একটি ঘর, আসবাব বলতে জীর্ণ একটি ডেস্ক, একটি পুরোনো সোফা আর খানকয়েক চেয়ার। স্টেলা একটি চেয়ারে বসে পাগলের মতো হাত চুলকাচ্ছে। ঘরে সেই চার ডেপুটি উপস্থিত।

জেনিফার ঘরে ঢুকতে একজন গার্ড বলে উঠল, 'অ্যাই! এখানে কারও ঢোকা নিষেধ।'

বাইরের গার্ড বলল, 'ঠিক আছে। উনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে এসেছেন।'

জেনিফার স্টেলার হাতে ম্যানিলা খামখানা ধরিয়ে দিল।

'মি. ডি সিলভা বলেছেন কাগজে লেখা তারিখগুলো আরেকবার ঝালাই করে নিতে।'

চোখ পিটপিট করে জেনিফারের দিকে তাকাল স্টেলা। পাগলের মতো খামচে চলল গা।

দুই

লাঞ্চে যাচ্ছে জেনিফার, একটি জনশূন্য কোর্টরুমের খোলা দরজায় চোখ আটকে গেল ওর। ভেতরে উঁকি দেয়ার লোভ সংবরণ করতে পারল না।

পেছনের দিকে প্রতি পাশে পনেরো সারি করে দর্শকদের আসন। জাজের বেঞ্চির সামনে একজোড়া লম্বা টেবিল, বামের টেবিলের লেখা Plaintiff আর ডানেরটিতে Defendant. জুরি বক্সে দুটি সারি। প্রতিটি সারিতে আটটি করে চেয়ার। *এটা খুব সাধারণ একটা কোর্টরুম,* ভাবল জেনিফার। *সাদামাটা, বিশ্রী দেখতে– কিন্তু তবু এটি স্বাধীনতার হৃৎপিণ্ড।* পৃথিবীর সব দেশে এই ছোট্ট ঘরটি থাকে না। বিশেষ করে সেসব দেশে যেখানকার নাগরিকদের মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে নেয়া হয় বিছানা থেকে, তাদেরকে নির্যাতনে মেরে ফেলা হয় অজ্ঞাত কোনও কারণে। কে তাদের শত্রু তাও জানা যায় না। এরকম দেশের মধ্যে রয়েছে ইরান, উগান্ডা, আর্জেন্টিনা, পেরু, ব্রাজিল, রোমানিয়া, রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া...তালিকাটি অনেক লম্বা।

আমেরিকান আদালত যদি কখনও তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে, ভাবছে জেনিফার, *নাগরিকরা যদি কখনও বিচারের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়, আমেরিকা মুক্ত দেশ হিসেবে তার অস্তিত্ব আর টিকিয়ে রাখতে পারবে না।*

জেনিফার এখন এ সিস্টেমের একটি অংশ। গর্বে বুকটা ফুলে গেল ওর। সে মার্কিন আদালতের সম্মান রক্ষার জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারবে। অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল জেনিফার, তারপর চলে যাবার জন্য ঘুরল।

হল-এর শেষ মাথা থেকে একটা গুঞ্জন ভেসে এল, ক্রমে চওড়া এবং জোরালো হয়ে উঠল কোলাহল। ভয়ানক বিশৃঙ্খলায় পরিণত হলো। কানফাটানো শব্দে বাজতে লাগল অ্যালার্ম বেল। করিডোর থেকে ভেসে এল পদশব্দ। জেনিফার দেখতে পেল হাতে উদ্যত অস্ত্র নিয়ে পুলিশের লোকজন কোর্টহাউজের ফ্রন্ট এন্ট্রান্স অভিমুখে ছুটছে। তাৎক্ষণিকভাবে জেনিফারের মনে হলো মাইকেল মোরেট্টি যেভাবেই হোক পুলিশি বাধা টপকে পালিয়ে গেছে।

দ্রুত করিডোরে পা বাড়াল জেনিফার। জায়গাটা পরিণত হয়েছে পাগলা-গারদে। উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে লোকজন, ঘণ্টার তীক্ষ্ণ নিনাদ ছাড়িয়ে গলা ফাটিয়ে

নির্দেশ দিচ্ছে। রায়টগান হাতে বাইরে বেরুবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে রক্ষীরা। যেসব সাংবাদিক টেলিফোনে রিপোর্ট করছিল তারা করিডোরে ছুটে এল কী ঘটছে দেখতে। হল-এর দূরপ্রান্তে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভাকে দেখতে পেল জেনিফার। পাগলের মতো আধডজন পুলিশকে হাত নেড়ে নেড়ে কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। তাঁর মুখ রক্তশূন্য।

মাই গড! এ মানুষটার তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে, ভাবল জেনিফার।

ভিড় ঠেলে সামনে এগোল জেনিফার, ডি সিলভার কোনও সাহায্যে আসতে পারবে ভেবে। ক্যামিল্লো স্টেলাকে পাহারারত এক গার্ড মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেল জেনিফারকে। একটা হাত তুলল সে, জেনিফারকে দেখিয়ে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গার্ডরা চেপে ধরল জেনিফারের হাত, পরিয়ে দিল হ্যান্ডকাফ। ওকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিচারক লরেন্স ওয়াল্ডম্যানের চেম্বারে আছেন চারজন মানুষ বিচারক ওয়াল্ডম্যান স্বয়ং, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা, টমাস কোলফ্যাক্স এবং জেনিফার।

'তুমি যদি কোনও স্টেটমেন্ট দিতে চাও তাহলে একজন অ্যাটর্নি পাবার অধিকার তোমার রয়েছে,' জাজ ওয়াল্ডম্যান জানালেন জেনিফারকে, 'এবং তুমি কিছু বলতে না চাইলে চুপ করে থাকার অধিকারও তুমি রাখো, তুমি যদি–'

'আমার অ্যাটর্নির প্রয়োজন নেই, ইয়োর অনার! কী ঘটেছে আমি তা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে পারব।'

রবার্ট ডি সিলভা জেনিফারের এত কাছে ঝুঁকে এলেন যে ও পরিষ্কার দেখতে পেল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কপালে একটি শিরা তরাক তরাক লাফাচ্ছে। 'ক্যামিল্লো স্টেলার কাছে প্যাকেজ পৌঁছে দেয়ার জন্য কে তোমাকে টাকা দিয়েছে?'

'আমাকে টাকা দিয়েছে? কেউ আমাকে টাকা দেয়নি!' প্রবল ঘৃণায় কেঁপে গেল জেনিফারের কণ্ঠ।

ডি সিলভা জাজ ওয়াল্ডম্যানের ডেস্ক থেকে একটি ম্যানিলা খাম তুলে নিলেন। 'কেউ তোমাকে টাকা দেয়নি? তুমি এমনি এমনি আমার সাক্ষীর কাছে এসে এ জিনিসটা দিয়ে গেছ?' খাম ধরে নাড়া দিতেই ভেতর থেকে একটি হলদে ব্যানারি পাখি খসে পড়ল টেবিলে। ওটার ঘাড় মটকানো। জেনিফার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পাখিটির দিকে।

'আমি– আপনার এক লোক– আমাকে–'

'আমার কোন্ লোক?'

'আ–আমি চিনি না।'

'অথচ বলছ সে আমার লোক,' গর্জে উঠলেন সিলভা।

'জ্বী। আমি দেখলাম সে আপনার সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সোজা হেঁটে এল আমার কাছে, এই খামটা ধরিয়ে দিয়ে বলল আপনি নাকি এটা মি. স্টেলার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। লোকটা– লোকটা আমার নামও জানত।'

'তা তো জানবেই। ওরা তোমাকে কত ঘুস দিয়েছে?'

আমি আসলে দুঃস্বপ্ন দেখছি, ভাবছে জেনিফার। *যে কোনও সময় আমি জেগে উঠব এবং দেখব সকাল ছটা বাজে। আমি জামাকাপড় পরে রওনা হয়ে যাব ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির স্টাফ হিসেবে শপথ নেয়ার জন্য।'*

'কত টাকা?' ডি সিলভার কণ্ঠে ক্রোধ এমন ভয়ংকর, দাঁড়িয়ে গেল জেনিফার।

'আপনি কি আমাকে অভিযোগ করছেন–?'

'অভিযোগ করছি!' মুঠো পাকালেন রবার্ট ডি সিলভা। 'লেডি, আমি তো এখন পর্যন্ত কিছু শুরুই করিনি। যখন জেল থেকে ছাড়া পাবে তুমি, এতটাই বুড়িয়ে যাবে যে ঘুসের টাকাটা আর খরচ করার মতো সময় বা সুযোগ কিছুই থাকবে না।'

'আমি কোনও টাকা নিইনি,' জেদি গলায় বলল জেনিফার।

টমাস কোলফ্যাক্স চুপচাপ ওদের বচসা শুনছিলেন। তিনি এবার নাক গলালেন, 'মাফ করবেন, ইয়োর অনার, আমার ধারণা এ থেকে আমরা কোনও সমাধানে পৌঁছুতে পারব না।'

'আমারও তাই ধারণা,' বললেন বিচারক। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে ফিরলেন। 'স্টেলা কি ক্রস এক্সামিনের জন্য, প্রস্তুত।

'ক্রস্-এক্সামিন? ভয়ে আধমরা হয়ে আছে স্টেলা। বলে দিয়েছে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আর জীবনেও দাঁড়াবে না।'

মসৃণ গলায় টমাস কোলফ্যাক্স বললেন, 'ইয়োর অনার, আমি প্রসিকিউশনের প্রধান সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ না পেলে মিসট্রায়ালের রাস্তায় আমাকে এগোতে হবে।'

ঘরের সবার একথার অর্থ জানা আছে; মাইকেল মোরেট্টি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাবে আদালত থেকে।

জাজ ওয়াল্ডম্যান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকালেন।

'আপনি কি আপনার সাক্ষীকে বলেছেন তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হতে পারে?'

'জ্বী, বলেছি। কিন্তু স্টেলার আমাদেরকে নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। সে ওদের ভয়ে কুঁকড়ে আছে।' জেনিফারের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ডি সিলভা। 'তার ধারণা আমরা আর তাকে রক্ষা করতে পারব না।'

ধীর গলায় জাজ উইলিয়াম বললেন, 'তাহলে আমার আর ডিফেন্সের অনুরোধ রক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না। আমাকে মিস ট্রায়াল ঘোষণা করতেই হচ্ছে।'

রবার্ট ডি সিলভা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন তার মামলা খতম হয়ে যাচ্ছে। স্টেলার সাক্ষ্য ছাড়া এ মামলা লড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মাইকেল মোরেট্টি এখন তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, কিন্তু জেনিফার রয়েছে নাগালের মধ্যে। সে তাঁর যে ক্ষতি করেছে এর মাশুল অবশ্যই জেনিফারকে দিতে হবে।

জাজ ওয়াল্ডম্যান বললেন, 'আমি বিবাদীকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি, সেইসঙ্গে জুরিও ডিশমিশ ঘোষণা করা হলো।'

টমাস কোলফ্যাক্স বললেন, 'ধন্যবাদ, ইয়োর অনার।' তাঁর চেহারায় বিজয়ের উল্লাসের ছিটেফোঁটাও নেই।

'আর কারও যদি কিছু বলার থাকে...' বললেন বিচারক।

'আমার বলার আছে,' ডি সিলভা ঘুরলেন জেনিফার পার্কারের দিকে। 'বিচারকর্মে বাধা দেয়ার জন্য ওকে শাস্তি দেয়া হোক, একটি প্রধান মামলার সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অপরাধে ওর জেল হোক, ষড়যন্ত্র...' রাগের চোটে গলা বুজে এল তাঁর।

জেনিফারও রেগে গেল। 'আপনি আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করছেন তার একটিও প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ আপনার অভিযোগগুলো সত্যি নয়। আ-আমি একটা বোকামি করে ফেলেছি বলে আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন। কিন্তু এর বেশিকিছু করতে পারবেন না। আমাকে কেউ কোনও ঘুস দেয়নি। আমি আপনার জন্য একটা প্যাকেজ ডেলিভারি দিচ্ছিলাম মাত্র, এর বেশি কিছু নয়।'

জাজ ওয়াল্ডম্যান জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক তার ফলাফল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি অ্যাপেলেট ডিভিশনকে তদন্তের জন্য অনুরোধ করব। তারা যদি মনে করেন তাহলে তোমার বিরুদ্ধে ডিসবারমেন্ট প্রসিডিং শুরু করে দেবেন।'

জেনিফারের মাথাটা চক্কর দিল, মনে হলো ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'ইয়োর অনার, আমি-'

'দ্যাটস অল ফর নাউ, মিস পার্কার।'

জেনিফার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শত্রুভাবাপন্ন মুখগুলোর দিকে। ওর আর কিছু বলার অবকাশ নেই।

যা বলার বলে দিয়েছে ডেস্কে পড়ে থাকা মরা হলুদ ক্যানারি পাখিটি।

তিন

সান্ধ্য খবরে জেনিফার পার্কারকে শুধু দেখালই না–ও নিজেই হয়ে উঠল ইভনিং নিউজ। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির রাজসাক্ষীকে সে একটি মরা ক্যানারি পাখি পাঠিয়েছে, এ খবরটি সবার আকর্ষণে পরিণত হলো। প্রতিটি টিভি চ্যানেল দেখাল জেনিফার জাজ ওয়াল্ডম্যানের চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোর্টহাউজে মৌমাছির মতো তাকে ছেঁকে ধরেছে প্রেস এবং পাবলিক। তাদের কবল থেকে ছাড়া পাবার জন্য রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হচ্ছে জেনিফারকে।

জেনিফার স্বপ্নেও ভাবেনি অকস্মাৎ এমন ভয়াবহ পাবলিসিটির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে সে। চারদিক থেকে ওরা ঘিরে ধরেছে ওকে টিভি রিপোর্টার, রেডিও রিপোর্টার এবং খবরের কাগজের লোকজন। ওদের কাছ থেকে ছুটে পালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল ও। কিন্তু ওর অহংবোধ জায়গা থেকে নড়তে দিল না ওকে।

'আপনাকে হলদে ক্যানারিটা কে দিয়েছে, মিস পার্কার?'

'আপনার সঙ্গে মাইকেল মোরেট্টির কখনও সাক্ষাৎ হয়েছে?'

'আপনি কি জানতেন ডি সিলভা এ মামলাটি ব্যবহার করে গভর্নরের অফিসে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন?'

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হুমকি দিয়েছেন তিনি আপনাকে দেখে নেবেন। আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলুন?'

প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে শুধু 'নো কমেন্ট' বলে চলল জেনিফার।

সিবিএস-এর সান্ধ্যখবরে জেনিফারকে 'Worng-way Parker' বলে অভিহিত করা হলো, যে মেয়েটি ভুলপথে চলেছে। ABC-এর সংবাদপাঠক ওকে সম্বোধন করল 'হলুদ ক্যানারি' বলে।

টনি'স প্লেস নামক রেস্টুরেন্টে মাইকেল মোরেট্টির বেকসুর খালাস উপলক্ষে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে লোকজন। ডজনখানেক মানুষ ঘরে বসে মদপান করছে, হৈ-হল্লা করছে।

বার-এ একা বসে আছে মাইকেল মোরেট্টি। নীরবে টিভিতে দেখছে

জেনিফারকে। গ্লাসটা জেনিফারের দিকে তুলে স্যালুট করল সে, তারপর পান করল মদ।

সর্বত্র আইনজীবীদের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল জেনিফার। এদের অর্ধেকের দৃঢ় বিশ্বাস মাফিয়ার কাছ থেকে ঘুস খেয়েছে জেনিফার, বাকি অর্ধেক তাকে নিরপরাধ মনে করে। তবে তারা যে-পক্ষই নিক না কেন একটি বিষয়ে সবাই একমত যে অ্যাটর্নি হিসেবে জেনিফার পার্কারের ক্ষুদ্র ক্যারিয়ারের এখানেই সমাপ্তি।

মাত্র চারঘণ্টা সে অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

জেনিফার পার্কারের জন্ম ওয়াশিংটনের কেলসোতে। ছোট এ শহরটি ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠা করে হোমসিক এক স্কটিশ সার্ভেয়ার। তার বাড়ি ছিল স্কটল্যান্ড। নিকের শহরের নাম সে কেলসোর নামকরণ করে।

জেনিফারের বাবা পেশায় ছিলেন উকিল। শহরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত টিম্বার কোম্পানির উকিল ছিলেন তিনি। পরে করাতমিলের শ্রমিকদের হয়ে ওকালতি করেছেন। জেনিফারের শৈশব কেটেছে আনন্দে। একটি শিশুর জন্য ওয়াশিংটন রাজ্য ছিল রূপকথার মতো। এর দৃষ্টিনন্দন পাহাড়-পর্বত, হিমবাহ, জাতীয় পার্ক সবই দারুণভাবে উপভোগ করার মতো। ছিল স্কি-করা এবং ক্যানূ ভ্রমণের সুযোগ। একটু বড় হবার পরে গ্লেসিয়ারে আইস ক্লাইম্বিং-এ যেত জেনিফার। সে মাউন্ট রেইনারে চড়ত, টিম্বারলেনে বাবার সঙ্গে স্কি করত।

বাবা ওকে সবসময় সময় দিতেন। অথচ ওর সুন্দরী, অস্থিরমতি মাকে সারাক্ষণ রহস্যময় ব্যস্ততায় দেখা যেত। বাড়িতে তিনি থাকতেন না বললেই চলে। জেনি তার বাবাকে খুব ভালোবাসত। অ্যাবনার পার্কার ছিলেন ইংলিশ, আইরিশ এবং স্কটিশ রক্তের মিশ্রণের মানুষ। মাঝারি উচ্চতা, কালো চুল, সবজে-নীল চোখ। সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন তিনি, ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল প্রখর এবং প্রবল। টাকার লোভ ছিল না, শুধু আগ্রহ ছিল মানুষের প্রতি। তিনি জেনিফারের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন, গল্প করতেন যেসব মামলা লড়ছেন তা নিয়ে, যেসব লোক তাঁর অফিসে আসত তাদেরকে নিয়ে। কয়েক বছর পরে জেনিফার বুঝতে পারে বাবা তার সঙ্গে কথা বলতেন আসলে কারও সঙ্গে নিজের অনুভূতিগুলো শেয়ার করার সুযোগ পেতেন না বলে।

স্কুল ছুটির পরে জেনিফার আদালতে ছুটে যেত তার বাবার কাজ দেখতে। কোর্টে মামলা না থাকলে সে বাবার অফিসে ঘুরে বেড়াত, শুনত বাবা তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে মামলা নিয়ে আলোচনা করছেন। তবে ওরা কখনও জেনিফারের ল স্কুলে ভর্তি

হওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা বলতেন না। সবাই জানতেন জেনিফার তার বাবার পথ অনুসরণ করবে।

পনেরোতে পড়ল জেনিফার। গ্রীষ্মের ছুটিগুলো কাটাতে লাগল বাবার সঙ্গে কাজ করে। যে সময়ে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে ডেটিং করে সে সময় জেনিফার ডুবে থাকত আইনের বইতে।

ছেলেরা যথেষ্ট আগ্রহী ছিল জেনিফারের প্রতি। কিন্তু খুব কমই বাইরে যেত জেনিফার। বাবা কারণ জানতে চাইলে জেনিফারের জবাব ছিল, 'ওদের বয়স খুব কম, বাবা।' ও জানত একদিন সে বাবার মতো একজন আইনজীবীকে বিয়ে করবে।

জেনিফারের ষোড়শ জন্মদিনে ওর মা প্রতিবেশীর আঠেরো বছরের এক তরুণের হাত ধরে পালিয়ে গেলেন শহর ছেড়ে। আর জেনিফারের বাবার যেন মৃত্যু ঘটল। তাঁর হৃদস্পন্দনের ছন্দ থেমে যায় আরও সাত বছর পরে। কিন্তু স্ত্রীর খবর যেদিন জানলেন তিনি আসলে সে মুহূর্তেই মারা গিয়েছিলেন তিনি। গোটা শহর খবরটা জেনে ফেলেছিল। সবাই সহানুভূতি জানাতে এসেছিল। এতে ভালোর চেয়ে মন্দটাই হয়েছে বেশি। কারণ সর্বদা শিরদাঁড়া উঁচু করে থাকা অ্যাবনারের মেরুদণ্ড যেন ভেঙে গিয়েছিল এ ঘটনায়। তিনি মদপান শুরু করেন। জেনিফার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে বাবাকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু লাভ হয়নি কোনও। জীবন আর আগের মতো হয়ে ওঠেনি।

পরের বছর, কলেজে ভর্তির সময়, জেনিফার চাইল সে বাড়িতেই থাকবে, বাবাকে সঙ্গ দেবে। কিন্তু রাজি হলেন না অ্যাবনার।

'আমরা পার্টনারশিপ গড়ে তুলব, জেনি,' বললেন তিনি মেয়েকে। 'তুমি যাও। কলেজে ভর্তি হও। ডিগ্রি নাও।'

গ্রাজুয়েশন শেষ করে সিয়াটলের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে গেল জেনিফার আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে। সে ইউনিভার্সিটি ডরমিটরিতে উঠল, ল লাইব্রেরিতে একটা কাজও জুটিয়ে ফেলল।

সিয়াটল ভালো লাগত জেনিফারের। রোববারে সে, এক ইন্ডিয়ান ছাত্র আমিনি উইলিয়ামস এবং আইরিশ একটি মেয়ে জোসেফাইন কলিন্স মিলে গ্রিন লেকে যেতে লাগল নৌকা বাইতে। লেক ওয়াশিংটনের গোল্ড কাপ রেস-এ গেল, বর্ণালি রঙের হাইড্রোপ্লেনের ওড়াউড়ি উপভোগ করল।

সিয়াটলে দারুণ-দারুণ জ্যাজ ক্লাবের অভাব নেই। জেনিফারের প্রিয় দল পিটার্সের পুপ ডেক। ওখানে টেবিলের বদলে কাঠের স্ল্যাব দিয়ে ক্রেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বিকেলগুলোতে জেনিফার, আমিনি এবং জোসেফাইন হেস্টিটেস্টিতে মিলিত হয়। এই হ্যাংআউটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলুভাজা পাওয়া যায়।

দুটি ছেলে জেনিফারের পিছু নিয়েছিল—এক আকর্ষণীয় চেহারার মেডিকেল ছাত্র, নাম নোয়া লারকিন, অপরজন বেন মুনরো নামে আইনের এক ছাত্র। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে ডেটিং-এ গেল জেনিফার। তবে সিরিয়াস রোমান্সের ভাবনা ছিল না তার মনে।

প্রতি গরমের ছুটিতে জেনিফার বাবাকে দেখতে যায়। উনি অনেক বদলে গেছেন। এখন আর মদপান করেন না। তবে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন, কারও সঙ্গেই কথা বলেন না। চারপাশে এমন একটি ইমোশনাল দুর্গ গড়ে তুলেছেন, তাঁকে কোনোকিছুই স্পর্শ করে না।

ল স্কুলে শেষ টার্ম করছে জেনিফার, এমন সময় মারা গেল ওর বাবা। অ্যাবনার পার্কারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চলে এল শতশত মানুষ। এদের অনেককেই তিনি সাহায্য করেছেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ পেয়েছে, কারও সঙ্গে ছিল তাঁর দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। জেনিফার গোপনে কাঁদল। সে শুধু একজন বাবাকে হারায়নি, হারিয়েছে একজন শিক্ষক এবং গুরুকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে জেনিফার সিয়াটলে ফিরে গেল পড়াশোনা শেষ করতে। বাবা ওর জন্য যৎসামান্য সঞ্চয় রেখে গেছেন, হাজার ডলারও হবে না। জেনিফারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ও কী করবে। জানে কেলসোতে ফিরে আইন প্র্যাকটিস করা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ ওখানে সবাই ওকে সেই ছোট্ট মেয়েটি বলেই ভাববে যার মা কৈশোরে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছেন।

পড়াশোনায় খুব ভালো ফলাফল করার সুবাদে জেনিফার ডজনখানেক সেরা ল ফার্মে চাকরির জন্য ইন্টারভ্যু দিল। পেল অনেক অফার।

ক্রিমিনাল ল প্রফেসার ওয়ারেন ওকস ওকে বললেন, 'দ্যাটস আ রিয়েল ট্রিবিউট, ইয়ং লেডি। ভালো একটি ল ফার্মে ঢোকা মেয়েদের জন্য সত্যি খুব কঠিন।'

জেনিফারের সমস্যা হলো ওর কোনও বাড়িঘর নেই, নেই কোনও শিকড়। ও নিজেও জানে না কোথায় থাকবে।

তবে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরে জেনিফারের সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। প্রফেসর ওকস ওকে ক্লাসের পরে দেখা করতে বললেন।

'ম্যানহাটানের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কাছ থেকে চিঠি এসেছে। তিনি আমাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটিকে চাইছেন। যাবে?'

নিউইয়র্ক। 'জ্বী, স্যার।' জেনিফার এমনই অবাক হয়েছে, ফট করে জবাবটা কখন মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে নিজেও জানে না।

বার-এর পরীক্ষা দিতে নিউইয়র্ক উড়ে গেল জেনিফার। এবং কেলসোতে ফিরে এল বাবার ল অফিস বন্ধ করে দিতে।

ইউনিভার্সিটির ল লাইব্রেরিতে সহকারীর একটা চাকরি পেয়ে গেল জেনিফার। অপেক্ষা করতে লাগল নিউইয়র্কের বার-এর পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য।

'দেশের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এটা,' ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন প্রফেসর ওকস।

কেমন কঠিন পরীক্ষা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে জেনিফার।

জেনিফার যেদিন জানল ও পরীক্ষায় পাস করেছে, একই দিনে নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে চিঠি এল চাকরির অফার নিয়ে।

এক হপ্তা বাদে পুবে উড়াল দিল জেনিফার।

থার্ড এভিন্যুতে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করল জেনিফার। অ্যাপার্টমেন্টে ছোট একটি লিভিংরুম। একটি কাউচ আছে। ওটাই উল্টে দিলে বিছানায় রূপান্তরিত হয়। কালো রঙ করা জানালাসহ খুদে একটি বাথরুম। আসবারের চেহারা দেখে মনে হয় স্যালভেশন আর্মি দান করেছে।

তবে এ জায়গায় তো আর সারাবছর বাস করতে যাচ্ছি না, নিজেকে শোনায় জেনিফার। এটা অস্থায়ী নিবাস। আইনজীবী হিসেবে পসার জমলেই এ অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেব।

জেনিফারের স্বপ্ন ছিল ওটা। কিন্তু বাস্তবতা হলো নিউইয়র্কে আসার বাহাত্তর ঘণ্টার মাথায় ওকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে এবং মুখোমুখি হচ্ছে ডিসবারমেন্টের।

খবরের কাগজ এবং পত্রিকা পড়া বাদ দিল জেনিফার। টিভিও দেখে না। কারণ সবকিছুতেই ওর চেহারা এবং ছবি। ও টের পায় রাস্তা এবং বাজারে লোকজন ওর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। নিজের ক্ষুদ্র অ্যাপার্টমেন্টে লুকিয়ে থাকতে শুরু করল জেনিফার, ফোন এলেও ধরে না, বেল বাজলে খোলে না দরজা। ব্যাগ ব্যাগেজ গুছিয়ে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার কথা ভেবেছে ও। চিন্তা করেছে গলায় রশি বেঁধে ঝুলে পড়বে সিলিং-এ। সে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভাকে উদ্দেশ্য করে। চিঠির অর্ধেক জুড়ে থাকে অ্যাটর্নির সংবেদনহীনতা ও মানুষকে বুঝতে

না-পারার তীব্র সমালোচনা, বাকি অর্ধেকে কেবলই ক্ষমা প্রার্থনা। যেন ওকে আরেকটা সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু একটি চিঠিও পোস্ট করা হয় না।

জীবনে এই প্রথম হতাশা কী জিনিস তা টের পেল জেনিফার। নিউইয়র্কে তার কোনও বন্ধু নেই, নেই কথা বলার সঙ্গী। সারাদিন নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে থাকে ও, গভীর রাতে মহানগরীর জনশূন্য রাস্তায় হাঁটতে বেরোয়। ভবঘুরেরা কখনও ওকে বিরক্ত করে না। হয়তো তারা জেনিফারের চোখে দেখতে পায় নিজেদের একাকিত্ব এবং নৈরাশ্য।

জেনিফার রাস্তায় হাঁটে আর চোখের সামনে আদালতের সেই দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। নির্বোধের মতো একটা পদক্ষেপ ওকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এবং এখনও—কে বলে ও ধ্বংস হয়ে গেছে? প্রেস? ডি সিলভা? নিজের ডিসবারমেন্টের ব্যাপারে আর একটি কথাও শোনেনি জেনিফার। *আমি আইনজীবী*, ভাবে ও, অনেক ল ফার্ম আছে যারা আমাকে লুফে নেবে।

নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে জেনিফার একটি তালিকা বের করল। ল ফার্মের ঠিকানা আছে এতে। এদের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। একের পর এক ফোন করল ও। কিন্তু যারা ওর পরিচিত তাদের কাউকে পেল না ফোনে। কেউ ওকে কলব্যাকও করল না। জেনিফারের চারদিন সময় লাগল বুঝে উঠতে যে সে এ পেশায় এখন অচ্ছুৎ মানুষ। মামলা নিয়ে উন্মাদনার অবসান ঘটলেও ঘটনাটা কেউই আসলে ভোলেনি।

কাজ জুটতে পারে এরকম সম্ভাব্য চাকুরিদাতাদের কাছে ফোন করে যেতে লাগল জেনিফার। কিন্তু কেবল হতাশা আর বিতৃষ্ণাই ওর সঙ্গী হলো। জেনিফার এখন ভাবছে বাকি জীবনটা কি তাহলে ওর এভাবেই কেটে যাবে? ও আর কিছু চায় না, শুধু আইন প্রাকটিস করতে চায়। সে একজন আইনজীবী, গড, ওরা ওকে থামিয়ে দেয়ার আগেই, ওর পেশার কাজ শুরু করার জন্য একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

ম্যানহাটানের ল অফিসগুলোতে ঢুঁ দিতে লাগল জেনিফার। রিসেপশনিস্টকে নিজের নাম বলে পার্সোনেল হেডের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। মাঝে মাঝে দেখা করার সুযোগ মিলল বটে তবে জেনিফার বুঝতে পারল এরা স্রেফ ওকে সামনাসামনি একটু দেখে কৌতূহল মেটাতে চাইছে। ও যেন চিড়িয়াখানার অদ্ভুত কোনও জন্তু। মুখোমুখি জেনিফার দেখতে কেমন তা জানার আগ্রহে এরা যেন মরে যাচ্ছে। তবে বেশিরভাগ জায়গা থেকে শোনা গেল : 'কর্ম খালি নাই।'

দেড় মাসের মাথায় জেনিফারের সঞ্চয়ে টান পড়ল। ওকে সস্তা কোনও অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যেতে হবে। কিন্তু সস্তা কোনও অ্যাপার্টমেন্ট নেই। নাশতা এবং লাঞ্চ খাওয়া

প্রায় বাদ দিল জেনিফার। সকালের নাশতা খেলে সেদিন দুপুরে আর লাঞ্চ করে না। আবার লাঞ্চ খেলে সকালে নাশতা খায় না। রাস্তার ধারের ছোট ছোট রেস্টুরেন্টের খাবারের মান ভালো না, তবে দামে সস্তা। রাতে এসব রেস্টুরেন্টে খেতে লাগল জেনিফার। খুঁজে বার করল স্টিক অ্যান্ড ব্রু এবং রোস্ট অ্যান্ড ব্রু। এখানে কম পয়সায় পেট ভরে খাওয়ার সুযোগ আছে। যত ইচ্ছে সালাদ আর বিয়ার খাও কেউ মানা করবে না। জেনিফার বিয়ার দুচক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু এটা খেলে পেটটা তো ভরে।

বড়বড় ল ফার্মে ফোন করেও কাজ না-হওয়ার পরে ছোট ফার্মগুলোতে ফোন করতে লাগল জেনিফার। কিন্তু ওর কুখ্যাতির খবর ওদেরও অজানা নেই। কেউ ওকে চাকরি দিল না। মরিয়া হয়ে উঠল জেনিফার।

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত পিষে ভাবল জেনিফার, 'কেউ যদি আমাকে চাকরি দিতে না চায় তো না দেবে। আমি নিজের ল অফিস খুলব।'

কিন্তু মুশকিল হলো অফিস খুলতে পয়সা লাগে। টাকার অঙ্কও কম নয়–কমপক্ষে দশ হাজার ডলার। অফিস খুলতে হলে ওকে অফিস ভাড়া করতে হবে, লাগবে টেলিফোন, একজন সেক্রেটারি, আইনের বইপত্র, একটি ডেস্ক, চেয়ার, স্টেশনারি...অথচ স্ট্যাম্প কেনার পয়সাই নেই ওর কাছে।

জেনিফার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে বেতন পাবার আশা করেছিল। কিন্তু সে আশায় এখন গুড়ে বালি। নাহ্, নিজের অফিস খোলার কোনও সুযোগই নেই জেনিফারের, সে যত কম অঙ্কের টাকাই লাগুক না কেন। ওকে এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে যার সঙ্গে অফিস শেয়ার করা যায়।

জেনিফার দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর একটি কপি কিনে অফিস ভাড়ার বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাতে লাগল। কাগজের একদম নিচে একটি ছোট বিজ্ঞাপন ওর নজর কাড়ল

Wanted : Prof man Sh Sm off W/2 oth/Prof men. RS rent.

শেষ শব্দদুটোই জেনিফারের মনে জাগিয়ে তুলল আশার আলো। ও প্রফেশনাল নয় তবে লিঙ্গ কোনও ব্যাপার নয়। ও বিজ্ঞাপনটি কেটে নিল, তারপর সাবওয়ে ট্রেনে চেপে বসল ঠিকানা অনুসারে।

লোয়ার ব্রডওয়ের ভগ্নপ্রায়, পুরোনো একটি ভবনে বিজ্ঞাপনের অফিসটি। দশ তলায়। দরজায় একটি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা :

KENNETH BAILEY

ACE INVEST GA IONS

নিচে

ROCKFELLER CLLECTION AG NCY

বুক ভরে দম নিল জেনিফার, দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে। ছোট, জানালাবিহীন একটি অফিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ও। তিনটে ডেস্ক আর খানকয়েক চেয়ার ছড়ানো-ছিটানো। এর মধ্যে দুটি ডেস্কে মানুষ আছে।

একটি ডেস্ক দখল করেছে টাকমাথা, মলিন, জীর্ণ পোশাক পরা মধ্যবয়স্ক এক লোক। সে কাগজে কী যেন লিখছে। তার বিপরীতে দিকের দেয়ালের ডেস্কে বসেছে ত্রিশোর্ধ্ব এক লোক। ইটরঙা লাল চুল, ঝকঝকে নীল চোখ। এর গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে, বুটিতে ভরা। পরনে টাইট-ফিটিং জিন্স, টি-শার্ট এবং মোজা ছাড়া সাদা ক্যানভাসের জুতো। ফোনে কথা বলছে সে।

'আপনি একদম দুশ্চিন্তা করবেন না, মিসেস ড্রেসার। আপনার কেস নিয়ে কাজ করছে আমার সেরা দুই অপারেটিভ। যে-কোনোদিন আপনার স্বামীর খবর পেয়ে যাবার আশা করছি। তবে আপনাকে আরও কিছু পয়সা খরচা করতে হবে...না, না, ডাকে কখনও টাকা পাঠাবেন না। ডাকের টাকা খোয়া যায়। আমি আজ বিকেলেই আপনাদের ওদিকটাতে একবার যাব ভাবছি। তখন টাকাটা নিয়ে আসব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল জেনিফারকে।

সিধে হলো সে, মুখে ফুটিয়ে তুলল হাসি, বাড়িয়ে দিল শক্তিশালী, মজবুত একটি হাত।

'আমি কেনেথ বেইলি। আপনার জন্য কী খেদমত করতে পারি, বলুন?'

জেনিফার ছোট, গুমোট স্বল্প পরিসরের ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আ-আমি আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।'

'আচ্ছা!' লোকটার নীল চোখে বিস্ময়।

টেকো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেনিফারের দিকে। কেনেথ বেইলি বলল, 'ইনি অটো ওয়েনজেল। ইনিই রকফেলার কালেকশন এজেন্সি।'

মাথা দোলাল জেনিফার। 'হ্যালো,' ফিরল কেনেথ বেইলির দিকে। 'আর আপনি এইস ইনভেস্টিগেশন?'

'জ্বী। আর আপনার?'

'আমার-?' তারপর বুঝতে পেরে জেনিফার বলল, 'আমি একজন অ্যাটর্নি।'

কেনেথ বেইলি সংশয় নিয়ে দেখল ওকে। 'আর আপনি এখানে একটি অফিস খোলার জন্য এসেছেন?'

জেনিফার ঘিঞ্জি অফিসের চারপাশে আরেকবার চোখ বুলাল, কল্পনায় দেখতে পেল দুই পুরুষের মাঝখানে খালি একটি ডেস্কে বসেছে।

'আমি একটু ঘুরে দেখতে চাই,' বলল ও। 'আমি এখনও শিওর না-'

'আপনাকে প্রতি মাসে নব্বুই ডলার ভাড়া দিতে হবে।'

'মাসে নব্বুই ডলার দিয়ে আমি এ বিল্ডিংটাই কিনে ফেলতে পারি।' বলল জেনিফার। চলে যাবার জন্য ঘুরল।

'অ্যাই, এক মিনিট।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জেনিফার।

কেনেথ বেইলি নিজের ফ্যাকাশে গালে হাত বুলাল।

'আপনার জন্য একটা চুক্তি করতে চাই। ষাট ডলার। আপনার ব্যবসা যখন ভালোভাবে গড়িয়ে চলতে শুরু করবে তখন আমরা ভাড়া বাড়ানোর কথা বলব।'

জেনিফার জানে এ ভাড়ায় এরচেয়ে ভালো জায়গা সে পাবে না। যদিও এখানে কোনও মক্কেল আসবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ওর কাছে ষাট ডলার নেইও।

'আমি নেব,' তবু বলল ও।

'আপনাকে এজন্য পস্তাতে হবে না,' বলল কেনেথ বেইলি।

'আপনার জিনিসপত্র কবে নিয়ে আসতে চান?'

'নিয়ে এসেছি।'

কেনেথ বেইলি নিজেই দরজায় সাইনবোর্ড ঝোলাল। তাতে লেখা :

জেনিফার পার্কার

অ্যাটর্নি অ্যাট ল

সাইনবোর্ড দেখে মিশ্র অনুভূতি হলো জেনিফারের। ও কখনও ভাবতে পারেনি একজন শখের গোয়েন্দা এবং একজন বিল কালেক্টরের নিচে ওর নামটি শোভা পাবে। তবু আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা নিজের নামটির দিকে তাকালে গর্ব জাগে বুকে। সে একজন অ্যাটর্নি। দরজার ওই সাইনবোর্ড তা-ই প্রমাণ করে।

জেনিফারের অফিস হয়েছে কিন্তু একজন মক্কেলও জোটেনি কপালে।

এখন স্টিক অ্যান্ড ক্রুতে গিয়ে খাওয়ার সামর্থ্যও নেই ওর। সকালে নাশতা সারে শুধু টোস্ট আর কফি দিয়ে। লাঞ্চ খাওয়া বাদ দিল ও। ডিনার করে চক ফুল ও নাটস কিংবা জামজাম-এ। এখানে বড় বড় রুটি এবং গরম পটেটো সালাদ পাওয়া যায়।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টায় অফিসে চলে আসে জেনিফার। কিন্তু বসে বসে কেনেথ বেইলি এবং অটো ওয়েনজেলের ফোনালাপ শোনা ছাড়া আর কোনও কাজ থাকে না ওর।

কেনেথ বেইলির কাছে যেসব কেস আসে তার বেশিরভাগ ঘরপালানো ছেলেমেয়ে কিংবা দম্পতির কেস। শুরুতে জেনিফার ভেবেছিল কেনেথ বেইলি বুঝি

মস্ত গোয়েন্দা, বড় বড় কাজ পায়, দুহাতে কামায়। কিন্তু শীঘ্রি বুঝতে পারল লোকটা কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু উপার্জন হয় সামান্যই।

অটো ওয়েনজেল এক প্রহেলিকা। তার টেলিফোন অনবরত বাজতেই থাকে। সে ফোন তোলে, অল্প কয়েকটা কথা বলে, দ্রুত কী যেন লিখে নেয় কাগজে। তারপর কয়েক ঘণ্টার জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

'অস্কার রেপো'র কাজ করে,' একদিন জেনিফারকে বলল কেন বেইলি।

'রেপো?'

'হুঁ। কালেকশন কোম্পানিগুলো ওকে ব্যবহার করে অটোমোবাইল, টিভি, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি কেনা-বেচার জন্য।' জেনিফারের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আপনি কোনও ক্লায়েন্ট পাননি?'

'পাব,' অস্পষ্ট গলায় জবাব দেয় জেনিফার।

মাথা ঝাঁকাল কেন। 'হতাশ হবেন না। ভুল সবাই করে।'

রাঙা হয়ে ওঠে জেনিফারের গণ্ডদেশ। ও তাহলে সব জানে! কেন বেইলি প্যাকেট খুলে বেশ বড়সড় একটি রোস্ট বিফ স্যান্ডউইচ বের করল। 'চলবে?'

দেখেই বোঝা যায় সুস্বাদু। 'না, ধন্যবাদ,' দৃঢ় গলায় বলল জেনিফার। 'আমি লাঞ্চ খাই না।'

'ঠিক আছে।'

জেনিফার দেখল কেন রসাল স্যান্ডউইচটি গপগপ করে খাচ্ছে। ওর চেহারার অভিব্যক্তি দেখে কেনেথ বলল, 'খান না এক কামড়–'

'না, ধন্যবাদ। আ–আমার একটা কাজ আছে।'

কেনেথ বেইলি দেখল অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জেনিফার। চেহারায় চিন্তার ছাপ ফুটল তার। সে মানুষের চেহারা দেখে বলে দিতে পারে কে কী রকম। কিন্তু জেনিফার তাকে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। টিভি এবং খবরের কাগজ ঘেঁটে সে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল মাইকেল মোরেত্তির মামলা ধ্বংস করার জন্য এ মেয়েটিকে কেউ টাকা দিয়েছে। কিন্তু জেনিফারকে দেখার পরে তার ধারণায় ফাটল ধরেছে। একবার বিয়ে করে নরকযন্ত্রণার মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছিল ওকে। মেয়েদেরকে সে তারপর থেকে এড়িয়ে চলে, পাত্তা দিতে চায় না। তবে জেনিফারকে মনে হচ্ছে সবার থেকে আলাদা। মেয়েটি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং খুব অহংকারী।

জেসাস! নিজেকে চোখ রাঙাল কেন। ওই মেয়েকে নিয়ে কিছু কল্পনা করতে যেয়ো না। তাহলে কপালে খারাবি আছে।'

জেনিফার ইয়েলো পেজ ঘেঁটে বর্ণনাক্রমিক অনুসারে ল অফিসগুলোতে ফোন করে চাকরির সন্ধান করেছে। টেলিফোন বুদ থেকে সে ফোন করে। কারণ কেন বেইলি

এবং অটো ওয়েনজেল তার কথা শুনে ফেললে বড্ড লজ্জা পাবে জেনিফার। ফলাফল সবসময় একরকম। কেউ ওকে কাজ দিতে আগ্রহী নয়। ওকে হয়তো শেষতক কেলসোতেই ফিরে গিয়ে তার বাবার কোনও বন্ধুর অফিসে সেক্রেটারি কিংবা লিগাল এইডের চাকরি খুঁজতে হবে। অথচ এ কাজ করার কথা কিছুদিন আগে কল্পনাও করতে পারত না জেনিফার। তিক্ত একটা পরাজয় ঘটেছে ওর। কিন্তু কোনও বিকল্পও তো নেই। ব্যর্থ মানুষ হিসেবে বাড়ি ফিরতে হবে ওকে। তবে বাড়ি যে ফিরবে সে টাকাও তো নেই। বিকেলের *নিউইয়র্ক পোস্ট*-এ চোখ বুলাতে গিয়ে দেখতে পেল একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সিয়াটলে শেয়ারে যাওয়া যাবে। টেলিফোন নাম্বারও দেয়া আছে। ফোন করল জেনিফার। সাড়া মিলল না। সিদ্ধান্ত নিল কাল সকালে আবার চেষ্টা করবে।

পরদিন সকালে শেষবারের মতো অফিসে গেল জেনিফার। অটো ওয়েনজেল অফিসে নেই, কেন বেইলি আছে। যথারীতি কথা বলছে ফোনে। পরনে নীল জিন্স এবং ভীনেক কাশ্মিরি সুয়েটার।

'আমি আপনার স্ত্রীর খোঁজ পেয়েছি,' বলছে কেন। 'সমস্যা হলো উনি বাড়ি ফিরতে চাইছেন না...জানি আমি। নারীদের কেইবা চিনতে পারে?...ঠিক আছে আমি জানাব আপনাকে উনি কোথায় আছেন। দেখেন মিষ্টি কথা দিয়ে পটিয়ে পটিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারেন কিনা।'

একটি হোটেলের ঠিকানা দিল সে। 'মাই প্লেজার।' বলে রেখে দিল ফোন। ঘুরতেই দেখতে পেল জেনিফারকে। 'আজ অফিসে আসতে দেরি হলো যে?'

'মি. বেইলি, আ-আমি আজ চলে যাচ্ছি। যখনই সম্ভব হবে আপনাদের ভাড়ার টাকাটা পাঠিয়ে দেব।'

চেয়ারে হেলান দিল কেন বেইলি। তাকিয়ে আছে জেনিফারের দিকে। তার দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করল জেনিফার।

'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন?'

মাথা দোলাল জেনিফার।

কেন বেইলি বলল, 'যাওয়ার আগে আমার একটা উপকার করবেন? এক ল ইয়ার বন্ধু আমাকে খুব করে ধরেছে যেন তার জন্য কিছু সপিনার ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু তার কাজ করার সময় পাচ্ছি না। সে প্রতিটি সাপিনার জন্য সাড়ে বারো ডলার করে দেবে, সেইসঙ্গে ভ্রমণভাতাও। আপনি কি দয়া করে কাজটা করে দেবেন?

একঘণ্টা পরে জেনিফার পার্কার চলে এল পিবডি অ্যান্ড পিবডি'র অভিজাত ল অফিসে। এরকম ফার্মে কাজ করার স্বপ্ন দেখত ও। ওকে অফিসের পেছনদিকে,

ছোট একটি রুমে নিয়ে আসা হলো। এক বেজায় ক্লান্ত চেহারার সেক্রেটারি জেনিফারের হাতে একগাদা সাপনা গুঁজে দিল।

'এই যে আপনার জিনিস। ভ্রমণে কত খরচ হয় তার একটা রেকর্ড রাখবেন। আপনার নিশ্চয় গাড়ি আছে?'

'জ্বী না। আমার গাড়ি নেই।'

'সাবওয়ে ব্যবহার করলে কত ভাড়া দিতে হলো লিখে রাখবেন।'

জেনিফারের বাকি দিনটি কেটে গেল ব্রনক্স, ব্রুকলিন এবং কুইন্সে সাপনা পাঠানোর কাজে। রাত আটটার মধ্যে পঞ্চাশ ডলার আয় করে ফেলল জেনিফার।

বিধ্বস্ত, শীতে জড়োজড়ো হয়ে নিজের ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল ও। যাক, তবু কিছু টাকা তো আয় হয়েছে। নিউইয়র্কে আসার পরে ওর প্রথম উপার্জন। সেক্রেটারি বলেছে ওকে সাপিনার আরও কাজ দেবে। কঠিন কাজ। গোটা শহর ঘুরতে হয়। অপমানজনকও বটে। অনেকে ওর মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। দুজায়গায় ওকে কুপ্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আবার এ কাজ করতে হবে ভাবলে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে দেহমন। তবু নিউইয়র্কে ও যে কদিন থাকবে, একটা ক্ষীণ আশার আলো তো জ্বলবে।

জেনিফার গরম পানির বাথে আস্তে আস্তে ডুবিয়ে দিল শরীর। শরীরে গরম পানির উষ্ণ পরশ। রোমাঞ্চ বোধ করছে ও। এমন ক্লান্ত ও। শরীরের প্রতিটি পেশি ব্যথা করছে। গোসল সেরে আজ পেট পুরে খাবে জেনিফার। ভালো কোনও রেস্তোরাঁয় যাবে যেখানকার টেবিলে সাজানো থাকে ন্যাপকিন। *হয়তো ওখানে মৃদু লয়ের সংগীত বাজতে থাকবে। আমি এক গ্লাস হোয়াইট ওয়ান খেতে খেতে–*

সুখকল্পনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল ডোরবেলের কর্কশ আওয়াজে। নিশ্চয় বাড়িউলি এসেছে বকেয়া ভাড়া চাইতে। জেনিফার শুয়ে থাকল টাবে, আশা করল ওর সাড়া না পেয়ে চলে যাবে বুড়ি।

আবার বাজল ডোরবেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গরম টাব থেকে শরীরটাকে টেনে তুলল জেনিফার। রোব পেঁচাল গায়ে। চলে এল দরজায়।

'কে?'

পুরুষালি একটা কণ্ঠ ভেসে এল দরজার ওপাশ থেকে।

'মিস জেনিফার পার্কার?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম অ্যাডাম ওয়ার্নার। আমি একজন অ্যাটর্নি।'

বিস্মিত জেনিফার দরজায় চেইন লাগিয়ে সামান্য ফাঁক করল কপাট। হল-এ দাঁড়িয়ে আছে মধ্য-ত্রিশের এক সুপুরুষ। লম্বা, সোনালি চুল, চওড়া কাঁধ, হরিণের

শিঙের চশমার আড়ালে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত নীলচে ধূসর রঙের চোখ। পরনে যত্ন করে ছাঁটা দামি সুট।

'ভেতরে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

ছ্যাচড়া গুণ্ডারা সুট পরে না, তাদের পায়ে গুচির জুতো এবং গলায় সিল্কের টাই ঝোলে না। তাদের হাত লম্বা এবং সুন্দর নয়, আর হাতের নখও সুন্দরভাবে কাটা থাকে না।

'এক মিনিট।'

চেইন খুলল জেনিফার। মেলে দিল কপাট। ভেতরে ঢুকল অ্যাডাম ওয়ার্নার।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. ওয়ার্নার?'

জেনিফার হঠাৎ বুঝতে পারল এ লোক কেন এখানে এসেছে। উত্তেজনা বোধ করল ও। নিশ্চয় ওর চাকরি হয়ে গেছে। এ লোক সে খবর দিতেই এসেছে–

অ্যাডাম ওয়ার্নার বলল, 'আমি নিউইয়র্ক বার অ্যাসোসিয়েশনের ডিসিপ্লিনারি কমিটির একজন সদস্য, মিস পার্কার। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা এবং জাজ লরেন্স ওয়াল্ডম্যান অ্যাপলেট ডিভিশনকে আপনার বিরুদ্ধে ডিসবারমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু করার অনুরোধ করেছেন।'

চার

নিউহ্যাম, ফিঞ্চ, পিয়ার্স অ্যান্ড ওয়ার্নারের ল অফিস ৩০, ওয়ালস্ট্রিটে। ভবনটির পুরো ফ্লোর দখল করে রেখেছে এ অফিস। ফার্মে আইনজীবীর সংখ্যা ১২৫। আইন ব্যবসায় অত্যন্ত বিখ্যাত একটি নাম এ ফার্ম।

অ্যাডাম ওয়ার্নার এবং স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম তাদের সকালবেলার চা পান করছে। স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম চটপটে, হালকা-পাতলা গড়নের ষাটোর্দ্ধ একজন মানুষ। মুখে ভ্যানডাইক মার্কা দাড়ি, পরনে টুইডের সুট এবং ভেস্ট। দেখলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মানুষ। তবে তাঁর শতাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিডহ্যামকে এরকম কিছু ভেবে নিয়ে মহা ধরা খেয়েছে। তারা ধরা খেয়ে শিখেছে নিডহ্যাম আসলে বিংশ শতকের আধুনিকতম ধ্যান-ধারণাকে দারুণভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি নিজের জগতে একটি দানব বিশেষ। তবে সবসময় নেপথ্যে থেকে কাজ করতে ভালোবাসেন ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের এবং জাতীয় রাজনীতির রাঘব বোয়ালদের দারুণ দহরম মহরম সম্পর্ক রয়েছে। এবং ব্যবসার প্রয়োজনে এসব প্রভাব খাটাতে তিনি কসুরও করেন না।

অ্যাডাম ওয়ার্নার নিডহ্যামের ভাতিঝি মেরী বেথকে বিয়ে করেছে। সে নিডহ্যামের উত্তরসূরী। অ্যাডামের বাবা ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সিনেটর। অ্যাডাম নিজে একজন অত্যন্ত চৌকশ এবং প্রতিভাবান আইনজীবী। হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করার পরে দেশের নামকরা সব ল ফার্ম তাকে তাদের ফার্মে নেয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সে নিডহ্যাম, ফিঞ্চ অ্যান্ড পিয়ার্স ল ফার্মকে বেছে নেয়। সাত বছর পরে এ ফার্মের একজন পার্টনার বনে যায় অ্যাডাম। সে দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন এবং আকর্ষণীয়। একই সঙ্গে বুদ্ধিমানও বটে। তার বুদ্ধিমত্তা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা। আত্মপ্রত্যয়ী অ্যাডামের এই গুণটি নারীদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তবে অ্যাডাম তার নারী মক্কেলদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে সযত্নে নিজেকে দুরে রেখেছে। মেরী বেথের সঙ্গে তার চৌদ্দবছরের দাম্পত্য সম্পর্ক। পরকীয়া প্রেম পছন্দ করে না অ্যাডাম।

'আরেকটু চা নেবে, অ্যাডাম?' জিজ্ঞেস করলেন স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম।

'না, ধন্যবাদ,' চা মোটেই পছন্দের পানীয় নয় অ্যাডামের। তবে গত আটবছর ধরে প্রতিদিন সকালে সে চা পান করে চলেছে শুধুমাত্র তার পার্টনারের মনে আঘাত দিতে চায় না বলে।

স্টুয়ার্ট নিডহ্যামের মাথায় দুটো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'কাল রাতে আমার ক'জন বন্ধুর সঙ্গে কথা হলো।, 'ক'জন বন্ধু' মানে দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালীদের কয়েকজন। 'তাঁরা চাইছেন তুমি যেন ইউনাইটেড স্টেটস সিনেটর পদে নির্বাচন কর, অ্যাডাম।'

উল্লাস অনুভব করল অ্যাডাম। স্টুয়ার্ট নিডহ্যামকে সে জানে। ভদ্রলোক বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছেন মানে খেজুরে আলাপ করেননি, ওকে নিয়ে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে যা হয়তো এ মুহূর্তে তিনি বলতে চাইছেন না।

'তবে আসল প্রশ্ন হলো তুমি এ ব্যাপারে আগ্রহী কিনা। আগ্রহী হওয়া মানে তোমার জীবনে প্রচুর পরিবর্তন ঘটা।'

এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন অ্যাডাম ওয়ার্নার। ইলেকশনে জিতলে ওকে ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যেতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে আইন ব্যবসা, সম্পূর্ণ নতুন একটা জীবন শুরু হবে। ও জানে ব্যাপারটা উপভোগ করবে মেরী; তবে ও নিজে বিষয়টা কতটা উপভোগ করবে সে বিষয়ে নিশ্চিত নয় অ্যাডাম। তবে এ কথা ও মনে মনে স্বীকার করে যে ক্ষমতার মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ আছে।

'আমি যথেষ্ট আগ্রহী, স্টুয়ার্ট।'

সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা ঝাঁকালেন স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম। 'গুড, ওরা শুনলে খুশি হবেন।' তিনি টী-পট থেকে আরেক কাপ চা ঢেলে নিলেন কাপে। চায়ের স্বাদ বাড়াতে কী যেন একটা জিনিস এতে মেশান স্টুয়ার্ট। তাতে স্বাদ তো বাড়েইনি, বরং ভয়ংকর বিস্বাদ লাগে খেতে। এই চা-ই চুপচাপ গিলতে হয় অ্যাডামকে।

দ্বিতীয় যে চিন্তাটি স্টুয়ার্টের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, সে বিষয়ে এবার চলে এলেন তিনি। 'বার সংস্থার ডিসিপ্লিনারি কমিটির ছোট একটি কাজ আছে। ওরা তোমাকে দিয়ে কাজটা করাতে চাইছে, অ্যাডাম। কাজটা করতে দু'এক ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না।'

'কী কাজ?'

'মাইকেল মোরেট্টির ট্রায়াল। ববি ডি সিলভার এক তরুণ সহকারীকে কেউ ঘুস দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছে মোরেট্টিকে।'

'ঘটনাটা আমি কাগজে পড়েছি। ক্যানারি বিষয়ক ঘটনা তো?'

'হুঁ। জাজ ওয়াল্ডম্যান এবং ববি আইনজীবীর পেশা থেকে মেয়েটির নাম মুছে ফেলতে চায়। আমিও চাই না ওইরকম একটা মেয়ে এরকম সম্মানজনক একটা পেশায় থাকুক।'

'ওরা আমাকে দিয়ে কী করাতে চায়?'

'একটা কুইক চেক করবে। প্রমাণ করবে এই পার্কার মেয়েটা ইল্লিগাল আচরণ করেছে, তারপর ডিসবারমেন্ট প্রসিডিং-এর জন্য সুপারিশ করবে। মেয়েটার কাছে শো-কজ নোটিশ পাঠানো হবে। তারপর বাকিটা ওরা সামলাবে। স্রেফ রুটিন একটা কাজ।'

অবাক হলো অ্যাডাম। 'কিন্তু আমি কেন, স্টুয়ার্ট? আমাদের তো তরুণ আইনজীবীদের অভাব নেই। তারাই তো কাজটা করতে পারে।'

'আমাদের সম্মানিত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বিশেষভাবে তোমার কথাই বলেছেন। তিনি দেখতে চান কাজটা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। 'শুকনো গলায় যোগ করলেন, 'ববি খুব নির্দয় স্বভাবের মানুষ। মেয়েটাকে সে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে ফেলতে চায়।'

অ্যাডামা ওর ব্যস্ত শিডিউলের কথা চিন্তা করছে।

'বলা যায় না ডি.এ'র অফিসকে হয় তো হুট করে আমাদের দরকার হয়ে পড়ল, অ্যাডাম।'

অ্যাডাম বুঝল বুড়ো চাইছেন ও যেন কাজটা করে দেয়।

'ঠিক আছে, স্টুয়ার্ট,' সিধে হলো অ্যাডাম।

'তুমি সত্যি আরেক কাপ চা খাবে না?

'নো, থ্যাংকস।'

অ্যাডাম ওয়ার্নার অফিসে ফিরে তার এক প্যারালিগাল সহকারী লুসিন্ডাকে ডাকল। লুসিন্ডা, বুদ্ধিমতী এক কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী।

'সিন্ডি, জেনিফার পার্কার নামে এক অ্যাটর্নি সম্পর্কে যাবতীয় যত তথ্য পাবে, সব আমার জন্য জোগাড় করে নিয়ে এসো।'

মুচকি হাসল লুসিন্ডা, 'সেই হলুদ ক্যানারি।'

সবাই জেনিফারের ঘটনাটা জানে।

সেদিন শেষ বিকেলে বাসায় বসে অ্যাডাম ওয়ার্নার 'দ্য পিপল অব নিউইয়র্ক ভার্সাস মাইকেল মোরেত্তি,' শিরোনামের কোর্ট প্রসিডিং-এর ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ছিল। এটি রবার্ট ডি সিলভা বিশেষ বার্তাবাহকের মাধ্যমে ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ে শেষ করতে মাঝরাত পার হয়ে গেল। অ্যাডাম আর মেরীর এক ডিনার পার্টিতে দাওয়াত ছিল। অ্যাডাম বউকে একাই পার্টিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। নিজের জন্য আনিয়ে নিয়েছে স্যান্ডউইচ। ট্রান্সক্রিপ্ট পড়া শেষে অ্যাডামের মনে কোনও সন্দেহ রইল না যে জেনিফার পার্কার যদি ভজকটটা না বাঁধাত তাহলে মাইকেল

মোরেত্তি অবশ্যই আদালতে দোষী বলে সাব্যস্ত হতো। ডি সিলভা বেশ আঁটঘাট বেঁধেই এ মামলা লড়তে নেমেছিলেন।

অ্যাডাম ট্রান্সক্রিপ্টে একটা পৃষ্ঠায় আবার মনোনিবেশ করল। জাজ ওয়াল্ডম্যানের চেম্বারে জেনিফারকে জেরা করার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এখানে।

ডি সিলভা : তুমি কলেজ গ্রাজুয়েট?

পার্কার : জ্বী, স্যার।

ডি সিলভা : এবং ল স্কুল গ্রাজুয়েট?

পার্কার : জ্বী, স্যার।

ডি সিলভা এক অচেনা লোক তোমার হাতে একটি প্যাকেজ তুলে দিয়ে একটা মার্ডার ট্রায়ালের এক প্রধান সাক্ষীর কাছে ওটা পৌঁছে দিতে বলেছে আর তুমি কাজটা করেছ? কাজটা কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়?

পার্কার : বিষয়টি ঠিক ওরকম ছিল না।

ডি সিলভা : তুমি তো বললে ওভাবেই ঘটেছে।

পার্কার আমি বলতে চাইছি, আমি লোকটাকে অচেনা কেউ মনে করিনি। ভেবেছি সে আপনার কর্মচারী।

ডি সিলভা : এরকম ভাবার কারণ কী?

পার্কার সে ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দিয়েছি। আমি দেখেছি সে আপনার সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সে একটা খাম নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে এবং আমার নাম ধরে ডাকে। সে বলে আপনি আমাকে খামটি সাক্ষীকে দিতে বলেছেন। পুরো ব্যাপারটিই এত দ্রুত ঘটে যায় যে–

ডি সিলভা আমার মনে হয় না ঘটনা অত দ্রুত ঘটেছে। আমি মনে করি পুরো বিষয়টাই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত কেউ তোমাকে ঘুস দিয়েছে ওটা ডেলিভারি দেয়ার জন্য।

পার্কার : এ কথা সত্য নয়। আমি–

ডি সিলভা : কী সত্য নয়? যে তুমি জানতে না যে তুমি খামটি ডেলিভারি দিচ্ছ?

পার্কার : আমি জানতাম না ওটার ভেতরে কী আছে।

ডি সিলভা : কাজেই এ কথা সত্য যে কেউ তোমাকে ঘুস দিয়েছিল।

পার্কার : আপনি যেভাবেই প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন আমি যা সত্য তা-ই বলব। আমাকে কেউ কিছু দেয়নি।

ডি সিলভা : তাহলে তুমি কাজটা এমনি এমনি করে দিয়েছ?

পার্কার : না, আমি ভেবেছি আপনার হুকুমে কাজটা করছি।

ডি সিলভা : তুমি বললে লোকটা তোমার নাম ধরে ডেকেছিল।

পার্কার : জ্বী।

ডি সিলভা : সে তোমার নাম জানল কী করে?

পার্কার : আমি জানি না।

ডি সিলভা : আহ্, সত্যি কথা বলো। মাইকেল মোরেত্তির সঙ্গে তোমার সঙ্গে প্রেম চলছে কদ্দিন ধরে?

পার্কার মি. ডি সিলভা। আমার যা বলার সব বলে দিয়েছি। আপনি আমাকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে জেরা করছেন। আমি ক্লান্ত। আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। আমি কি এখন যেতে পারি?

ডি সিলভা চেয়ার থেকে উঠলেই আমি তোমাকে গ্রেফতার করাব। তুমি বিরাট বিপদে আছ, মিস পার্কার। এখান থেকে বেরুবার একটাই মাত্র রাস্তা আছে। মিথ্যা ছেড়ে সত্যি বলো।

পার্কার আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছি। আমি যা জানি তার কোন কিছুই গোপন করিনি।

ডি সিলভা : যে লোকটা তোমাকে খাম দিয়েছে শুধু তার কথা বলনি। আমি তার নাম জানতে চাই এবং জানতে চাই সে তোমাকে কতটাকা ঘুস দিয়েছে।

ট্রান্সক্রিপ্টের আরও ত্রিশ পাতা রয়েছে। রবার্ট ডি সিলভা একটা রাবার হোস দিয়ে জেনিফার পার্কারকে ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলার সমস্ত আয়োজনই করেছেন। কিন্তু জেনিফার নিজের বক্তব্যে সর্বদা অটল থেকেছে।

ট্রান্সক্রিপ্ট বন্ধ করল অ্যাডাম। আঙুল দিয়ে ঘষল ক্লান্ত চোখ জোড়া। রাত দুটো বাজে। কাল সে জেনিফার পার্কারের সঙ্গে দেখা করবে।

জেনিফার পার্কার সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নিল অ্যাডাম। তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে জেনিফার কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়, মাইকেল মোরেত্তির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

একটা বিষয় অ্যাডামকে বেশ খোঁচাচ্ছে। জেনিফার পার্কারের ডিফেন্স খুবই ঠুনকো। সে যদি মোরেত্তির জন্য কাজ করেই থাকে, মোরেত্তি তাকে যুক্তিসঙ্গত একটি গল্প দাঁড়া করিয়ে ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। কিন্তু জেনিফারকে রক্ষা করার জন্য এখন পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি।

দুপুর বেলা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা ওকে ফোন করলেন।

'কেমন চলছে, অ্যাডাম?'

'ভালো, রবার্ট।'

'শুনলাম তুমি জেনিফার পার্কারের কাজটা নিয়েছ?'

'জ্বী।'

'ওর নাম-নিশানা আমি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কণ্ঠের প্রবল ঘৃণা হতবাক করে তুলল অ্যাডামকে।

'ইজি, রবার্ট। ওকে কিন্তু এখনও ডিসবারড করা হয়নি।'

খিক খিক হাসলেন ডি সিলভা। 'সে বিষয়টি আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম, বন্ধু। 'গলার স্বর হঠাৎ বদলে ফেললেন তিনি। 'শুনলাম তুমি নাকি শীঘ্রি ওয়াশিংটন যাচ্ছ। তোমাকে জানিয়ে রাখছি আমার সমস্ত সমর্থন তুমি পাবে।'

'ধন্যাবাদ, রবার্ট।'

'মাই প্লেজার, অ্যাডাম। তোমার কাছ থেকে খবর শোনার অপেক্ষায় রইলাম।'

খবর মানে জেনিফার পার্কারের খবর। ট্রান্সক্রিপ্ট পড়ে অ্যাডাম জেনেছে মেয়েটির রিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই। জেনিফার নিজে যদি স্বীকার না করে কিংবা কেউ যদি ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এগিয়ে না আসে, ডি সিলভা জেনিফারের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না। নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই তিনি বেছে নিয়েছেন অ্যাডামকে।

অ্যাডাম জেনিফারের ফাইল আবার তুলে নিল হাতে কিছু নোটস নিল তারপর দূরের কয়েকটি জায়গায় কয়েকটা ফোন করল।

পরদিন সকালে অ্যাডাম প্লেনে চড়ে ওয়াশিংটনের সিয়াটলে চলে এল। জেনিফার পার্কারের আইনের অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলল। একটি ল ফার্মে দুটি গ্রীষ্মে ক্লার্কের কাজ করেছিল জেনিফার। সেখানে গিয়েও ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিল অ্যাডাম। কথা বলল জেনিফারের প্রাক্তন কয়েকজনের ক্লাসমেটের সঙ্গে।

স্টুয়ার্ট নিডহ্যাম সিয়াটলে অ্যাডামকে ফোন করলেন। 'তুমি ওখানে কী করছ, অ্যাডাম? এখানে তোমার জন্য বিরাট একটি মামলা অপেক্ষা করছে। পার্কারের জন্য এত সময় নষ্ট কোরো না তো!'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানা জরুরি, স্টুয়ার্ট, 'বলল অ্যাডাম, 'আমি দু'একদিনের মধ্যেই ফিরছি।'

সিয়াটল ছেড়ে যখন নিজের শহরের উদ্দেশে উড়াল দিল অ্যাডাম সে তখন জেনিফার পার্কার সম্পর্কে অনেক খবরই জানে। জেনিফারের একটা ছবি এঁকে নিয়েছিল সে রবার্ট ডি সিলভার কথার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু জেনিফারের ল প্রফেসর, বাড়িউলি, ল

ফার্মের সদস্য, ক্লাসমেট ইত্যাদি সবার সঙ্গে সাক্ষাতের পরে ওই ছবিটি মন থেকে দূর করে দিয়েছে সে। কারণ মনছবির সঙ্গে জেনিফারের মিল হচ্ছিল না। জেনিফার সম্পর্কে সে অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছে। মাইকেল মোরেত্তির মত মানুষকে আদালত থেকে ছাড়িয়ে আনার প্লট সাজাতে মস্তবড় অভিনেত্রী হতে হয়। কিন্তু জেনিফার অভিনয় করেছে বলে মনে হচ্ছে না অ্যাডামের।

আর এখন, আজ সকালে সে দাঁড়িয়ে আছে জেনিফার পার্কারের সামনে। খবরের কাগজে জেনিফারের ছবি দেখেছে অ্যাডাম। তবে পুরোনো রোবে, মেকআপ ছাড়া কালো বাদামী চুলের জেনিফারকে তার রুদ্ধশ্বাস সুন্দরী মনে হলো।

অ্যাডামের কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠল জেনিফার। 'আপনাদের যা ইচ্ছা করুন গে। আমি বোকার মত একটা কাজ করে ফেলেছি বটে তবে যদ্দূর জানি বোকামোর বিরুদ্ধে এদেশে আইনগত শাস্তির কোনও বিধান নেই। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ধারনা আমি ঘুস নিয়েছি।' বাতাসে হাত ছুড়ল ও। 'ঘুস নিলে কি এরকম জঘন্য একটা জায়গায় থাকতাম আমি?' তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। 'আপনাদের যা খুশি করুন। আমি কেয়ার করি না। আমাকে একটু একা থাকতে দিন। প্লিজ, চলে যান!'

জেনিফার ঘুরেই ছুটল বাথরুমে, পেছনে দড়াম শব্দে বন্ধ হলো দরজা।

সিঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে রইল ও, ঘন ঘন শ্বাস করছে, হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিল চোখের অশ্রু। বোকার মত কাজটা হয়ে গেছে। ভদ্রলোক কী ভাবলেন! রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে গেলে সে আর এদেশে প্রাকটিস করতে পারবে না। নাহ্, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাওয়া যেত।

রোব খুলে নগ্ন শরীরে আবার বাথটাবের পানিতে শুয়ে পড়ল জেনিফার। বুজল চোখ। পানির স্পর্শে কী যে আরাম। ও প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠাণ্ডা লাগতে উঠে পড়ল। ওর আর খিদে নেই। অ্যাডাম ওয়ার্নার এসে খিদেটাই নষ্ট করে দিয়েছে।

চুল আঁচড়াল জেনিফার, মুখে ক্রিম ঘষল। সিদ্ধান্ত নিল ডিনার না করেই বিছানায় যাবে। সকালে ফোন করবে সিয়াটলে কীভাবে যাবে তা জানার জন্য। বাথরুমের দরজা খুলল ও, চলে এল লিভিংরুমে।

অ্যাডাম ওয়ার্নার বসে আছে একটি চেয়ারে, একটি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। মুখ তুলে চাইল। নগ্ন জেনিফারকে দেখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটল চোখে।

'আমি দুঃখিত,' বলল অ্যাডাম। 'আমি–'

অস্ফুট আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল জেনিফারের গলা চিরে। এক ছুটে ঢুকে পড়ল বাথরুমে। এখানে ও ওর রোব রেখে গেছে। রোবটা গায়ে পেঁচাল জেনিফার। আবার মুখোমুখি হলো অ্যাডামের। রাগে গনগন করছে জেনিফারের মুখ।

'ইনকুইজিশন ইজ ওভার। আমি আপনাকে চলে যেতে বলেছি।'

পত্রিকা নামিয়ে রেখে মৃদু গলায় অ্যাডাম বলল, 'মিস পার্কার, বিষয়টি নিয়ে আমরা কি খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?'

'না,' পুরোনো রাগটা আবার ফিরে এল জেনিফারের মাঝে। 'আপনার কিংবা আপনার ফালতু ডিসিপ্লিনারি কমিটির সঙ্গে আমার আর কোনও কথা নেই। আমার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা হচ্ছে যেন আমি মস্ত একটা অপরাধ করে বসেছি– আমি একটা জঘন্য অপরাধী!'

'আমি কি একবারও বলেছি আপনি অপরাধী?' মৃদু গলায় বলল অ্যাডাম।

'আপনি তো ও কথা বলতেই এখানে এসেছেন, তাই না?'

'আমি আপনাকে বলেছি আমি এখান কেন এসেছি। আমাকে ডিসবারমেন্ট প্রসিডিং-এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমি আপনার পক্ষে কাজ করতে চাই।'

'আচ্ছা। তো বিনিময়ে আমাকে কী দিতে হবে?'

শক্ত হয়ে গেল অ্যাডামের মুখ। 'আয়াম সরি, মিস পার্কার।' সিধে হলো সে। পা বাড়াল দরজায়।

'এক মিনিট।' ঘুরল অ্যাডাম।

'আমাকে মাফ করে দেবেন,' বলল জেনিফার। সবার কাছ থেকে বিশ্রী ব্যবহার পেতে পেতে আমার আসলে মাথার ঠিক নেই। আমি ক্ষমা চাইছি।

'আপনার ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো।'

জেনিফার হঠাৎ পরনের ফিনফিনে পাতলা রোব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। 'আমাকে কি আর কোনও প্রশ্ন করবেন? তাহলে পোশাকটা একটু বদলে আসি।'

'অনেক প্রশ্ন আছে। ডিনার করেছেন?'

ইতস্তত করল জেনিফার। 'আমি–'

'ছোট্ট একটি ফরাসী রেস্টুরেন্ট চেনা আছে আমার। ওখানে বসে আলাপ সালাপ করা যাবে।'

ইস্ট সাইডের ফিফটি সিক্সথ স্ট্রিটে একটি চমৎকার, মনোরম পরিবেশে রেস্টুরেন্টটির অবস্থান।

'এ জায়গার খবর জানে খুব কম লোকই,' রেস্টুরেন্টে বসার পরে জেনিফারকে বলল অ্যাডাম ওয়ার্নার। 'এর মালিক এক ফরাসী দম্পতি। তারা লেস পেরিনেজে কাজ করে। এখানকার খাবার অতুলনীয়।'

সারাদিন খাওয়া হয়নি জেনিফারের তবে এমন নার্ভাস হয়ে আছে যে গলা দিয়ে

খাবার নামতে চাইছে না। রিল্যাক্সড হবার চেস্টা করল। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। যতই ভান করুক ওর সামনে বসা সুদর্শন মানুষটা তো আসলে ওর শত্রু। মানুষটা সুদর্শন, মনে মনে স্বীকার করল জেনিফার। হাসিখুশি এবং আকর্ষণীয়। অন্য সময় হলে সন্ধ্যাটা দারুণ উপভোগ করত ও। কিন্তু এখন সময়টা সে সময় নয়। তার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এ আগন্তুকের হাতে। আর দু'এক ঘণ্টার মধ্যে, নির্ধারিত হয়ে যাবে জেনিফারের জীবন কোন ধারায় প্রবাহিত হবে।

জেনিফারকে রিল্যাক্স করে তোলার নানারকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাডাম। সে কদিন আগে জাপান থেকে ঘুরে এসেছে। ওখানে সরকারের দুজন শীর্ষস্থানীয় আমলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। অ্যাডামের সম্মানে বিশেষ ব্যাংকোয়েটের আয়োজন করা হয়েছিল।

'আপনি কখনও চকোলেট মাখানো পিপড়ে ভাজা খেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'না।'

মুচকি হাসল সে। 'চকোলেটে ভাজা ঘাসফড়িংয়ের চেয়ে ওটা খেতে বেশি মজা।'

আলাস্কায় গত বছর শিকারে গিয়েছিল অ্যাডাম, এক ভল্লুক হামলা করেছিল ওকে। সে গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করল।

জেনিফার আড়স্ট হয়ে বসে আছে কখন অ্যাডাম ওকে জেরা করবে সে ভয়ে। অবশেষে যখন সময়টা এল, সারা শরীর কাঠ হয়ে গেল জেনিফারের।

ডেসার্ট শেষ করে নম্র গলায় অ্যাডাম বলল, 'আমি এখন আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। তবে চাই না আপনি আপসেট হয়ে যান। ঠিক আছে?'

জেনিফারের গলায় হঠাৎ ডেলার মত কী যেন বাঁধল। গলা দিয়ে রা ফুটবে কিনা বুঝতে পারছে না ও। শুধু মাথা দোলাল।

'সেদিন কোর্টরুমে ঠিক কী ঘটেছিল আমাকে খুলে বলুন, মিস পার্কার। আপনার যা যা মনে আছে সব বলবেন। কিচ্ছু বাদ দেবেন না। সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে বলুন।'

জেনিফার মনে মনে আক্রমণাত্মক একটা ভাব নিয়ে বসে ছিল। ভেবেছিল বলবে অ্যাডাম ওয়ার্নার তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে যা খুশি বলতে পারে, গ্রাহ্য করে না জেনিফার। কিন্তু মানুষটার নরম, ভদ্র কণ্ঠস্বর, চমৎকার আচরণ ওর যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাল। পেশীতে ঢিল পড়ল জেনিফারের। আদালত কক্ষের সেদিনের ঘটনা এত পরিস্কার স্মরণে আছে ওর যে মনে করলেও যেন শারীরিক ব্যথা অনুভূত হয় গায়ে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ভয়ংকর স্মৃতিটাকে ভুলে থাকার কত চেষ্টা করেছে জেনিফার। পারেনি। আর অ্যাডাম সেই বেদনা খুঁড়ে আবার জাগাতে চাইছে।

গভীর একটা দম নিল জেনিফার। 'ঠিক আছে। বলছি।'

থেমে থেমে, বিরতি দিয়ে কোর্টরুমের স্মৃতিচারণ করল ও। ধীরে ধীরে দ্রুত হয়ে উঠল বলার ভঙ্গি, যেন ঘটনাটা আবার জীবন ফিরে পেয়েছে। অ্যাডাম চুপচাপ ওর কথা শুনে গেল, লক্ষ করছে জেনিফারকে কথার মাঝখানে বাধা দিল না।

জেনিফারের বলা শেষ হলে অ্যাডাম বলল, 'যে লোকটা আপনাকে খামটা দিয়েছিল–আপনির সকালে যখন শপথ নিচ্ছিলেন ওই সময় কি তাকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে দেখেছেন?'

'বিষয়টা নিয়ে আমিও ভেবেছি। কিন্তু আমার কিছু মনে পড়ছে না। সেদিন অফিসে বহু লোক ছিল এবং তাদের সবাই ছিল আমার অচেনা।'

'লোকটাকে কি আগে কখনও কোথাও দেখেছেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেনিফার। 'মনে পড়ছে না। তবে দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'আপনি বলছেন লোকটাকে আপনি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে দেখেছেন কেবল সে খামটা আপনার হাতে দেয়ার আগে, তাই না? ডিস্টিক্ট অ্যাটর্নি কি লোকটার হাতে খামটা দিয়েছিলেন?'

'আ–না।'

'আপনি কি এই লোকটাকেই দেখেছেন যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলছে নাকি সে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিল?'

এক সেকেন্ড চোখ বুজে দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল জেনিফার। 'আমি দুঃখিত। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা কেমন তালগোল পাকানোর মত লাগছে। আ–আমি জানি না।

'লোকটা কী করে আপনার নাম জানল সে ব্যাপারে আপনার কোনও ধারনা আছে?'

'না?'

'কিংবা কেনই বা সে খাম দেয়ার জন্য আপনাকে বাছাই করল?'

'এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সোজা। সে খাম দেয়ার জন্য একটা নির্বোধকে খুঁজছিল এবং আমাকে সে পেয়ে গিয়েছিল।' মাথা নাড়ল জেনিফার। 'না, মি. ওয়ার্নার। আমার কোনই ধারণা নেই খামটা সে কেন আমার হাতে দিয়েছে।'

অ্যাডাম বলল, 'এ কেসটার ওপর প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ডি সিলভা অনেকদিন ধরেই মাইকেল মোরেট্টিকে বাগে পাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আপনার কারণে তিনি কেস হেরে গেছেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আপনার ওপর এ জন্য মহা ক্ষুব্ধ।'

'আমারও তাঁর ওপর কম ক্ষোভ নেই,' রাগত গলায় বলল জেনিফার। তবে অ্যাডাম ওয়ার্নারের ওপর ওর রাগ নেই। এ মানুষটি তো তার কর্তব্য সম্পাদন করতে

এসেছে। ওরা জেনিফারকে মুঠিতে চেপে ধরতে চেয়েছে এবং তার পেরেছেও। এ জন্য অ্যাডাম ওয়ার্নার দায়ী নয়। সে ওদের যন্ত্র মাত্র যাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হঠাৎ একাকী থাকার তীব্র আকুলতা অনুভব করল জেনিফার। আর কাউকে ও ওর দুঃখের ভাগীদার করতে চায় না।

'আমি দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল জেনিফার। 'আ–আমার শরীরটা ভাল্লাগছে না। আমি বাড়ি যাব, প্লিজ।'

অ্যাডাম ওকে একমুহূর্ত পরখ করল। 'আমি যদি বলি আমি সুপারিশ করব যাতে আপনার বিরুদ্ধে ডিসবারমেন্ট প্রসিডিং তুলে নেয়া হয়, তাহলে কি শরীরটা একটু ভাল্লাগবে?'

অ্যাডামের কথার মর্ম বুঝে উঠতে অনেকক্ষণ সময় নিল জেনিফার। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। মুখের জবান গেছে বন্ধ হয়ে। শিংয়ের চশমার আড়ালে ধূসর-নীল চোখের গভীরে ও যেন কী খুঁজল আতিপাতি করে। 'আ–আপনি সত্যি বলছেন?'

'আপনি একজন আইনজীবী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চান, ঠিক বলিনি?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

বাবার কথা মনে পড়ে গেল জেনিফারের, মনে পড়ল বাবার আরামদায়ক ছোট্ট ল অপিসের কথা, ওদের মাঝে আলাপচারিতা, ল স্কুলে পড়ার লম্বা বছরগুলো, আশা, স্বপ্ন–সব হু হু করে বন্যার জলের মতো তোড়ে ভেসে এল স্মৃতিতে।

আমরা পার্টনারশিপ গড়ে তুলব, জেনি। তুমি যাও। কলেজে ভর্তি হও। ডিগ্রি নাও।

'জ্বী,' ফিসফিস করল জেনিফার।

'আপনি কঠিন একটা শুরু পার হয়ে এসেছেন। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আইনজীবী হিসেবে আপনি খুব ভালো করতে পারবেন।'

কৃতজ্ঞ হাসি ফুটল জেনিফারের মুখে। 'ধন্যবাদ। আমি চেষ্টা করব।'

বুকের মাঝে কথাটা বারবার ওলোটপালোট খেল। *আমি চেষ্টা করব।* ও এক শখের গোয়েন্দা আর গাড়ি কেনা-বেচার দালালের সঙ্গে ছোট্ট, ঘিঞ্জি একটি অফিস শেয়ার করছে, এটা কোনও ব্যাপার নয়। ওটা তো ওর ল–অফিসও বটে। ও বৈধ পেশাটির একজন সদস্য। ওরা ওকে ল প্রাকটিস করার অনুমতি দেবে। প্রবল উল্লাস অনুভব করল জেনিফার। তাকাল অ্যাডামের দিকে। এই মানুষটির সঙ্গে সারাজীবনের জন্য কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল ও।

ওয়েটার এল টেবিল পরিষ্কার করতে। কথা বলতে গেল জেনিফার, ফোঁপানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল শুধু গলা থেকে। 'মি. ওয়ার্নার–'

গম্ভীর গলায় অ্যাডাম বলল, 'আমরা যেহেতু একই পেশার মানুষ, শুধু অ্যাডাম বলে ডাকলে খুশি হবো।'

'অ্যাডাম–?'

'জ্বী?'

'আশা করি তোমাকে তুমি বলে ডাকলে কিছু মনে করবে না,' গুঙিয়ে উঠল জেনিফার। 'উহ্, আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে!'

পরদিন সকালে অ্যাডাম ওয়ার্নার ফোন করল জেনিফারকে। 'তুমি শুনলে নিশ্চয় খুশি হবে,' বলল অ্যাডাম। 'ডিসবারমেন্ট প্রসিডিং অফিশিয়ালি বাতিল করা হয়েছে। তোমাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড নীরবে প্রার্থনা করল। 'আ–আমি বলতে পারব না তোমার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'ন্যায়বিচার সবসময় অন্ধ নয়।'

অ্যাডাম বলল না নিডহ্যাম জেনিফারের ডিসবারমেন্ট প্রসিডিং ড্রপ হওয়ার কথা শুনে হতাশ বোধ করেছেন। আর খেপে বোম হয়ে গেছেন রবার্ট ডি সিলভা। ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো ফোনে চেঁচাচ্ছিলেন তিনি।

'তুমি ওই মাগীকে এভাবে ছেড়ে দিলে? জেসাস ক্রাইস্ট, ও মাফিয়ার লোক, অ্যাডাম! তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? ও তোমাকে বোকা বানিয়েছে।' এরকম কথা শুনতে শুনতে বেজায় ক্লান্ত অ্যাডাম।

'জেনিফারের বিরুদ্ধে যেসব এভিডেন্স আনা হয়েছে তার কোনটিরই ভিত্তি নেই, রবার্ট,' বলেছে ও। 'সে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হাজির ছিল এবং সে ইঁদুর ধরা ফাঁদে আটকা পড়েছে। আমার মনে হয়নি ও মাফিয়ার সঙ্গে জড়িত।'

অবশেষে রবার্ট ডি সিলভা বলেছেন, 'ঠিক আছে। ও তো এখনও একজন আইনজীবী। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ও যে নিউইয়র্কে আইন ব্যবসা করে। কারণ যে মুহূর্তে ও আমার কোনও কোর্ট রুমে পা দেবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।'

জেনিফারের সঙ্গে কথা বলার সময় অ্যাডাম এসব কিছুই ওকে জানাল না। জেনিফার এক ভয়ংকর শত্রু তৈরি করেছে। তবে এ নিয়ে কিছু করার নেই। রবার্ট ডি সিলভা একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। আর জেনিফার এক দুর্বল টার্গেট। সে বুদ্ধিমতী, আইডিয়ালিস্টিক, বয়সে অত্যন্ত তরুণী এবং নজরকাড়া সুন্দরী।

জেনিফারের সঙ্গে আমার আর দেখা না হওয়াই ভাল, ভাবল অ্যাডাম।

পাঁচ

পরবর্তী হপ্তাগুলো কাটতে লাগল ঝড়ের গতিতে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে জেনিফার। সে জানে বড় কোনও ফার্মে ঢুকে পড়ার সুযোগ এখন আর অবাস্তব কিছু নয়। তবে দারুণ কোনও কাজ ওকে আগে করে দেখাতে হবে। তবে ওর কাছে পিবডি অ্যান্ড পিবডি থেকে প্রচুর কাজ আসছে। বেশিরভাগই সমন এবং সাপিনা সংক্রান্ত কাজ। খুব বেশি টাকা না পেলেও চলে যাচ্ছে জেনিফারের।

মাঝে মাঝে, কাজ করতে করতে যখন রাত হয়ে যায়, কেন বেইলি জেনিফারকে ডিনারে নিয়ে যায়। ওপর থেকে মানুষটাকে সিনিক মনে হলেও জেনিফার জানে ওটা বেইলির মুখোশ। টের পায় বেইলি বড্ড একা। সে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে। খুব ভালো ছাত্র। জেনিফার ভেবে পায় না বেইলির মত একজন মানুষ এরকম পচা অফিসে এরকম ফালতু কাজ কেন করছে। যেন নিজেকে ব্যর্থ একজন মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে বেইলি, সাফল্য পাবার চেষ্টা করতে ভয় পায়।

একবার বেইলির দাম্পত্য জীবন নিয়ে কথা তুলেছিল জেনিফার। 'এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠেছে বেইলি। বিষয়টি নিয়ে আর কথা তোলেনি জেনিফার।

অটো উইনজেল আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। ছোটখাট, ভুঁড়িঅলা মানুষটি বিবাহিত জীবনে খুব সুখি। জেনিফারকে সে নিজের মেয়ের মত দেখে। প্রায়ই স্ত্রীর হাতে তৈরি সুপ এবং কেক নিয়ে আসে জেনিফারের জন্য। কিন্তু সে জিনিস মুখে তোলা যায় না, এমনই অখাদ্য। তবু ভদ্রতার খাতিরে জোর করে খাবারগুলো পেটে ঠেলে দেয় জেনিফার। অটো উইনজেলকে কষ্ট দিতে চায় না বলেই। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়েনজেল তার বাড়িতে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিল জেনিফারকে। মিসেস ওয়েনজেল তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার স্টাফড্ ক্যাবেজ তৈরি করেছিল। বাধাকপির তরকারিটা ছিল ঝোলের পুকুরে ডোবা, মাংস সেদ্ধ হয়নি, রাইসের দশাও তাই। পুরো ডিশটাই ভাসছিল মুরগির চর্বির সাগরে। জেনিফার বুকে সাহস সঞ্চয় করে

খাবারের ওপর হামলা চালিয়েছে। অল্প দু'এক গরাস মুখ নিয়ে চিবিয়ে দেখিয়েছে ও খাচ্ছে।

'কেমন হয়েছে রান্না?' হাসিমুখে জানতে চেয়েছে মিসেস।

'ভা-ভালো। আমার খুব প্রিয় ডিশ এটা।'

সেদিন থেকে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় অটো উইনজেলের বাড়িতে জেনিফারের দাওয়াত রুটিনের মত হয়ে গেছে। আর জেনিফারকে প্রতিবারই তার সেই 'প্রিয় ডিশ' খেতে হচ্ছে।

ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার্স ইভ এল। একাকী দিনগুলো কাটাল জেনিফার। প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। শহরটাকে লাগছে প্রকাণ্ড ক্রিসমাস কার্ডের মত। জেনিফার রাস্তায় হেঁটে বেড়াল। দেখল লোকজন শীতের তীব্রতার কবল থেকে বাঁচতে দ্রুত বাড়ি ফিরছে। শূন্যতার বেদনা জাগল জেনিফারের বুকে। ও ওর বাবাকে বড্ড মিস করছে। ছুটির দিনগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে ও খুশি। ১৯৭০ সাল নিশ্চয় আমার সুন্দর যাবে, মনে মনে বলল জেনিফার।

জেনিফারের মন যখন খুব খারাপ থাকে, কেন বেইলি ওর মন ভালো করে দেয়ার চেষ্টা করে। ওকে নিয়ে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে যায় নাটক দেখতে, কিংবা ডিস্কো ক্লাবে অথবা সিনেমায়। জেনিফার জানে কেন ওর প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে। তবে দুজনের মাঝে একটা দেয়ালও সৃষ্টি করে রাখছে।

মার্চ মাসে অটো উইনজেল সিদ্ধান্ত নিল সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ফ্লোরিডা যাবে।

'নিউইয়র্কের শীতে হাড়গুলো সব জমে গেল,' বলল সে জেনিফারকে।

'আমি তোমাকে খুব মিস করব,' মন থেকেই কথাগুলো বলল জেনিফার। লোকটাকে ওর খুব ভালো লাগে।

'কেনের দিকে লক্ষ রেখো।'

জেনিফার উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

'তোমাকে ও কথাটা কখনও বলেনি, তাই না?'

'কী কথা?'

ইতস্তত করছে অটো, তারপর বলল, 'ওর স্ত্রী সুইসাইড করেছিল। এজন্য নিজেকে দায়ী করে কেন।'

শিউরে উঠল জেনিফার। 'কী ভয়ংকর! কেন– কেন সে আত্মহত্যা করল?'

'কেনকে এক তরুণের সঙ্গে বিছানায় দেখেছিল তার স্ত্রী।'

'ওহ, মাই গড!'

'সে কেনকে গুলি করে তারপর আত্মহত্যা করে। কেন বেঁচে যায় কিন্তু ওর স্ত্রী মারা গেছে।'

'কিন্তু– কিন্তু ওর আচরণে কখনও মনে হয়নি–'

'জানি আমি। সবসময় হাসি খুশি থাকে কেন। কিন্তু প্রবল নরকযন্ত্রণা সয়ে চলেছে ও।'

'ঘটনাটা আমাকে জানানোর জন্য ধন্যবাদ।'

জেনিফার অফিসে আসার পরে কেন বলল, 'জানো, বুড়ো অটো আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে?'

'জানি।'

হাসল কেন বেইলি। 'মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী তোমার আর আমার বিরুদ্ধে বড্ড বিরূপ।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

একদিক থেকে তো কথাটা সত্যিই, ভাবল জেনিফার।

অ্যাডাম ওয়ার্নারের কথা খুব মনে পড়ছে জেনিফারের। মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার কথা, অ্যাডাম এসেছিল ওর অ্যাপার্টমেন্টে। ওর সঙ্গে কী যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছিল আর কী অবস্থায় দেখা হয়েছিল ভাবলে জেনিফার এখনও লজ্জায় মরে যায়। জেনিফারের কাছে যে সব ক্লায়েন্ট আসছে, প্রায় বেশিরভাগই জেনিফারের পাঠানো।

হপ্তা তিনেক পরে অ্যাডামকে ফোন করল জেনিফার। এর আগেও একবার করেছিল। পায়নি। দেশের বাইরে ছিল অ্যাডাম। আজও পেল না। দক্ষিণ আমেরিকা গেছে।

'কোনও মেসেজ দিতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সেক্রেটারি।

ইতস্তত করল জেনিফার। 'না। কোনও মেসেজ দিতে হবে না।'

জেনিফার ভুলে থাকতে চাইছে অ্যাডামকে। পারছে না। লোকটা বিবাহিত নাকি কারও সঙ্গে এনজেগজড কিছুই জানে না ও। মিসেস অ্যাডাম ওয়ার্নার হতে কেমন লাগবে, ভাবে ও। এসব কি পাগলামির লক্ষণ নয়? নিজেকে শাসায় জেনিফার।

প্রায়ই খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে মাইকেল মোরেট্টির খবর ছাপা হয়। নিউইয়র্কার ম্যাগজিন মাইকেলের শ্বশুর অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লি এবং পুবের মাফিয়া পরিবারদের নিয়ে বিশাল এক স্টোরী ছেপেছে। বলা হয়েছে অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লি-র স্বাস্থ্যর দিন দিন অবনতি ঘটছে এবং তার জামাতা মাইকেল মোরেট্টি তার সাম্রাজ্যের শাসনভার হাতে তুলে নিতে প্রস্তুত। গল্পের শেষে মোরেট্টির ট্রায়ালের কথা বলা হয়েছে। ক্যামিল্লো স্টেলা লিভেনওয়ার্থে জেল খাটছে, আর মোরেট্টি স্বাধীন

জীবন উপভোগ করছে। পত্রিকাটি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, জেনিফার পার্কারের কারণেই আজীবন কারাদণ্ড কিংবা ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে রেহাই মিলেছে মোরেট্টির। লেখাটি পড়ে পেটের ভেতরটা মোচড় দিল জেনিফারের। ইলেকট্রিক চেয়ার? ও যদি পারত নিজেই মোরেট্টিকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে হাসতে হাসতে সুইচ অন করে দিত।

কেন বেইলি একদিন জেনিফারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ফাদার ফ্রান্সিস জোসেফ রায়ানের। ফাদার রায়ানের বয়স পঞ্চান্ন, চুলের রঙ ধূসর-কালো। ভদ্রলোককে প্রথম দর্শনেই জেনিফারের পছন্দ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে ফাদার তাঁর প্যারিশনাররা (পাপ স্বীকার করতে গির্জায় যায় যারা) অদৃশ্য হয়ে গেলে সাহায্য চাইতে আসেন কেনের কাছে। কেন নিখোঁজ স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কিংবা কন্যাকে খুঁজে বের করে। তবে এজন্য সে ফাদারের কাছ থেকে কোনও টাকা নেয় না।

'স্বর্গে গিয়ে ডাউন পেমেন্ট নেব,' হাসতে হাসতে বলে কেন।

একদিন বিকেলে ফাদার রায়ান এলেন জেনিফারের অফিসে।

জেনিফার জানাল, 'কেন বাইরে গেছে, ফাদার রায়ান। আজ আর ফিরছে না।'

'আমি আসলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, জেনিফার,' বললেন ফাদার রায়ান। তিনি জেনিফারের টেবিলের সামনে, খটখটে শুকনো কাঠের চেয়ারে বসলেন। 'আমার এক বন্ধুর সমস্যা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে। সে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তোমার সাহায্য তার খুব দরকার।'

জেনিফার বলল, 'তাহলে তাকে একদিন আমার অফিসে নিয়ে আসুন, ফাদার।'

'সে তোমার অফিসে আসতে পারবে না। তোমাকেই তার বাড়িতে যেতে হবে। কারণ অ্যাক্সিডেন্টে সে হাত এবং পা দুটোই খুইয়েছে।'

কনি গ্যারেট হিউস্টন স্ট্রিটের একটি ছোট্ট পরিচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। দরজা খুলে দিল অ্যাপ্রন পরা সাদা চুলের এক মহিলা।

'আমি মার্থা স্টীল। কনির খালা। কনির সঙ্গে থাকি। প্লিজ, ভেতরে আসুন। ও আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

জেনিফার সুন্দর সাজানো-গোছানো লিভিংরুমে ঢুকল। বড় একটি আর্মচেয়ারে, বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে কনি। মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠল জেনিফার। ভেবেছিল বয়সী কোনও মহিলাকে দেখবে। কিন্তু এত কম বয়স মেয়েটার! মাত্র চব্বিশ, জেনিফারের বয়সী। উজ্জ্বল একটা আভা জ্বলজ্বল করছে চেহারায়। রীতিমত

অশ্লীল লাগল দেখে এত সুন্দর চেহারার মেয়ের হাত এবং পা নেই। বহু কষ্টে শরীরের কাঁপুনি ঠেকাল জেনিফার।

কনি গ্যারেট উষ্ণ হাসি উপহার দিল। 'প্লিজ, বসো, জেনিফার। তোমাকে তুমি বললাম বলে রাগ করনি তো? ফাদার রায়ান তোমার কথা অনেক বলেছেন। তোমাকে টিভিতেও দেখেছি। তুমি এসেছ। খুব খুশি হয়েছি।'

জেনিফার তরুণীর বিপরীত দিকের একটি আরামদায়ক চেয়ারে বসল।

'ফাদার রায়ান বললেন তুমি কয়েক বছর আগে অ্যাক্সিডেন্ট করেছ। কী ঘটেছে বলবে?'

'দোষ আমারই। হাঁটতে গিয়ে বরফে পা পিছলে একটা ট্রাকের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কতদিন আগের ঘটনা এটা?'

'তিন বছর আগে। ডিসেম্বরে। ক্রিসমাস শপিং করতে ব্লুমিং-ডেল-এ যাচ্ছিলাম।'

'ট্রাকের নিচে চাপা পড়ার পরে কী হলো?'

'আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। একটা অ্যাম্বুলেন্স নাকি আমাকে হাসপাতালে দিয়ে গেছে। শিরদাঁড়ায় ইনজুরি ছিল। হাড় ভেঙে গিয়েছিল। ফাটলটা দ্রুত বাড়ছিল তারপর−' থেমে গেল কনি, শ্রাগ করার চেষ্টা করল। 'কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কাজ হয়নি।'

'তুমি মামলা করনি?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে জেনিফারের দিকে তাকাল কনি, 'ফাদার রায়ান তোমাকে কিছু বলেননি?'

'যে ইউটিলিটি কোম্পানির ট্রাক আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল আমার আইনজীবী। কিন্তু আমরা মামলায় হেরে যাই। আপিল করেছিলাম। কিন্তু আপিলেও হেরে গেছি।'

জেনিফার বলল, 'ফাদারের উচিত ছিল কথাটা আমাকে বলা। অ্যাপেলেট কোর্ট যখন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেক্ষেত্রে আমার আর কিছুই করার নেই।'

মাথা দোলাল কনি। 'অবশ্য ফাদার রায়ান বলছিলেন তুমি নাকি মিরাকল ঘটাতে পারো।'

'সেটা উনি পারেন। আমি পারি না। আমি একজন সাধারণ আইনজীবী মাত্র।'

কনিকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন বলে ফাদার রায়ানের ওপর রাগ হলো জেনিফারের। সিদ্ধান্ত নিল বিষয়টি নিয়ে ফাদারের সঙ্গে কথা বলবে।

হাজির হলো অ্যাপ্রন পরা বৃদ্ধা। 'আপনি কিছু খাবেন, মিস পার্কার? কফি কিংবা কেক?'

হঠাৎ টের পেল জেনিফার খিদে চাগিয়ে উঠছে। ওর এখনও লাঞ্চ করা হয়নি। কিন্তু কনির সামনে হাত দিয়ে খাবার তুলে ও খেতে পারবে না। বলল, 'না, ধন্যবাদ। আমি লাঞ্চ করেই বেরিয়েছি।'

জেনিফার এখান থেকে দ্রুত পালাতে পারলেই বাঁচে। গোল্লায় যাক ফাদার রায়ান।

'আ–আমি সত্যি দুঃখিত। যদি পারতাম–'

হাসল কনি গ্যারেট। 'না, ঠিক আছে। এজন্য তোমাকে দুঃখিত হতে হবে না।'

ওই হাসিটাই কাবু করে দিল জেনিফারকে। কনির জায়গায় হলে সে কিছুতেই হাসি মুখে কথা বলতে পারত না।

'তোমার ল ইয়ার কে?' জিজ্ঞেস করল জেনিফার।

'মেলভিন হাচারসন। তুমি চেন ওকে?'

'না, চিনি না। তবে চিনে নেব। ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' আবার আন্তরিক হাসিটি ফিরে এল টনির মুখে।

জেনিফার ভাবল মেয়েটি কতই না কষ্ট আছে!

সারাদিন অসহায়ের মত চেয়ারে এভাবে বসে থাকা, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সে কিছুই করতে পারছে না। ওফ্, ভাবা যায় না!

'তবে তোমাকে কিন্তু কোনও কথা দিতে পারছি না।'

'না, না, ঠিক আছে। তবে একটা কথা কি জানো, জেনিফার? তুমি এসেছ তাতেই আমার মনটা ভালো হয়ে গেছে।'

সিধে হলো জেনিফার। এখন হ্যান্ডশেক করে বিদায় নেয়ার পালা। কিন্তু ও কার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে?

অদ্ভুত গলায় জেনিফার বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল, কনি। আমি তোমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করব।'

অফিসে ফেরার পথে জেনিফার সিদ্ধান্ত নিল এ বিষয়ে ও ফাদার রায়ানকে কিছু বলবে না। ও আজকেই মেলভিন হাচারসনের সঙ্গে কথা বলবে।

মেলভিন হাচারসন বেঁটে, টেকো, বোতামের মত ছোট নাক, বিবর্ণ নীল চোখ। ওয়েস্ট সাইডে তার ল অফিস। তারই মত জীর্ণ চেহারা অফিসের। রিসেপশনিস্টের ডেস্ক খালি।

'ও লাঞ্চে গেছে,' জানাল মেলভিন হাচারসন। জেনিফার ভাবল, অফিসের চেহারা দেখে তো মনে হয় না এ লোকের রিসেপশনিস্ট রাখার ক্ষমতা আছে। মেলভিন জেনিফারকে তার প্রাইভেট অফিসে নিয়ে গেল। রিসেপশনিস্ট অফিসের

চেয়ে আয়তনে বড় নয় এটা।

'ফোনে বললেন আপনি কনি গ্যারেটের মামলা নিয়ে কথা বলতে চান?'

'জ্বী।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেলভিন। 'এ নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই। আমরা মামলা করেছি এবং হেরে গেছি।'

'আপিল করেননি?'

'করেছিলাম। লাভ হয়নি। আপনি এটার পেছনে বেহুদা সময় নষ্ট করছেন।' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল। 'এ মামলার পেছনে অহেতুক সময় কেন নষ্ট করছেন?'

'এক বন্ধুর খাতিরে। ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখতে পারি?'

'দেখুন,' আবার কাঁধ ঝাঁকাল হাচারসন। 'ওটা পাবলিক প্রোপার্টি।'

জেনিফার সারাটা সন্ধ্যা ব্যয় করল কনি গ্যারেটের মামলার বিবরণী পড়ে। নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানি এ অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, কনি যাতে ট্রাকের নিচে চাপা না পড়ে সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল ট্রাক ড্রাইভার। কিন্তু পারেনি। মামলার রায় গেছে ডিফেনডেন্টের পক্ষে, বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মামলা।

রাত নটার দিকে ট্রান্সক্রিপ্ট পড়া শেষ হলো জেনিফারের। নিভিয়ে দিল বাতি। কিন্তু ঘুম আসছে না। কনির মিষ্টি চেহারাটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। চব্বিশ বছরের স্বতঃস্ফূর্ত একটি মেয়ে, তার হাত নেই, পা নেই। গড! কল্পনায় দেখল কনিকে ধাক্কা দিচ্ছে দানব এক ট্রাক, কনির শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণাটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা করল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে বিছানায় উঠে বসল জেনিফার। আলো জ্বালল। ফোন করল মেলভিন হাচারসনের বাড়িতে।

'ডাক্তারদের ব্যাপারে ট্রান্সক্রিপ্টে কিছুই লেখা নেই,' বলল জেনিফার ফোনে। 'অপারেশনে কোনও খুঁত ছিল কিনা চেক করে দেখেছেন?'

ঘুম জড়ানো একটি কণ্ঠ সাড়া দিল। 'হু দ্য ফাক ইস দিস?'

'জেনিফার পার্কার। আপনি কি–'

'ফর ক্রাইস্ট'স শেক! এখন ভোর চারটা বাজে! আপনার কাছে ঘড়ি নেই?'

'বিষয়টি জানা খুব জরুরি। মামলায় হাসপাতালের নাম উল্লেখ করা নেই। কনি গ্যারেটের যে অপারেশন করা হলো তার কি সত্যি প্রয়োজন ছিল?'

ও পাশে অল্পক্ষণ বিরতি। তারপর মেলভিন জবাব দিল, 'যে হাসপাতালে কনির চিকিৎসা করা হয়েছে সেখানকার নিউরোলজি এবং অর্থোপেডিক প্রধানদের সঙ্গে

আমি কথা বলেছি। ওরা বলেছিলেন অপারেশন প্রয়োজন ছিল। দেশের সেরা সার্জনরা কনির অপারেশন করেছেন। এ কারণে মামলার নথিতে হাসপাতালের নাম উল্লেখ করা হয়নি।'

জেনিফার হতাশ বোধ করল, 'ও আচ্ছা।'

'দেখুন, আপনাকে আগেই বলেছি বেহুদাই সময় নষ্ট করছেন আপনি। এখন দয়া করে ঘুমাতে দিন।'

রিসিভার রেখে দেয়ার 'ক্লিক' শব্দ ভেসে এল জেনিফারের কানে। ও আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসছে না। ঘুমের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেও তাকে কাবু করতে না পেরে উঠে পড়ল জেনিফার। এক কাপ কফি বানাল। সোফায় বসে কফি পান করতে লাগল। লক্ষ করল ম্যানহাটানের আকাশ ক্রমে ফর্সা হচ্ছে। হালকা গোলাপী রঙটা ধীরে ধীরে টকটকে লাল রঙে পরিণত হচ্ছে।

জেনিফারের মন খচখচ করছে। প্রতিটি অন্যায়-অবিচারের শেষে একটা প্রতিবিধান থাকেই। কনির ক্ষেত্রে কি সেরকম কিছু ঘটবে না? দেয়াল ঘড়িতে চোখ তুলে তাকাল জেনিফার। সকাল সাড়ে ছ'টা বাজে। আবার মেলভিন হাচারসনের নাম্বারে ফোন করল ও।

'আপনি কি ট্রাক ড্রাইভারের রেকর্ড চেক করেছিলেন?' জানতে চাইল জেনিফার।

ঘুম জড়ানো কণ্ঠ জবাব দিল, 'জেসাস ক্রাইস্ট! আপনি পাগল নাকি? আপনি ঘুমাবেন কখন?'

'ইউটিলিটি ট্রাকের ড্রাইভার। আপনি কি ওর রেকর্ড চেক করেছিলেন?'

'লেডি, আপনি কিন্তু আমাকে অপমান করছেন।'

'আমি দুঃখিত,' বলল জেনিফার। 'কিন্তু তথ্যটা আমার জানা দরকার।'

'জবাব হলো, হ্যাঁ। তার রেকর্ডে কোনও খুঁত ছিল না। ওটা ছিল তার প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট।'

'ও আচ্ছা।'

'মিস পার্কার,' বলল মেলভিন হাচারসন। 'দয়া করে আমার একটা উপকার করবেন? আপনার মনে যদি আরও প্রশ্ন উদয় হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আমার অফিসে, অফিস সময়ে ফোন করবেন।'

'দুঃখিত,' বলল জেনিফার। 'আপনি ঘুমান।'

'ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিল জেনিফার। এখন অফিসে যাবার সময় হয়েছে।

অফিসে গিয়ে অ্যাডামের ফোন পেল জেনিফার। সামনের শুক্রবারে জেনিফারকে নিয়ে সিনেমায় যেতে চায়। উৎফুল্লচিত্তে সম্মতি জানাল জেনিফার।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সিরিয়াস হয়ে গেল জেনিফার। 'আচ্ছা, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে? নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানি ১৯৬৭ সালে কটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, সেটা জানার জন্যে ন্যাশনাল লিগ্যাল কম্পিউটার লেক্সিজ-এর সাহায্য প্রয়োজন। ঐ প্রতিষ্ঠানে তো যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তোমার, আমার জন্যে যন্ত্রটা ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?'

'কেন পারব না? তোমার কষ্ট করার দরকার নেই। শুক্রবারে আমিই তোমাকে জানিয়ে দেব তথ্যটা।'

শুক্রবার সন্ধ্যায় জেনিফারকে বাসা থেকে তুলে নিল ওয়ার্নার। গাড়িতে যেতে যেতে জানাল, ওইবছর রেকর্ড পরিমাণ অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ঐ কোম্পানির যানবাহন, ১৫টি। প্রায় ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে, ব্রেকে গোলমাল ছিল। এদের বেশিরভাগ ট্রাকেরই ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল না শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল জেনিফার। মাথাজুড়ে সারাক্ষণ রইল ওই উত্তেজনার রেশ। অস্কার পাওয়া ফিলমেও মনোযোগ দিতে পারল না সে।

শো-শেষে বেরিয়ে আসতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পড়ল ওরা। উৎসুক জনতা কাদের চারপাশে যেন ভিড় করেছে। নিশ্চয়ই কোনো সিনেমা-স্টার! ভাবল জেনিফার। হঠাৎ ভিড়টা একটু হালকা হতেই জমে গেল জেনিফার। অ্যান্টোনিও মোরেট্টি! জনতার ভিড়ে ভাসতে ভাসতে স্ত্রীর হাত ধরিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, ঠোঁটে বিব্রত হাসি। এ শহরে মোরেট্টির পরিচিতি যে-কোনো ফিল্ম স্টারের সমান। কিংবা আরও বেশি। হঠাৎ করেই জেনিফারের চোখে চোখ পড়ল মোরেট্টির, ঠোঁটে ফুটে উঠল রহস্যময় একচিলতে হাসি। কী ভয়ানক কালো চোখ! শিরশির করে উঠল জেনিফারের গা। ও কি চিনতে পেরেছে জেনিফারকে?

মোরেট্টি আর ওর স্ত্রীকে নিয়ে কালো লিমুজিনটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। এতক্ষণে যেন শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হল জেনিফারের। দ্রুত তাকাল ওয়ার্নারের দিকে। নাহ্! সে বুঝতে পারেনি জেনিফারের পরিবর্তনটুকু, ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে ব্যস্ত।

ছয়

আগস্টের এক সকালে কনি গ্যারেট বনাম নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানির ট্রায়াল শুরু হল। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলা নয়, যেহেতু জেনিফার পার্কার বাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করবে, সেহেতু সংবাদপত্র আর টিভির লোকজন হামলে পড়ল কোর্টপ্রাঙ্গণে।

মোটর কোম্পানির অ্যাটর্নি প্যাট্রিক ম্যাগুইয়ের মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে, কনি যেহেতু কোর্টে হাজির হতে পারবে না, সেহেতু বাড়তি কোনো সুবিধা ওরা পাবে না। কিন্তু জেনিফার যখন জাজের কাছে কনির কিছু ছবি কোর্টে প্রদর্শন করার অনুমতি চাইল, তখন তিনি উশখুশ করে উঠলেন। তবে জাজ অনুমতি দিয়ে দেয়ায় তিনি আপত্তি করতে পারলেন না।

কোর্টরুম অন্ধকার করে দেয়া হল। সিক্সটিন মিলিমিটার প্রোজেক্টর চালু হল মৃদু গুঞ্জন তুলে। দেয়ালে ভেসে উঠল পঙ্গু কনির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলি।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট হলরুমে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। জেনিফার ফিল্মটা তৈরি করার ব্যাপারে একজন পেশাদার ক্যামেরাম্যানের সাহায্য নিয়েছে, সে ভালো করেই জানে, কীভাবে ছবি তুলতে হয়।

প্রথমেই দেখা গেল সকালে ঘুম ভেঙেছে কনির। বৃদ্ধা খালা বহুকষ্টে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাথরুমে গেলেন, মুখ ধুইয়ে দিলেন। বাথরুমের কাজ সারার পর আবার কোলে করেই এনে হুইলচেয়ারে শুইয়ে দিলেন বোনঝিকে। বাচ্চাদের মতো যত্ন করে নাশতা খাওয়ারেন। পাল্টে দিলেন পোশাক।

জেনিফার বহুবার দেখেছে ছবিটা। তবু ওর দুচোখ জলে ভরে গেল। ও জানে, হলরুমের প্রতিটি দর্শকেরই মনের অবস্থা ওর মতো। ফিল্ম শেষ হবার পর উপস্থিত প্রতিটি লোকই নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানির শত্রুতে পরিণত হল।

ছয়ঘণ্টা পরে ঘোষিত হল রায়। কনি গ্যারেট নেশনওয়াইড মোটর কোম্পানির কাছ থেকে ছয় মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পাবে। নিউইয়র্ক স্টেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অ্যামাউন্টের ক্ষতিপূরণ।

আর একবার চারদিকে ঝড় তুলে ফেলল জেনিফার। এবার প্রতিটি পত্রিকা উচ্চকিত হল ওর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায়। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল অ্যাটর্নি জেনিফার পার্কার।

সন্ধ্যায় ওয়ার্নারের সঙ্গে সেলিব্রেট করল ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয়।

পরদিন সকালে খুশি-খুশি মন নিয়ে অফিসে এল জেনিফার। কেনেথ বেইলির গ্রিটিংসের প্রত্যুত্তরে সহাস্যে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের টেবিলের দিকে এগোল। বিস্মিত চোখে দেখল, টেবিলের ওপর সেলোফেনে মোড়া রক্তলাল তাজা গোলাপের বিরাট একটা তোড়া। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে হাইডের দিকে চাইতেই চোখ নাচিয়ে সে বলল, 'বিরাট এক লিমুজিনের শোফার মিনিট বিশেক আগে তোমার জন্যে রেখে গেছে ওটা। কার্ডে প্রেরকের নাম লেখা আছে,' রহস্যময় হাসল কেন।

জেনিফার যত্ন করে দুহাতে তুলে নিল তোড়াটা, কার্ডটা সোজা করে পড়ল 'শুভেচ্ছাসহ, অ্যান্টানিও মোরেত্তি।'

তোড়াটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুড়ে ফেলে দিল জেনিফার।

সাত

নিউ জার্সির শহরতলিতে বিরাট এলাকা নিয়ে অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লির বিশাল খামারবাড়ি। নিজের পরিবার ছাড়াও জনা বিশেক অনুচর সপরিবারে বাস করে এলাকার মধ্যে। সিকিউরিটি সিস্টেম হোয়াইট হাউসের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আপন ভুবনে একজন প্রেসিডেন্টের মতোই সম্মান পান গ্রানেল্লি।

খামারবাড়ির পেছন দিকে খাবারঘরে পারিবারিক মিটিং ডেকেছেন তিনি। তিনি ছাড়া উপস্থিত আছেন কনসিলিয়ারি টমাস কোলফ্যাক্স আর জামাই অ্যান্টোনিও মোরেট্টি।

টেবিলের মাথায় বসেছেন গ্রানেল্লি। পঁচাত্তর বছর বয়সেও বিশাল শরীরের পেশিতে শক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। পনেরো বছর বয়সে সিসিলির পালার্মো থেকে আমেরিকায় চলে আসেন, বন্দরে শ্রমিকের কাজ নেন। একুশ বছর বয়সে সর্দারের সঙ্গে সামান্য কথা-কাটাকাটি হয়, পরদিন সর্দারকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। গ্রানেল্লি সর্দারের খালি পদ দখল করলেন, অন্য সব শ্রমিকরা ভয়মিশ্রিত সমীহের সঙ্গে তাঁকে আয়ের একটা ভাগ দিতে শুরু করল। পাঁচ বছরের মধ্যে সুদের কারবার, পতিতালয়ের মালিকানা, জুয়ার ব্যবসা আর মাদকদ্রব্য চোরাচালানের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন প্রচুর অর্থ এবং ক্ষমতার অধিকারী। বত্রিশটি খুনের মামলার তিনি প্রধান আসামি, কিন্তু প্রতিবারই বেরিয়ে এসেছেন আইনের ফাঁক গলে। নিজ যোগ্যতায় আজ তিনি ইস্ট কোস্টের পাঁচটা প্রধান মাফিয়া পরিবারের 'কাপু'।

গ্রানেল্লির বাঁ-দিকে বসেছেন বৃদ্ধ পারিবারিক কনসিলিয়ারি টমাস কোলফ্যাক্স। নামকরা আইনজীবী তিনি, তবে শুধুমাত্র মাফিয়াদের কেসই হাতে নেন। অন্যান্য সুযোগসুবিধা ছাড়াও জলপাই তেলের কারবারে তাঁকে বেশ ভালো একটা শেয়ার দেয়া হয়েছে। গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই পরিবারের কনসিলিয়ারি।

ডানদিকে বসেছে অ্যান্টোনিও মোরেট্টি। মোরেট্টির অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়শই গ্রানেল্লির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, পরিবারের সবার থেকে আলাদা সে। মোরেট্টির বাবা গিওভান্নি গ্রানেল্লির দূর-সম্পর্কের চাচাত ভাই, তাঁর জন্ম সিসিলিতে নয়, ফ্লোরেন্সে। প্রচলিত ধারণা—ফ্লোরেন্সের লোকদের কখনও বিশ্বাস করা

উচিত নয়। গিওভান্নি আমেরিকায় এসে একটা জুতোর দোকান খুলে বসেন এবং সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন। তাঁর ঘরের পিছনের কোনো গোপন কামরায় জুয়ার আসর বসত না, মেয়েমানুষের কারবার থেকেও তিনি ছিলেন দূরে। এ-কারণে লোকজন প্রকাশ্যেই তাঁকে বোকা বলে গালমন্দ করত। কিন্তু দরিদ্র পিতার সন্তান মোরেত্তি হল সম্পূর্ণ বিপরীত।

মেধাবী ছাত্র মোরেত্তি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাস করেছে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পড়াশোনা শেষ করে বাবার কাছে আবদার ধরে দূরসম্পর্কের চাচা গ্রানেল্লির সঙ্গে দেখা করবে। গিওভান্নি ভাবলেন, হয়ত ব্যবসা শুরু করার জন্যে টাকাপয়সা চাইবে মোরেত্তি। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন গ্রানেল্লির সঙ্গে।

মোলায়েম হাসি হেসে শুরু করল মোরেত্তি, 'আমি আপনাকে ধনী করে দিতে পারি।'

'আমি তো ধনীই আছি,' ভুরু কুঁচকে চাইলেন গ্রানেল্লি উদ্ধত তরুণের দিকে।

'না, আপনি তা নন। আপনার ধারণা আপনি ধনী, আসলে আপনি ধনী নন,' হাসিটা একটুও ম্লান হল না মোরেত্তির ঠোঁটে।

'কী বলতে চাও, হে ছোকরা?' গর্জে উঠলেন গ্রানেল্লি।

বলল মোরেত্তি।

রত্ন চিনতে ভুল করেন না কাপু। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মোরেত্তির প্রস্তাবগুলো। পরবর্তী পাঁচ বছরে মোরেত্তির তত্ত্বাবধানে মাংস সংরক্ষণ, গার্মেন্টস্, রেস্তোরাঁ, মোটর কোম্পানি এবং ওষুধের ব্যবসার মতো আইনসিদ্ধ পথে চারগুণ লাভের মুখ দেখেন গ্রানেল্লি। এর আগে তাঁর ব্যবসার সবই ছিল বেআইনি। তবে নির্দোষ ব্যবসার অন্তরালে চারগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠল বেআইনি কারবার—ডলারের স্রোত বইল গ্রানেল্লির পকেটে।

নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিল মোরেত্তি। গ্রানেল্লির কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার আগেই পাকাপোক্ত করে নিল নিজের আসন। প্রেমের ফাঁদ পেতে অধিকার করে নিল গ্রানেল্লির আদরের কন্যা রোসোর হৃদয়। মেয়ের মন বুঝতে পেরে গ্রানেল্লি রাজি হলেন বিয়েতে।

বর্তমানে আমেরিকায় ছাব্বিশটা মাফিয়া পরিবার রয়েছে। নয়জনের একটা জাতীয় কমিশন পরিবারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। নতুন দিনের নতুন কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাসী মোরেত্তি জানে, একদিন সে ঐ কমিশনের কর্ণধার হবে।

টেবিলের ওপাশে বসা কোলফ্যাক্সের দিকে চাইল মোরেত্তি। বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন কনসিলিয়ারি। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় প্রাচীনপন্থী লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা ঠিক নয়, একথা বারবার শ্বশুরকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে মোরেত্তি।

খুক করে কেশে নিয়ে বাকি দুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন গ্রানেল্লি, 'অ্যান্টোনিও, তুমি কী যেন বলতে চাইছিলে?'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ঐ মেয়েটার ব্যাপারে। মানে যাকে আমরা ট্র্যাপ করেছিলাম স্টেলার মামলায়। আজকাল পত্রিকায় প্রায়ই ওর কথা লিখছে। সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমরা ইচ্ছে করলে ওকে কাজে লাগাতে পারি। এ ক'দিনেই চারদিকে রটে গেছে, জেনিয়ার পার্কার ফাঁসির দড়ি থেকে মক্কেলদের ছিনিয়ে আনে। আমাদের কাজের জন্যে এমন ক্ষুরধার চটপটে তরুণ ল'ইয়ারই দরকার,' কথা শেষ করে চোরাচোখে একবার দেখে নিল ক্রুদ্ধ কোলফ্যাক্সকে।

'কেন, আমাদের বহুদিনের কনসিলিয়ারি তো রয়েছেনই,' অসন্তুষ্ট গলায় মতো প্রকাশ করলেন গ্রানেল্লি।

'তা তো রয়েছেনই। তবে কি, মি. কোলফ্যাক্সের বয়স হয়েছে। অত খাটাখাটুনি তাঁকে দিয়ে না-করানোই ভালো। তিনি তো কনসিলিয়ারি। এ মেয়েটাকে দিয়ে শুধুমাত্র কঠিন মামলাগুলো করাতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন গ্রানেল্লি, তারপর বললেন 'মেয়েছেলেদের এসব ব্যাপারে না-আনাই ভালো। তবে তুমি যখন এত করে বলছ, তখন চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

কোলফ্যাক্সের হিমশীতল দৃষ্টি উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল মোরেত্তি, মাপা পায়ে বেরিয়ে এল লাউঞ্জে, ওকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোফায় বসা কোলেল্লা, সালভাতর আর নিক ভিটো, গ্রানেল্লির তিন 'সোলদাতি'। তিনজনই মোরেত্তির অনুগামী, কারণ রাস্তা থেকে তুলে এনে মোরেত্তিই ওদেরকে কাজে লাগিয়েছে।

শোফারের খুলে-ধরা দরজা গলে গাড়ির ব্যাকসিটে উঠে পড়ল মোরেত্তি। রোসা ওর জন্যে টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছে, ভাবতেই বিরক্তিতে তেতো হয়ে গেল মনটা। চুলোয় যাক! শোফারকে নির্দেশ দিল শহরে যেতে। ওয়ালনাট স্ট্রিটের পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টে ওর রক্ষিতা শার্লিনও আজ অপেক্ষা করছে। প্রতি বুধবার মোরেত্তি ওর কাছে যায়। শার্লিনের তপ্ত মাংসল শরীরের কথা চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। স্পিড বাড়াতে নির্দেশ দিল শোফারকে।

আট

আজকাল প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকে জেনিফার। কনি-কেসের পর থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মক্কেল সামলাতে হচ্ছে। পাঁচজন নতুন পাস করা ল'ইয়ার রেখেছে, খুব শিগগিরই আরও দুজনকে নেবে বলে ঠিক করেছে। আগে অফিসের দুটো ব্লক পরেই বড়সড় একটা অফিস ভাড়া নিয়েছে, প্রচুর খরচ করে সাজিয়ে নিয়েছ ইচ্ছেমতো। এই আট-ন' মাসেই বেশ গুছিয়ে নিয়ে জেনিফার।

সিনেটর নির্বাচনের ক্যাম্পেইন শুরু করেছে ওয়ার্নার, তাই আগের মতো প্রকাশ্যে জেনিফারের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। শহরের বাইরে ছোটখাটো রেস্তোরাঁয় ওদের দেখা হয়। হাসি আর গল্পে কেটে যায় ভালোবাসে ওরা, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরাসরি এ নিয়ে কোনও কথা হয়নি দুজনে। নির্মল বন্ধুত্বের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে না-বলা কথা। কিন্তু সেজন্যে কারও আক্ষেপ নেই।

দুপুরের দিকে জেনিফারের পি.এ. যখন ওকে জানাল অ্যান্টোনিও মোরেট্টি কথা বলতে চায়, জেনিফার কিছুটা কৌতূহলী হয়েই লাইন দিতে বলল। গত আটমাসে যতবার মামলা জিতেছে ও, প্রতিবার অফিসে এসেই টেবিলের উপর পেয়েছে সেলোফেনে মোড়া গোলাপের গুচ্ছ–মোরেট্টির শুভেচ্ছা। প্রতিবারই ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তাজা ফুলগুলো। আজ আবার হঠাৎ কী ভেবে ফোন করল সে!

'জেনিফার বলছি, ফোন করেছেন কেন, মি. মোরেট্টি?' গম্ভীর গলা জেনিফারের।

একটু থমকে গেল মোরেট্টি। দু'সেকেন্ড পর উত্তর দিল, 'আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। দরকারি কথা ছিল।'

'কী ব্যাপারে, মি. মোরেট্টি?'

'টেলিফোনে এত কথা বলা যায় না। তবে অবশ্যই ব্যবসায়িক আলাপ, আপনি নিরুৎসাহী হবেন না।'

'দেখুন মি. মোরেট্টি, আপনার সঙ্গে কোনও ব্যাপারেই আলাপ করতে আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহী নই।' ঝাঁঝিয়ে উঠে ঝড়াং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল জেনিফার।

সঙ্গে সঙ্গে আবার রিং বেজে উঠতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জেনিফার, রিসিভার তুলে পি. এ.-কে ধমক দিল, 'কী ব্যাপার সিনথিয়া? আবার কে?'

'মানে...মি. অ্যাডাম টার্নার আপনাকে চাইছেন,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল সিনথিয়া।

'আগে বলোনি কেন? তাড়াতাড়ি লাগাও,' রিসিভার কানে চেপে ফোন মোড়া চেয়ারে হেলান দিল জেনিফার, শান্তি ফিরে পেল মনে। ওয়ার্নার এ অফিসে অ্যাডাম টার্নার নামে ফোন করে, নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে।

'জেনিফার? কী করছ? ব্যস্ত?' ওপাশ থেকে ভেসে এল ওয়ার্নারের কণ্ঠস্বর।

'আর বোলো না! মোরেট্টি ফোন করেছিল। কী মতলব কে জানে! ধমকে দিয়েছি।'

'বেশ করেছ। ও ব্যাটার কাছ থেকে দূরে থাকবে। শোনো, আজ আমি আসতে পারব না। এক্ষুনি ব্রুকলিনে যেতে হচ্ছে, জনসভায় ভাষণ দিতে হবে। কিছু মনে কোরো না, লক্ষ্মীটি।'

'কী যে বলো তুমি! কাল ফোন করবে তো?'

'তুমি না-বললেও করব। তাহলে রাখি, বাই।'

'বাই, অ্যাডাম,' লাইনটা কেটে যেতে সিনথিয়াকে ডাকল জেনিফার, মেয়েটার সাথে অকারণেই খারাপ ব্যবহার করেছে আজ। মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকল সিনথিয়া। চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরল জেনিফার, 'তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, সিনথিয়া, কিছু মনে কোরো না।'

'কী যে বলেন, মিস। সারাদিন এত ব্যস্ত থাকেন! এমন তো একটু-আধটু হবেই। আমি কিচ্ছু মনে করিনি,' হাসতে হাসতে নিজের ঘরে ফিরে গেল সে।

পরদিন টেলিফোন নয়, সন্ধ্যায় জেনিফারের অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির হল ওয়ার্নার, যেটা কখনোই করে না সে। কিছুদিন হল আগের খুপরিটা ছেড়ে তিন-রুমের সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এসেছে জেনিফার। দরজা খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল খুশিতে উজ্জ্বল ওয়ার্নারের মুখের দিকে। কিন্তু অতকিছু লক্ষ্য করার সময় নেই ওয়ার্নারের, জেনিফারকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে দিল। লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে ছটফট করে উঠল জেনিফার, 'ছি, ছি! কী শুরু করেছ?'

'যাই বলো না কেন, আজ আমি কিচ্ছু শুনব না। আমি আজ বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি তোমাকে!'

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল জেনিফার। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল, 'কী যে পাগলামি করো!'

ধীরে ধীরে হাসি মুছে গেল ওয়ার্নারের মুখ থেকে, জেনিফারের কাঁধে হাত রেখে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'ঠাট্টা নয়, সোনা, আমি সত্যিই তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

শঙ্কার ছায়া ফুটল জেনিফারের চোখে, 'কী বলছ, অ্যাডাম? ঘরে তোমার বউ আছে, ভুলে গেছ?'

'ভুলব কেন? তার সঙ্গে কথা বলার পরই তোমার কাছে এসেছি। গতকাল মেরীকে

সব খুলে বলেছি। সে বেশ শান্তভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। ওর সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছি। এ-মুহূর্তে ওকে ডিভোর্স করলে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ব। নির্বাচনটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক, তারপর আমরা ডিভোর্সটা সেরে নেব। জেনিফার, চার-পাঁচটা মাস অপেক্ষা করতে পারবে না? বিয়ের পর হানিমুনটা নাহয় তোমার শহরেই করব!'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল জেনিফার। অনেক, অনেকক্ষণ পর কথা ফুটল মুখে, 'অ্যাডাম, আমরা খুব বেশি আশা করছি না তো?'

বুকের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরল ওয়ার্নার, নাক ডুবিয়ে দিল ওর দীঘল কালো চুলে। পায়ে পায়ে সরে এল বিছানার কাছে। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জেনিফার, 'না, না, অ্যাডাম! এখন নয়!'

'কেন নয়? দুদিন পরেই আমরা বিয়ে করছি, এখনও এত ভয়?' প্রবল ইচ্ছের তোড়ে ভেসে গেল জেনিফারের সব আপত্তি। দীর্ঘক্ষণ পর ওয়ার্নার অনুভব করল, ফোঁপাচ্ছে জেনিফার। ওর বুকের কাছটা ভিজে গেছে জেনিফারের চোখের জলে। ওয়ার্নার আরও কাছে টেনে নিল জেনিফারকে, কানে কানে বলল, 'কেঁদো না, সোনা, আমরা কোনো পাপ করিনি।'

জোরে ফুঁপিয়ে উঠে ওকে আঁকড়ে ধরল জেনিফার।

সে রাতে অনেক দেরিতে ঘরে ফিরল ওয়ার্নার। উঁচু খিলানওয়ালা গেট পেরিয়ে গাড়িটা বাগানের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ওয়ার্নার দেখল, দূরে বিশাল দুর্গের মতো বাড়িটায় প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পর্চে শুধু জ্বলছে কম-পাওয়ারের একটা আলো। গাড়ি এসে থামল পর্চে। ঘুমঘুম চোখে সদর-দরজা খুলে ধরল পরিচারক টম। টমের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে দোতলায় শোবার ঘরের দিকে এগোল ওয়ার্নার।

ঘরে ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠল। রাতের পোশাক পরে বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে নিয়ে আধশোয়া অবস্থায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মেরী। ম্লান হেসে জানতে চাইল, 'জেনিফারের কাছে ছিলে এতক্ষণ, তাই না?'

ওর নিষ্পাপ সরল মুখের দিকে চেয়ে প্রচণ্ড মমতা হল ওয়ার্নারের। মনে পড়ল, গত কয়েকমাস ওকে স্পর্শ করেনি সে। এগিয়ে গিয়ে পাশে বসে ওর একটা হাত ধরল, 'তুমি কি মনে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছ, মেরী?'

'না, অ্যাডাম, তুমি সুখে থাকলেই আমি সুখী,' ওয়ার্নারের কাঁধে মাথা রেখে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাডাম, কতদিন তুমি আমাকে আদর করোনি! আজ একটুখানি আদর করবে, শেষবারের মতো?'

মেরীকে বুকে টেনে নিল ওয়ার্নার।

নয়

নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে অ্যাডাম ওয়ার্নারের ব্যস্ততা। এখানে-ওখানে জনসভা, মিটিং, রেডিও-টিভিতে সাক্ষাৎকার, এসবের পর জেনিফারের সঙ্গে দেখা হয় খুম কম সময়ের জন্যে। যেটুকু সময় পায়, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ওরা। জেনিফারও খুব ব্যস্ত থাকে। প্রচুর মামলা পাচ্ছে ওর ফার্ম, প্রায় প্রতিটিতেই জিতে চলেছে ওরা। অবধারিত নিয়মে অফিসে পৌঁছে যায় মোরেত্তির পাঠানো গোলাপ, শেষ পর্যন্ত যার ঠাঁই হয় ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

আজ ক'দিন থেকেই জেনিফারের শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। অতিরিক্ত ব্যস্ততার ফল। তারপরেও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে চেকআপ করিয়ে নিয়েছে। আজ বিকেলেই রিপোর্ট দেবার কথা। কোর্ট থেকে বেরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল জেনিফার, ডাক্তারের কাছে যাবার সময় হয়ে গেছে। ট্যাক্সির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল।

হঠাৎ ওর গা-ঘেঁষে বিরাট কালো পরিচিত গাড়িটা ব্রেক কষল। পেছনের দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল মোরেত্তি, 'অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছি, মিস জেনিফার।'

শক্ত হয়ে গেল জেনিফারের গোটা শরীর, 'সরে দাঁড়ান, মি, মোরেত্তি। আমার জরুরি কাজ রয়েছে।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, ম্যাডাম। আপনার যতটুকু সময় আমি নষ্ট করব, তার দাম আপনি পেয়ে যাবেন।'

'অত টাকা আপনার নেই, মি. মোরেত্তি। দয়া করে যেতে দিন আমাকে,' আবার বলল জেনিফার।

'তাহলে এখানেই বলে ফেলি ব্যাপারটা। আমার প্রচুর বন্ধু রয়েছে। আপনার সাহায্য ওদের দরকার। প্রতিটি কেসের জন্যে দ্বিগুণ টাকা পাবেন আপনি।'

'লোভ দেখাচ্ছেন? মাফিয়াদের সঙ্গে কাজ করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

'আপনি বুদ্ধিমতী, কোনো সন্দেহ নেই। যদি কখনও সিদ্ধান্ত পাল্টান, 'টনি'স প্লেসে' ফোন করে আমাকে খুঁজবেন, ওরাই আমাকে খবর দিয়ে দেবে,' পেছন থেকে

ভেসে এল মোরেট্টির কণ্ঠস্বর।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ডাক্তারের রুমে ঢুকল জেনিফার। কাজে ব্যস্ত ডাক্তার। চেয়ার টেনে বসে পড়ল ও। মুখ তুলে ওকে দেখে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন ডাক্তার, 'বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি নার্সারি রুম সাজিয়ে ফেলুন, মিস জেনিফার, আপনি অচিরেই মা হতে যাচ্ছেন।'

বিমূঢ় হতবাক জেনিফার খানিকক্ষণ বুঝতেই পারল না ডাক্তার কী বলেছে। হুঁশ ফিরে পেতেই লাফিয়ে উঠল, 'বলেন কী! আপনার ভুল হয়নি তো?'

'জ. মরিসন কখনও ভুল করেছে বলে শুনেছেন?' হাসিটা বিস্তৃত হয়ে ডাক্তারের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, সংক্রমিত হল জেনিফারের মুখেও, 'ধন্যবাদ, ডাক্তার। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দৌড়ে বেরিয়ে এল জেনিফার রাজপথে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। তলপেটে হাত দিল। এখানে! এখানে বেড়ে উঠছে ওয়ার্নারের চিহ্ন! খুশিতে দম বন্ধ হয়ে এল জেনিফারের। এক্ষুনি জানাতে হবে অ্যাডামকে। কিন্তু এ মুহূর্তে ওকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে? ঠিক দুদিন পর নির্বাচন। প্রচণ্ড ব্যস্ত সে। গত এক হপ্তা দেখা ওদের। কাছে একটা টেলিফোন বুদ পেয়ে ঢুকে পড়ল জেনিফার। সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজল, কিন্তু পাওয়া গেল না। ওয়ার্নারের পি.এ-র কাছ থেকে শুধু এটুকু জানা গেল, এক সমাবেশে ভাষণ দেবার জন্যে ওয়ার্নার ব্রুকলিনে গেছে আজ সকালে।

দশ

নির্বাচনের দিন দুপুরবেলা জেনিফারের ডেস্কে ফোন বেজে উঠল। সিনথিয়া জানাল, মি. অ্যাডাম টার্নার ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুশিতে আত্মহারা হল জেনিফার, এ দুদিন বহু চেষ্টা করেও ওয়ার্নারের নাগাল পায়নি ও।

'জেনিফার, তুমি কি এক্ষুনি একবার "টনি'জ কর্নারে" আসতে পারবে?' ওয়ার্নারের গলার ত্রস্তভাব সতর্ক করে তুলল জেনিফারকে, থমকে গিয়ে বলল, 'এক্ষুনি আসছি আমি, অ্যাডাম। কী হয়েছে?'

'কথা বলার সময় নেই। এক্ষুনি এসো,' জেনিফারের প্রত্যুত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই রিসিভার নামিয়ে রাখল ওয়ার্নার।

তাড়াহুড়ো করে ফাইলগুলো গুছিয়ে ফেলল জেনিফার। সিনথিয়্যাকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। ঠিক দশ মিনিট পর 'টনি'জ কর্নারের' সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল জেনিফার।

দরজা থেকে সবচেয়ে দূরপ্রান্তের টেবিলে বসেছে ওয়ার্নার। দ্রুত ওদিকে এগোল জেনিফার। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওয়ার্নারকে। পরনে সুটটার ক্রিজ ভেঙে গেছে, চোখের কোলে কালি। উদ্বেগ বাড়ল জেনিফারের। নির্বাচনের জন্যে প্রচুর খাটতে হয়েছে ওয়ার্নারকে, কিন্তু মাত্র এ ক'দিনে এ কী অবস্থা হয়েছে!

চেয়ার টেনে বসে পড়ে চিন্তিতমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে অ্যাডাম, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওয়ার্নার, তারপর ভণিতা না করে বলল, 'জেনিফার, আমি বাবা হতে চলেছি, মেরী বেথের গর্ভে বেড়ে উঠছে আমার সন্তান।'

পৃথিবী কেঁপে উঠল জেনিফারের পায়ের নিচে, অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। কী বলছে অ্যাডাম! যে খবরটা শোনাবে বলে ক'দিন ধরে অপেক্ষা করছে ও, সে খবরটা দিয়েই ওকে চমকে দিল! কপালের দুপাশ টিপে ধরে চিন্তা করতে চাইল ও, কিন্তু সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে কী করে ওকে বলবে যে ওর আর একটি সন্তান ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে জেনিফারের গর্ভেও! মেরী বেথ ওর স্ত্রী, জেনিফারের চেয়ে তো ওরই বেশি অধিকার। মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ ও কেমন করে করবে!

'জেনিফার, মেরী বলছে এ অবস্থায় কিছুতেই ও আমাকে ডিভোর্স দেবে না। আমি জোর করলে হইচই বাধিয়ে দেবে। তেমন কিছু হলে আমার পলিটিক্যাল

ক্যারিয়ার একেবারে শেষ হয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়েছি, চাপ দিয়েছি, কিন্তু গর্ভপাত করাতেও রাজি নয় সে!' টেবিলের ওপর কনুই রেখে ওয়ার্নার দুহাতের আঙুল চালিয়ে দিল চুলের ভেতর।

'না, না, অ্যাডাম! অমন কোনও কাজ তুমি কোরো না।' দুসেকেন্ডের জন্যে থামল জেনিফার, তারপর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল, 'অ্যাডাম, তুমি মেরী বেথের কাছে ফিরে যাও। তোমার সন্তান গর্ভে নিয়ে ও অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। আজ থেকে তুমি ভুলে যাও আমাকে।'

'কী বলছ, জেনিফার! যে করেই হোক, তোমাকে আমি বিয়ে করব। দরকার হলে মামলা করব। থোড়াই পরোয়া করি রাজনীতির!' চিৎকার করে উঠল ওয়ার্নার।

'ছি, একদিন তুমি দেশের প্রেসিডেন্ট হবে, সেদিন বুঝবে এসব ভাবাবেগের কোনো মূল্যই নেই,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জেনিফার। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ব্যাগটা। হতবাক ওয়ার্নারের দিকে চেয়ে শুকনো মুখে হাসল, 'আজই আমাদের শেষ দেখা। তাহলে আসি, অ্যাডাম।' মন্থরগতিতে দরজার দিকে পা বাড়াল জেনিফার। পেছন থেকে ওয়ার্নার ওকে ডাকল, কিন্তু থামল না জেনিফার। বাইরে বেরিয়ে এসে দু'চোখে রুমাল চেপে ধরল, তবে একটু পরেই সামলে নিল নিজেকে। হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকল, উঠে বসে সিটে এলিয়ে দিল গা, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে দেহমন। তলপেটে পরম মমতায় হাত বোলাল জেনিফার, বিড়বিড় করে বলল, 'আজ থেকে তুই শুধু আমার!'

বাসায় ফিরে সোফায় শুয়ে পড়ল জেনিফার। চোখে জল নিয়ে ঘুমিয়েও পড়ল একসময়।

অনেক রাতে ধড়মড় করে উঠে বসল। জানালার বাইরে তাকিয়ে বুঝল, ভোর হতে বেশি দেরি নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, টিভির দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ল, এতক্ষণে অ্যাডামের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে অ্যাডাম নির্বাচনে হেরে গেছে, স্বার্থপরের মতো ভাবল জেনিফার। তাহলে ওকে ফিরে পাবার ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা থেকে যাবে।

দৌড়ে গিয়ে টিভি অন করল জেনিফার। পর্দায় ভেসে উঠল এডউইন নিউম্যানের শ্রান্ত চেহারা, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করছে। বিস্ফারিত চোখ মেলে জেনিফার শুনল, 'নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটরিয়াল ইলেকশনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বছরের সেরা চমক, অ্যাডাম ওয়ার্নার ভূতপূর্ব সিনেটর জন ট্রোব্রিজকে মাত্র এক শতাংশ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন...'। টিভি অফ করে দিল জেনিফার।

সব শেষ! হেরে গেছে জেনিফার।

এগারো

সপরিবারে ওয়াশিংটনে চলে গেল অ্যাডাম ওয়ার্নার। যাবার আগে অনেকবার দেখা করতে চেয়েছে জেনিফারের সঙ্গে, কিন্তু জেনিফার রাজি হয়নি। ওয়াশিংটন থেকেও অনেকবার ফোন এসেছে, রিসিভ করেনি ও। চিঠিগুলো না পড়েই ফেরত পাঠিয়েছে।

ক্রিসমাস এল, চলেও গেল। শুরু হল নতুন বছর। জেনিফারের দেহে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। একবার ভেবেছিল সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু অনাগত সন্তানের কথা ভেবেই সে চিন্তা বাদ দিল। যে আসছে, সে যে অবাঞ্ছিত! সিদ্ধান্ত নিল, পরিচিত কাউকে জানাতে দেয়া চলবে না ওর মাতৃত্বের কথা, অন্তত অ্যাডাম যেন কোনোদিন জানতে না পারে। জেনিফার চায় না অ্যাডামের ক্যারিয়ারের কোনো ক্ষতি হোক, বা কোনোরকম অনুশোচনায় ভুগুক সে।

শীতের শুরুতে অফিস স্টাফদের মিটিঙে ডাকল জেনিফার।

'আমি মাস পাঁচেকের জন্যে ছুটিতে যেতে চাই,' অফিশিয়াল সবাইকে জানাল। 'আমি কোনো টেলিফোন নাম্বার বা ঠিকানা রেখে যাব না। এ-ক'মাস আপনারাই ফার্মের দেখাশোনা করবেন।'

'তা কী করে হয়! আপনি ছাড়া...' আপত্তি জানাল ড্যান মার্টিন, সম্ভাবনাময় তরুণ আইনজীবী, গত ছ'মাস ধরে কাজ করছে জেনিফারের ফার্মে।

'উপায় নেই, ড্যান। আমাকে যেতেই হবে। আগামী সপ্তাহেই চলে যাচ্ছি আমি শহর ছেড়ে। আসলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন বিশ্রাম দরকার,' উঠে দাঁড়াবার আগে ঢিলেঢালা পোশাকটা ঠিক করে টেনেটুনে নিল জেনিফার। 'আশা করি ফিরে এসে ঠিক এভাবেই দেখব তোমাদের।'

মিটিঙের পর নিজের অফিসে বসে ড্যান মার্টিনকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল।

তিনদিন পরে ম্যানহাটানের বাইরে শহরতলিতে লনওয়ালা ছোট্ট দোতালা একটা বাড়ি কিনল জেনিফার। ঠিক করল, সন্তান জন্মাবার পর এ-বাড়িতেই থাকবে সবসময়ের জন্যে। লঙ আইল্যান্ডের কাছেই স্যান্ডস্ পয়েন্টে পড়েছে বাড়িটা, ধবধবে সাদা রঙ। লনের কিনারায় একসারি সবুজ ইউক্যালিপ্টাস আড়াল করে রেখেছে বাড়িটাকে।

পরের সপ্তাহে জেনিফার উঠে এল নতুন বাড়িতে। পরবর্তী চারটা মাস কখন কোন্ ফাঁকে কেটে গেল, বুঝতেই পারল না সে। এ-ক'মাস সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নানারকম কাজে ব্যস্ত ছিল সে, ফলে্ অ্যাডামের কথা চিন্তা করার সময়ই পায়নি।

বাড়িতে উঠে আসার পরপরই পোর্ট ওয়াশিংটনে গিয়ে আসবাবপত্রের অর্ডার দিয়ে এল ও। মিস্ত্রি ডাকিয়েলিকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস্ বসাল, ছোটখাটো মোরামতির কাজ সারল।

তারপর মন দিল ঘর সাজানোয়। অ্যান্টিকশপগুলো তোলপাড় করে কিনে ফেলল ল্যাম্প, টেবিল, কিনল আরও অনেক ডেকোরেশন পিস। দোতলার আলো-বাতাসময় রুমটাকে বানাল নার্সারি। রাজ্যের খেলনা কিনে ভরে ফেলল চারদিকে। যত্ন করে দেয়ালে লাগাল ডিজনিল্যান্ডের ছবিওয়ালা ওয়ালপেপার।

এই চারমাস কোনো খবরের কাগজ পড়ল না জেনিফার। টিভি কিংবা রেডিও খুলল না। টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করল না। চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল ওর জগত।

সপ্তাহে দুবার গাড়ি চালিয়ে গ্রামের সুপার মার্কেটে প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে যায় জেনিফার। ডাক্তারের কাছে দুসপ্তাহ পর পর। ডাক্তারের নির্দেশে বিনা-আপত্তিতে খায় গরুর দুধ। এ-ছাড়াও নানা ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য আর ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে হয় প্রতিদিন। শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় নড়াচড়া করতে, কাজ করতে খুব কষ্ট হয় পরের দিকে। কিন্তু সেজন্যে কখনও বিরক্ত হয়নি জেনিফার।

অবশেষে একরাতে তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল ওর। একটু পরে আবার যখন ব্যথা শুরু হল, বুঝতে পারল, সে আসছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল জেনিফার। অবশেষে প্রতি দশ মিনিট পর পর ব্যথাটা ফিরে আসতে শুরু করায় হাসপাতালে ফোন করল।

অ্যাম্বুলেন্স এসে ওকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। ডাক্তার লিনজেন অভয় দিলেন, 'কোনো ভয় নেই, মিস পার্কার। সবকিছুই স্বাভাবিক রয়েছে। আপনি শুধু শরীর শিথিল করে দিয়ে ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করুন, সময় হলে প্রকৃতিই বাকি কাজ করবে।'

আট ঘণ্টা লেবাররুমে থাকল জেনিফার। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে প্রচণ্ড আক্ষেপে কেঁপে উঠল সারা শরীর, ঘামে ভিজে গেল পরনের কাপড়। তীব্র বেদনা। জ্ঞান হারানোর পূর্ব-মুহূর্তে দেখল মাথার ওপর বনবন করে ঘুরছে ছাদের সঙ্গে লাগানো বড়, সাদা বাতিটি। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে জেনিফার দেখল হাসপাতালে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে ও।

জানালার বাইরেটা অন্ধকার। শরীর ব্যথা, বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ও জানে না। ও বেঁচে আছে। কিন্তু ওর সন্তান–?

বিছানার সঙ্গে লাগোয়া বেল টিপল জেনিফার। চেপে ধরেই থাকল। বিকট শব্দে বাজতে লাগল ঘণ্টা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল একজন নার্স। একটু উঁকি মেরেই চলে গেল। ফিরল ডা. লিনডেনকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি ঘণ্টা থেকে আস্তে সরিয়ে দিলেন জেনিফারের হাত।

জেনিফার ডাক্তারের হাত চেপে ধরল জোরে। কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল কণ্ঠ, 'আমার বাচ্চা!– ও কি মরে গেছে?'

ডা. লিনডেন বললেন, 'না, মিসেস পার্কার। ও বেঁচে আছে। আপনার ছেলে হয়েছে। আপনি বারবার আপনার ছেলেকে 'অ্যাডাম' বলে ডাকছিলেন।'

বারো

আট পাউন্ড-ছ' আউন্স ওজনের সুন্দর স্বাস্থ্যবান বাচ্চা। জেনিফার ওর নাম রেখেছে যোশুয়া অ্যাডাম পার্কার। জন্মের সময় কোনো বাচ্চাই সাধারণত দেখতে খুব সুন্দর থাকে না। কিন্তু যোশুয়া আশ্চর্যরকম সুদর্শন। দুদিনেই ডাক্তার আর নার্সদের মন জয় করে নিয়েছে।

যোশুয়ার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড কষ্ট হয় জেনিফারের। বাবার সাথে চেহারার আশ্চর্য মিল। সে-রকম নীল চোখ, কালো চুল, আর উজ্জ্বল গায়ের রঙ। অথচ কোনোদিন বাবার পরিচয় জানতে পারবে না ও। জেনিফার ভাবে ও কি যোশুয়ার প্রতি অবিচার করছে? না না, তা কেন হবে! বাবার অভাব কোনোদিনও ওকে বুঝতে দেবে না জেনিফার, বুকের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করবে।

তিনদিনের দিন প্রথম হাসল যোশুয়া। উত্তেজিত জেনিফার ডেকে নিয়ে এল নার্সকে, 'দ্যাখো, আমার ছেলে হাসছে।'

'ওটা হাসি নয়, মিস পার্কার, গ্যাসের জন্যে মুখের মাসল কাঁপছে।'

'অন্যদের বেলায় হয়ত তা-ই, কিন্তু আমার ছেলে হাসছে,' অসন্তুষ্ট গলায় বলল জেনিফার।

যোশুয়াকে নিয়ে বাসায় চলে এল হপ্তাখানেক পর। প্রথম দুহপ্তা একজন নার্স থাকল মা-ছেলের যত্ন নিতে। তবে সুস্থ হয়ে উঠে তাকে বিদায় করল জেনিফার। যোশুয়ার সমস্ত কাজ নিজহাতে করার মধ্যেই একধরনের আনন্দ পায় ও, অবাক হয়ে ভাবে : মা হওয়াটা কি এতই আনন্দের!

একটু বড় হলে যোশুয়াকে প্রতিদিন বিকালে প্যারাম্বুলেটরে নিয়ে বেড়াতে বের হয় জেনিফার। অনর্গল কথা বলে ছেলের সাথে, মনে হয়, এতদিনে পরিপূর্ণতা এসেছে ওর জীবনে।

দেখতে দেখতেই কেটে গেল আরও দুটো মাস। বিষণ্ন মনে জেনিফার ভাবে, ফিরে যাবার সময় হয়েছে কর্মজীবনে। বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর একজন হাউসকিপার নিয়োগ করল যোশুয়ার জন্যে। মধ্যবয়স্কা, দয়ালু-চেহারার মিসেস ম্যাকি, পনেরো বছর একটা পরিবারের বাচ্চাদের দেখাশোনা করেছেন। বাচ্চারা বড় হয়ে যাওয়ায় চাকরি হারিয়েছেন তিনি। মহিলার কথাবার্তা, ব্যবহার বেশ পছন্দ হল জেনিফারের।

হপ্তাখানেক পর অফিসে গেল জেনিফার।

তেরো

জেনিফারের অজ্ঞাতবাসের ক'টি মাস ম্যানহাটানের ল' অফিসগুলো প্রচুর গুজবের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সে ফিরে আসার পর সবার উৎসাহ লোপ পেল। সিনথিয়া, ড্যান, টেডসহ অন্যান্য সবাই শ্যাম্পেন আর বিরাট একটা কেক নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'এই সকাল ন'টায় কেক?' হেসে আপত্তি জানাল জেনিফার। কিন্তু চাপের মুখে অবশেষে আধখানা কেক ওকে একাই সাবাড় করতে হল।

'আর কখনও আপনি এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না তো?' পার্টি শেষে অনুযোগ করল ড্যান। ওদের ভালোবাসার পরিমাণ অনুভব করে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এল জেনিফারের, 'না। আর কখনও এমন হবে না, ড্যান!'

'ওহ্‌হো, আপনাকে বলা হয়নি, গত কয়েকদিন ধরে আপনার ঠিকানার জন্যে মি. মোরেত্তি আমাদের জ্বালিয়ে মারছেন। তাছাড়াও মি. টার্নার অসংখ্যবার ফোন করেছেন আপনাকে।'

'এতদিন ওদেরকে যা বলেছ, এখনও তা-ই বলবে,' শীতলকণ্ঠে উত্তর দিল জেনিফার।

অফিসের কাজ গুছিয়ে উঠতে তিন মাস লেগে গেল। আরও আগেই হয়ে যেত, কিন্তু প্রতিদিন দুপুর দুটোর পর যত কাজই থাকুক না কেন যোশুয়ার কাছে চলে আসে জেনিফার। সকালে নিজের হাতে ওকে নাশতা করিয়ে, গোসল করিয়ে অফিসে আসে জেনিফার। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চারপাশের পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যোশুয়াকে, গড়ে নিয়েছে নিজেদের আলাদা জগৎ।

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে এল যোশুয়ার। ওর দিকে চেয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে জেনিফারের। গর্বটা শুধু ওর একারই, এজন্যে প্রচণ্ড কষ্টও হয়। ঠিক বাবার মতো দেখতে হয়েছে যোশুয়া। মাঝে মাঝে ভয় হয়, কেউ যদি চিনে ফেলে!

ওর প্রথম জন্মদিনে ছোটখাটো পার্টির আয়োজন করল জেনিফার। শনিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কিনল উপহার, কয়েকজোড়া জামাকাপড়, ছবির বই, নানারকম

খেলনা আর একটা তিনচাকার সাইকেল, যেটা আরও দুতিন বছর পরেও যোশুয়া চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ। আশেপাশের বাড়ির দশ-বারোজন বাচ্চা আর তাদের মায়েদের দাওয়াত করেছে জেনিফার। সেদিন অফিসে গেল না ও। সারা সকাল খেটে চমৎকার একটা চকোলেট কেক বানাল। কিন্তু মেহমানরা আসার আগেই যোশুয়া এক খাবলা মেরে কেকের এককোণ ভেঙে মুখে পুরে দিল। তবে সেজন্যে পার্টির মজা নষ্ট হয়নি। বাচ্চারা সারা সন্ধে হইচই করে প্রচুর উপহার সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেল।

সে রাতে যোশুয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল জেনিফার। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার কথা, অ্যাডামের কথাও। এতদিনেও অ্যাডামের প্রতি ভালোবাসায় এতটুকু চিড় ধরেনি, বুঝতে পেরে আনন্দিত হল ও। অ্যাডাম ভালো থাক, সুখে থাক, এটাই তো চেয়েছিল সে। চারমাস হল ফোনে জেনিফারের খোঁজখবর করা বন্ধ করেছে অ্যাডাম ওয়ার্নার। তাতে খুশিই হয়েছে জেনিফার।

সিনেটর হিসেবে প্রচুর নাম করেছে ওয়ার্নার। পারিবারিক ঐতিহ্য, মেধা, ক্যারিজমা–সবকিছু তাকে অনন্যসাধারণ চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। কংগ্রেসে ওর বেশকিছু প্রভাবশালী বন্ধু রয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেকে ওয়ার্নারকে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট বলে অভিহিত করতে শুরু করেছে। পত্রিকায় যখন ওয়ার্নারের ছবি ছাপা হয়, টিভিতে যখন দেখা যায়, কিংবা রেডিওতে যখন ওর ভাষণ শোনা যায়–জেনিফার গর্বিত হয় এই ভেবে যে, ওয়ার্নার ওর সন্তানের পিতা। বিশেষ করে যখন একটা কূটনৈতিক মিশনের নেতা হিসেবে ওয়ার্নার মস্কো থেকে ঘুরে এল, হইচই পড়ে গেল চারদিকে। বহুদিন পর এই মিশন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সাফল্য বয়ে এনেছে। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে গেল ওয়ার্নার। ইতিমধ্যে ওর উদ্যোগেই সিনেটে বেশকিছু সংস্কার হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করায় ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে সে।

ওয়াশিংটনের জৌলুশময় ব্যস্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে মেরী বেথ ওয়ার্নার। অ্যাডাম ওয়ার্নার অবাক হয়ে দেখে, ওর মতো সাধারণ একটা মেয়ে কী অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে বড় বড় পার্টি আর ফাংশন সামাল দিয়ে চলেছে। ওদের সামাজিক জীবনের পুরো দায়িত্বই মেরী নিয়ে নিয়েছে তার একার কাঁধে, সেজন্যে ওয়ার্নার ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। বাইরে থেকে কেউ বুঝবে না কতটা অসুখী সে। এমন একটা জীবনযাত্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে সে, যেখান থেকে মুক্তি নেই। মেরী গর্ভবতী না হয়ে পড়লে জেনিফারকে কিছুতেই ওর জীবন থেকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিত না। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তুলতুলে মিষ্টি একটা মেয়ে উপহার

দিয়েছে মেরী বেথ ওকে, যাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে ওয়ার্নার। কিন্তু জেনিফারের কথা প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়ে।

'ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের হলরুমের চেয়ে অনেক বেশি ডিল হয় ডিনার টেবিলে, কি বলো অ্যাডাম?' চাচাশ্বশুরের হালকা রসিকতায় চমক ভাঙল ওয়ার্নারের। মৃদু হেসে সচেতন হয়ে উঠল। টেবিলের উল্টোদিকে ওকলাহোমার সিনেটর এবং তাঁর সালঙ্কারা স্ত্রীর সঙ্গে জমিয়ে কথা বলছে মেরী বেথ। আজকের পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ, আমলা, কূটনীতিক-সবাইকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এটাও অফিশিয়াল কাজেরই অঙ্গ। চারদিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়ার্নার। কী অর্থহীন অপচয়!

'তুমি খুব সৌভাগ্যবান, অ্যাডাম। একজন মানুষ জীবনে যা যা চাইতে পারে, তার সবই তুমি পেয়েছ,' পাশে বসা গভর্নরের স্ত্রী মাথার বেমানান পরচুলা ঝাঁকিয়ে হাসলেন ওর দিকে চেয়ে।

চেষ্টা করেও প্রত্যুত্তরে হাসিটুকু ফিরিয়ে দিতে পারল না ওয়ার্নার।

চোদ্দ

মামলার কাজে দুদিনের জন্যে লাস ভেগাসে যেতে হল জেনিফারকে। মিসেস ম্যাকিকে বারবার যোশুয়া সম্বন্ধে সাবধান করে দিল, কখন কী করতে হবে তার একটা রুটিন বানিয়ে দিল।

লাস ভেগাসে পৌঁছেই বাড়িতে ফোন করল, যোশুয়া ভালো আছে জেনে নিশ্চিন্ত হল। সন্ধ্যায় ঠিক করল, বাইরে না গিয়ে হোটেলের ডাইনিঙেই ডিনার সেরে নেবে। যদিও খরচ একটু বেশি পড়বে, সেজন্যে চিন্তা করে না ও। পাঁচতারা হোটেলে প্রতিদিন খাবার মতো সামর্থ্য রয়েছে ওর। জেনিফারের ফার্ম নিউইয়র্কের প্রথম শ্রেণীর ল'ফার্মগুলোর একটা।

কিন্তু নিচে নেমে খালি টেবিল না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ও। হঠাৎ ঘাড়ের পেছন থেকে ভেসে আসা ভরাট গলার স্বর চমকে দিল ওকে।

'আপনি আমার টেবিলে বসলে খুবই খুশি হব, মিস পার্কার,' পেছন ফিরে দেখল, দু'চোখে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছে মোরেত্তি।

একটু ভেবে নিয়ে রাজি হল জেনিফার। পথ দেখিয়ে নিজের টেবিলে নিয়ে এল ওকে মোরেত্তি।

বসে বসে ঘামতে লাগল জেনিফার, ভদ্রতা করতে গিয়ে এ কী ঝামেলা বাধিয়ে বসল সে!

ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিল মোরেত্তি। নিজের জন্যে কমলার রস নিল জেনিফার।

'কি খাবেন, বলুন? পোমেস সুফলে আর স্যালাড সাথে বিফ স্টেক। এখানে এর চেয়ে ভালো আর কিছু পাবেন না। ডেসার্টে কী খাবেন, সেটা পরে বললেই চলবে। আপাতত এই থাক, নাকি?'

'একটা কিছু হলেই হল। জড়তা ভাঙতে চেষ্টা করল জেনিফার। খুব বেশি অসুবিধে হল না। কারণ ডাইনিং হল ভর্তি মোরেত্তির পরিচিত লোকজন। টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সবাই একবার করে থামছে, সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলছে। বিজনেস এক্সিকিউটিভ, বিখ্যাত অভিনেতা, আইনজীবী থেকে শুরু করে একজন ইউনাইটেড স্টেট সিনেটর পর্যন্ত মোরেত্তিকে দেখে এগিয়ে এসে কথাবার্তা

বলে গেলেন। মোরেত্তির অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে এতদিন শুধু ও শুনেই এসেছে, আজ বুঝল, কতটা ক্ষমতাশালী সে। আশ্চর্য হয়ে ভাবল জেনিফার, এই সুদর্শন লোকটার মার্জিত অমায়িক ব্যবহার দেখলে কে বলবে সে অন্ধকার জগতের মানুষ! সাধে কি আর শহরের অর্ধেক অবিবাহিতা নারী মোরেত্তির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে!

'আপনি যখন ছুটিতে ছিলেন, আমি দু-একবার আপনার অফিসে ফোন করেছি,' জেনিফার জানে, দু-একবার নয়, বরং দু-একদিন পরপরই করেছে। 'ছিলেন কোথায় আপনি?'

'এমনি, কিছুদিন শহরের বাইরে কাটিয়েছি, বলতে পারেন বিশ্রাম,' সতর্কভাবে জবাব দিল জেনিফার।

অনেকক্ষণ চুপচাপ খেল মোরেত্তি। তারপর হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মনে আছে আপনার?'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল জেনিফার। 'আমি ও বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না।'

'আপনি যা চাইবেন–'

'বললামই তো। আগ্রহ নেই আমার।'

প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল মোরেত্তির গভীর কালো চোখে, 'আপনার ব্যক্তিত্বকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি আমি।'

খাওয়া শেষে মার্টি অ্যালেনের কনসার্ট শুরু হল। সুরের জগতে হারিয়ে গেল জেনিফার। ভুলে গেল ওর পাশেই রয়েছে এক দানব।

গান শেষ হওয়ার পর দুজন বেরিয়ে এল হলের বাইরে। অবাক হয়ে জেনিফার ভাবল, এতক্ষণ এই লোকটার সঙ্গে রয়েছি, একটুও বিরক্তি বোধ হল না, জেনিফারকে রুমের দরজায় পৌঁছে দিয়ে কোমল কণ্ঠে মোরেত্তি বলল, 'শুভরাত্রি। আপনাকে বলতে ইচ্ছে করছে, আজকের সন্ধেটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল।'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, যা কাঁপিয়ে দিল জেনিফারের ভেতরটা।

পনেরো

চার বছর বয়সে যোশুয়া তার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হল। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তারা দুজনে গল্প করে। ফুটবল, টিভি কার্টুন আর বাবা হল তাদের আলাপের বিষয়বস্তু।

যোশুয়া জানে, ওর সৈনিক বাবা ভিয়েতনামের যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকেই বাবা সম্বন্ধে যোশুয়ার মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে অন্যান্য ছেলেদের বাবাদের দেখে। অম্লানবদনে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যেকথা বলে ছেলের মন ভরায় জেনিফার, আর তীব্র অনুশোচনায় ভোগে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরোবার মুখে সিনথিয়া বলল, 'মি. ক্লার্ক হোলম্যান নামের এক ভদ্রলোক ফোন করেছেন।'

একটু ইতস্তত করে লাইন দিতে বলল জেনিফার। ভদ্রলোক পরিচিত। লিগ্যাল এইড সোসাইটির উকিল।

'অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে খুব দুঃখিত, মিস পার্কার,' ভদ্রলোকের কুণ্ঠিত স্বর ভেসে এল। 'কিন্তু আমাদের কাছে এমন একটা কেস এসেছে, যা কেউ নিতে চাচ্ছে না। আমরা জানি আপনি খুব ব্যস্ত। তারপরেও সময় করে যদি একটু...'

'আসামি কে?'

'জ্যাক স্কানলন্।'

পরিচয়ের জন্যে নামটিই যথেষ্ট। গত দুদিন ধরে সব পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হচ্ছে তার ছবি। পাঁচ বছরের এক মেয়েকে কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ দাবি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে জ্যাক স্কানলনকে। সাক্ষীদের তৈরি করা কমপোজিট ড্রইং থেকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে জ্যাককে।

'কিন্তু আমি কেন, ক্লার্ক?'

'কারণ জ্যাক স্ক্যলনন আপনার কথাই বলেছে। আপনাকে ছাড়া অন্য উকিল সে নেবে না।'

ঘড়ি দেখল জেনিফার। যোশুয়া ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। 'জ্যাক এ-মুহূর্তে কোথায় আছে?'

'মেট্রোপলিটান কারেকশনাল সেন্টারে।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল জেনিফার, 'ঠিক আছে, এক্ষুনি আসছি আমি। তুমি সব ব্যবস্থা কর।'

জেনিফার বাসায় ফোন করে মিসেস ম্যাকিকে বলল, 'আজ ফিরতে দেরি হবে আমার। যোশুয়াকে ডিনার খাইয়ে দিয়ো। ওকে বোলো, ও ঘুমোবার আগেই বাসায় পৌঁছে যাব আমি।'

দশ মিনিট পর রওনা হল জেনিফার। অন্তর থেকে ঘৃণা করে ও কিডন্যাপারদের। জঘন্যতম অপরাধগুলোর একটা এটা। বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের যারা কিডন্যাপ করে, তাদের অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই বলে মনে করে ও। তবে এটাও ঠিক, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রত্যেকের রয়েছে। জ্যাককেও সে সুযোগ দেয়া উচিত। অবশ্য যদি সে সত্যি কিডন্যাপ করে থাকে।

রিসেপশন রুমের গার্ডকে নিজের পরিচয় দিলে ওকে নিয়ে আসা হল ল'ইয়ার্স ভিজিটিং রুমে। কয়েক মিনিট পরে গার্ডের সঙ্গে ঢুকল জ্যাক। চেহারা দেখে মনে মনে একচোট হেসে নিল জেনিফার। মনে হচ্ছে, স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট ধরায় নেমে এসেছেন আবার। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, লম্বা রুগ্ণ শরীর উজ্জ্বল চোখ, সোনালি কোঁকড়ানো দাড়ি নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। মাঝখানে সিঁথি করা নিপাট নিভাঁজ চুল। খবরের কাগজে এর ছবি দেখলেও জেনিফারের মনে হলো, আগে কখনও দেখেনি লোকটাকে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস পার্কার, কষ্ট করে এসেছেন,' নরম মার্জিত স্বরে কথা বলল জ্যাক। 'আমার জন্যে আপনি যদি একটুও দুঃখবোধ করেন, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

যিশুখ্রিস্টের বিনয়-বিগলিত কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল জেনিফার। হাসি চেপে বসতে বলল ওকে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি বসল জ্যাক।

'এবার বলুন, এত উকিল রেখে আমাকে কেন চেয়ে পাঠিয়েছেন আপনি?'

'কারণ আপনিই শ্রেষ্ঠ। যদিও আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। বোকার মতো একটা কাজ করেছি আমি,' মাথা নিচু করে ফেলল জ্যাক, সম্ভবত লজ্জায়।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা বোকার কাজ? তারপরে আবার মুক্তিপণও চেয়ে পাঠিয়েছেন!'

'বিশ্বাস করুন, মুক্তিপণ আমি চাইনি। মুক্তিপণের জন্য আমি ট্যামিকে কিডন্যাপ করিনি,' জ্যাকের দু-চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল।

'ওহ্! তাই নাকি! তবে কীজন্যে কিডন্যাপ করেছিলেন মেয়েটাকে?'

কার্পেটের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল জ্যাক। তারপর ধীরে ধীরে চোখ তুলল, ধরাগলায় বলল, 'শুনবেন আমার কাহিনী?'

নর্থ ডাকোটার এক ছোট্ট খামারবাড়িতে জন্ম জ্যাক স্কানলনের। অভাবগ্রস্ত পরিবারে অনাদরে অবহেলায় বেড়ে ওঠে জ্যাক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাতাল স্যাডিস্ট বাবা অকারণে চাবুকপেটা করত তাকে। পনেরো বছর বয়সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল সে। এখানে ওখানে ঠোক্কর খেয়ে একদিন শিকাগোর এক ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ পেল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না-পেলেও পড়ার নেশা ছিল জ্যাকের। কাজের বাইরে সময়টুকু পড়াশোনা করে কাটাত সে। ধীরে ধীরে কেটে গেল আটটা বছর। একদিন ফ্যাক্টরিতে কাজের সময় হাতে চোট পেল জ্যাক, নিয়ে আসা হল ওকে ডিসপেনসারিতে। সেখানে পরিচয় হল নীল নয়না সুন্দরী নার্স এভলিনের সাথে।

'জীবন এত সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি। প্রেমে পড়লাম। দুবছর পর বিয়েও হল। বুঝলাম, শুধু সুন্দরী নয়, অদ্ভুত গুণী মেয়ে এভলিন। জীবনটা কানায় কানায় ভরে উঠল আমার,' স্বর্গীয় হাসি জ্যাকের মুখে। 'সত্যিকারের সুখী ছিলাম আমরা। সুন্দর এক বিকেলে এভলিন জানাল, বাবা হতে চলেছি আমি। কী যে খুশি হয়েছিলাম আমরা!'

অন্তর দিয়ে অনুভব করল জেনিফার জ্যাকের অনুভূতি।

'কিন্তু ডাক্তার ওকে অ্যাবরশন করতে বলল। মা হবার জন্যে নাকি যথেষ্ট সবল ছিল না ও,' বিষাদ নেমে এল জ্যাকের কণ্ঠে। 'আমরা ডাক্তারের কথায় কান দিলাম না। জন্মাবার আগে কেমন করে খুন করব নিজের সন্তানকে!' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জ্যাক, তারপর বলল, 'কিন্তু সন্তান জন্ম দেবার সময় সত্যিই মারা গেল এভলিন। দুদিন পরে মেয়েটাও মারা গেল। পাগল হয়ে উঠলাম আমি। কী করে সহ্য করি! আমি তো কখনও কারও ক্ষতি করিনি, কেন ভগবান আমাকে এই শাস্তি দিলেন!' দুহাতে মুখ ঢাকল জ্যাক।

চোখ ভিজে উঠল জেনিফারের, জ্যাকের হাতে হাত রাখল, 'তারপরে কী হল?'

'প্রথমদিকে মনে হত, আত্মহত্যা করি। পাপের ভয়ে পারলাম না। ভবঘুরের মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মেয়েবাচ্চা দেখলেই মনে পড়ে যেত আমার মেয়ের কথা। প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি বাচ্চাদের। কিন্তু একদিন ট্যামিকে পার্কে খেলতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মিস পার্কার, ট্যামিকে দেখে মনে হল, এভলিন নেমে এসেছে, পৃথিবীতে মানুষের চেহারায় এত মিল থাকে! মনে হল, ট্যামি আমাদেরই মেয়ে। বেঁচে থাকলে এত বড়ই হত সে। ট্যামির কাছে যেতে সে হেসে তাকাল আমার দিকে। সে মুহূর্তে...মিস পার্কার, সে মুহূর্তে আমার মধ্যে হঠাৎ করে কী যে হয়ে গেল, ওকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড় দিলাম আমি। জানি,

অপরাধ করেছি, কিন্তু ঐ মুহূর্তে একটিবারও মনে হয়নি সেটা,' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল জ্যাক। 'বিশ্বাস করুন, ট্যামিকে আমি কোনো কষ্ট দিইনি, যতক্ষণ আমার কাছে ছিল, ভালোই ছিল সে।'

'কিন্তু মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করেছিলেন কেন?' জেনিফার বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'বিশ্বাস করুন, এ ধরনের কোনো ফোন আমি করিনি। আমি গরিব সত্যি, কিন্তু টাকার প্রয়োজন আমার নেই। আমি শুধু ট্যামিকেই চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু তাহলে ফোনটা কে করল?' চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল জেনিফার। 'আচ্ছা, আপনি গ্রেফতার হবার আগেই কি কিডন্যাপের ঘটনাটা পত্রিকায় এসেছিল?'

'হ্যাঁ। খবরটা ছাপা হবার পরই আমি ধরা পড়ে যাই।'

'তার মানে অন্য কেউ কিডন্যাপের ঘটনা জেনে গিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে।'

'জানি না, মিস পার্কার, জানি না। এ মুহূর্তে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু চাই না আমি,' আবার দুহাতে মুখ ঢাকল জ্যাক।

জ্যাকের জন্যে কষ্ট হল জেনিফারের। অপরাধ করেছে, সে-সম্বন্ধে সচেতন লোকটা, প্রচণ্ড অনুশোচনায় ভুগছে। সিদ্ধান্ত নিল, সাহায্য করবে জ্যাককে। এই অনুতপ্ত লোকটিকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে দেয়া যায় না।

পরদিন জ্যাকের জন্যে জামিনের ব্যবস্থা করল জেনিফার। জামিনের দু-হাজার ডলার জ্যাকের কাছে ছিল না, জেনিফারই দিল।

ছাড়া পেয়ে ওয়েস্ট সাইডের এক মোটেলে উঠল জ্যাক। হাতখরচের জন্যে তাকে একশো ডলার ধার দিয়েছে জেনিফার। জ্যাক আগেই বলেছে, জেনিফারের প্রাপ্য ফিস দেবার সামর্থ্য তার নেই। নেহাত মানবতার খাতিরেই ওকে সাহায্য করছে জেনিফার। লজ্জায় অধোবদন হয়ে জ্যাক বলেছে, 'কেমন করে আপনার এই ঋণ শোধ করব জানি না, মিস পার্কার। তবে কথা দিচ্ছি, একদিন সবই ফেরত পাবেন।'

সেদিন থেকেই চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরতে শুরু করল জ্যাক।

ষোলো

কয়েকদিন পর ফেডারেল প্রসিকিউটার আর্ল অসবর্নের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল জেনিফার। উদ্দেশ্য, জ্যাকের বিরুদ্ধে কিডন্যাপিঙের অভিযোগ প্রত্যাহার করে অন্য কোনো অভিযোগ আনার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করানো। এতে জ্যাকের শাস্তির পরিমাণ কমে যেতে পারে।

দয়ালু থলথলে চেহারা অসবর্নের। দেহের ভাঁজে ভাঁজে থাক-থাক চর্বি জমেছে। অবাক হয়ে তিনি চাইলেন জেনিফারের দিকে, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি ঐ জঘন্য লোকটাকে বাঁচাতে চাইছ! একজন নীতিবান আইনজীবী কখনোই অপরাধীকে দয়া দেখায় না। এ ধরনের লোকেরা সবসময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে,' রেগে উঠলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর রাগ জেনিফারকে স্পর্শ করল না, 'শুনুন, মি. অসবর্ন, সবকিছু শুনলে আপনিও ওকে দয়া দেখাবেন।'

'কী এমন নতুন তথ্য শোনাবে তুমি ঐ বদমাশটা সম্বন্ধে? কিছুই জানতে বাকি নেই আমার!'

ভদ্রলোককে রেগে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি জ্যাকের ইতিহাস বলতে শুরু করল জেনিফার। ও নিশ্চিত, জ্যাকের জীবনের করুণ কাহিনী জানলে মত বদলাবেন অসবর্ন।

শুনতে শুনতে চোখ গোল হয়ে গেল অসবর্নের। জেনিফার কথা শেষ করার পরেও কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী আবোলতাবোল বকছ!'

এবার রাগ হল জেনিফারের, এতকিছু শুনেও মন গলল না ভদ্রলোকের! 'আশ্চর্য! মানবতার খাতিরেও তাকে আপনার সাহায্য করা উচিত।'

'মানবতা! দাঁড়াও, তোমাকে দেখাই, কার জন্যে মানবতা দেখাতে বলছ!' বিশাল বপু নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অসবর্ন। ঘরের কোণের ক্যাবিনেটের ড্রয়ার ঘেঁটে একটা নতুন ফাইল তুলে এনে নাড়তে লাগলেন জেনিফারের নাকের সামনে, 'দ্যাখো, তোমার জ্যাক স্কানলনের ডোশিয়ের রয়েছে এখানে, ভালো করে পড়ে দ্যাখো,' ফাইলটা তিনি আছড়ে ফেললেন জেনিফারের সামনের টেবিলে।

বিস্মিত জেনিফার ফাইলটা খুলে পড়তে শুরু করল। 'ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন। বয়স সাঁইত্রিশ। জন্মস্থান নব হিল, সানফ্র্যান্সিসকো। বাবা ডাক্তার, মা সমাজসেবিকা। চোদ্দ বছর বয়সে ড্রাগস্-এ আসক্ত হয়। একদিন ঝগড়া করে বাড়ি ছেলে চলে যায়। পুলিশ হাইট-অ্যাশবারি থেকে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তিনমাস পর বাবার ডিসপেনসারি ভেঙে দামি ওষুধ বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে। পাঠানো হয় সংশোধন কেন্দ্রে। আঠারো বছর বয়সে মুক্তি পায় সে। কিন্তু পরে ব্যাংক-ডাকাতি এবং হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগ আবার গ্রেফতার করা হয় তাকে,' এ-পর্যন্ত পড়ে বিরক্ত হল জেনিফার। 'এই লোকের সঙ্গে জ্যাক স্কানলনের সম্পর্ক কী?'

'এই ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনই জ্যাক স্কানলন্।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরল জেনিফার।

সন্তুষ্টির হাসি হাসলেন অসবর্ন, 'দু-ঘণ্টা আগে এফ.বি.আই. এই ডোশিয়ে পাঠিয়েছে। অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। জ্যাকসন আসলে সাইকোপ্যাথ। তোমাকে বোকা বানিয়েছে। গত দশবছরে অন্তত বিশবার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বেশ্যার দালালি থেকে শুরু করে সশস্ত্র ডাকাতির মতো ভয়ংকর সব অভিযোগে। বিয়ে করেনি এখনও সে। পাঁচ বছর আগে এফ.বি.আই. তাকে প্রথমবার কিডন্যাপিঙের অভিযোগে গ্রেফতার করে। মুক্তিপণ চেয়ে টেলিফোন করে সে। টাকা দেবার দু-মাস পর জঙ্গলে পাওয়া যায় তিন বছর বয়সের মেয়েটির লাশ। হাত-পা-মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে শরীর থেকে। সারা শরীরে ছুরির পোঁচের দাগ। মেরে ফেলার আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল মেয়েটিকে।'

অসুস্থ বোধ করল জেনিফার। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। অবশেষে বলল, 'ডোশিয়েটা একটু দেখতে পারি?'

'অবশ্যই। তোমার সামনেই তো আছে।'

মনোযোগ দিয়ে পুলিশের তোলা ছবিটা দেখল জেনিফার। দাড়ি নেই মুখে, বয়সও অনেক কম, কিন্তু জেনিফারের কোনো সন্দেহ রইল না ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনই জ্যাক স্কানলন্! কী সুন্দর গল্প ফেঁদে বসেছে! আর বোকার মতো বিশ্বাস করেছে জেনিফার। রাগে ঘৃণায় রি রি করে উঠল সমস্ত শরীর। আশ্চর্য! কী ভয়ংকর লোক!

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেনিফার। অসবর্নের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়েও শান্ত গলায় বলল, 'আমি এ মামলা নেব না। আমি এমন কারও প্রতিনিধিত্ব করি না, যে আমার কাছে মিথ্যে বলে। মি. জ্যাক স্কানলনকে অন্য উকিল বেছে নিতে হবে।'

'কোর্ট সে ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এ মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজনীয় তা হল ওর জামিন প্রত্যাহার করতে হবে।'

'আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। এ ধরনের বিপজ্জনক একটা লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়াক, আমি তা চাই না,' ঘৃণা উপচে পড়ল জেনিফারের প্রতিটি কথায়।

পরদিন জ্যাক স্কানলনের জামিন প্রত্যাহার করা হল।

সারাদিন এ ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দুপুরে বাড়ি ফিরতে পারল না জেনিফার। বিকেলে আবার একটা পার্টিতে যেতে হবে। আইনজীবী সমিতির বাৎসরিক পুনর্মিলনী। অফিসেই কাপড় বদলে নিল ও। দু-সেট কাপড় সবসময় অফিসে রেখে দেয় জেনিফার। তাড়াহুড়া করে হাজির হল ওয়ালডর্ফ অ্যাসটোরিয়াতে, প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে তখন।

জমজমাট পার্টি। কিন্তু মন লাগাতে পারল না জেনিফার। বারবার মনে পড়ছে ভণ্ড শয়তান কিডন্যাপারটার কথা, আর মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে।

অসবর্ন এগিয়ে এলন ককটেলের গ্লাস হাতে। 'ব্যাপার কী, তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

'শরীর ঠিকই আছে। তবে খুব টায়ার্ড লাগছে। সারাদিন কম খাটাখাটুনি তো গেল না!' তিক্ত হাসল জেনিফার।

'ও ব্যাটার হাত থেকে যে রক্ষে পেয়েছ, সেটাই বেশি।'

এমন সময় ক্লাবের এক কর্মচারী এগিয়ে এসে জেনিফারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'মিস পার্কার, আপনার ফোন।'

চমকে উঠল জেনিফার। ও এখানে রয়েছে, পরিচিত কেউ তা জানে না। অফিস আওয়ার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, সেখান থেকেও ফোন আসার কথা নয়।

রিসিভার কানে চেপে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল পুরুষকণ্ঠের চাপা আওয়াজ, 'কুত্তী! তুই আমাকে ঠকিয়েছিস!'

সরসর করে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল জেনিফারের। 'কে বলছেন?' উত্তরটা যদিও ওর জানা। জ্যাক ছাড়া আর কেউ নয়।

'তুই পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিস আমার পেছনে।'

'আমি...' কথা শেষ করতে দিল না লোকটা, 'তুই আমাকে সাহায্য করবি বলে কথা দিয়েছিলি।'

'অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব আমি...'

'বজ্জাত মিথ্যেবাদী মেয়েমানুষ!' আরও নিচুস্বরে বলল জ্যাক, 'তোকে এসবের ফল ভোগ করতে হবে। খুব শিগগিরই তোর পাওনা পেয়ে যাবি,' নিচু হতে হতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল জ্যাকের অপার্থিব কণ্ঠস্বর।

দিশেহারা হয়ে গেল জেনিফার। 'হ্যালো! হ্যালো!' লাইন কেটে দিয়েছে জ্যাক।

শিরশির করে ভয়ের শীতল স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে।

স্যাডিস্টটা কী করে জানল জেনিফার এখানে রয়েছে। নিশ্চয়ই অফিস থেকে ফলো করে এসেছে! কে জানে, এ মুহূর্তে ক্লাবের বাইরে পিস্তল হাতে হয়তো ওর জন্যে অপেক্ষা করছে! কিন্তু পুলিশের হাত ফস্কে পালাল কেমন করে? এখন তো ওর হাজতে থাকার কথা! অবশ্য কেমন করে পালাল সেটা বড় কথা নয়, এ মুহূর্তে সবচেয়ে যেটা ভয়ের ব্যাপার, জেনিফারকে দোষী ভাবছে লোকটা। এর আগেও খুন করেছে সে, আর একটা খুন করতে বাধবে না ওর। ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল জেনিফারের। বাসায় ফিরবে কেমন করে! গেটের বাইরে পা বাড়াবার সাথে সাথে যদি একটা বুলেট ছুটে আসে, অথবা যদি ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর মুখোশধারী খুনীটা!

জেনিফারের বিবর্ণ চেহারা লক্ষ করে এগিয়ে এলেন অসবর্ন। 'কি হল, মিস পার্কার, কোনো দুঃসংবাদ নয় তো?'

হড়বড় করে সব বলে ফেলল জেনিফার। ওর ভয় সংক্রমিত হল অসবর্নের মধ্যে। 'এক্ষুনি তোমার বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত। যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করো, তবে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। জ্যাক জানে, তুমি এখানে রয়েছ।'

কৃতজ্ঞবোধ করল জেনিফার। 'পৌঁছে দিতে হবে না। বাইরে আমার গাড়ি রয়েছে। শুধু যদি গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন আমাকে!'

'অবশ্যই। এসো আমার সঙ্গে।'

দুজনে এগোল দরজার দিকে। প্রথমে অসবর্ন বাইরে গিয়ে দেখে এলেন। না, কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। ক্লাবটা ঠিক মেইন রোডের ওপর নয় বলে রাস্তাটা নির্জন। জেনিফারকে সঙ্গে করে গাড়িতে পৌঁছে দিলেন। ভদ্রলোক বারবার বলে দিলেন চোখকান খোলা রেখে চালাতে।

দুরুদুরু বুকে ইগনিশন-কী ঘোরাল জেনিফার। বোমার বিস্ফোরণ ঘটল না দেখে খুশি হয়ে উঠল। স্পিড বাড়িয়ে মেইন রোডে উঠে আসতে আসতে ভয় আরও কমে গেল গাড়িঘোড়ার ভিড়ে। সাবধানের মার নেই, সামনে-পেছনে ভালো করে নজর রাখল ও। অকারণে আধাঘণ্টা ঘুরে বেড়াল ব্যস্ত রাজপথে। যখন নিশ্চিত হল কেউ ওকে ফলো করছে না, তখন গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

ছোট্ট লনটা পেরিয়ে পোর্চে গাড়ি পার্ক করল জেনিফার। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দোতলার জানালার দিকে। কোনো রুমে আলো জ্বলছে না, অন্ধকারে ডুবে আছে সারা বাড়ি। মিসেস ম্যাকির কী হল! বিরক্ত জেনিফার। মহিলা ভালো করেই জানেন, অন্ধকারে ভয় পায় যোশুয়া। হঠাৎ কেমন ভয়-ভয় করে উঠল জেনিফারের।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। চারদিকে মৃত্যু শীতল অন্ধকার! হোঁচট খেতে খেতে রিসেপশন হলে এল। সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে হঠাৎ পায়ের নিচে নরমমতো কিসের যেন স্পর্শ পেল। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে গেল জেনিফারের, জিনিসটা শুধু নরমই নয়, গরমও। পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সুইচবোর্ডের ওপর, আলোয় ঝলমল করে উঠল সারাঘর।

যোশুয়ার আদরের কুকুর ম্যাক্সের নিথর শরীরটা পড়ে আছে কার্পেটের ওপর, রক্তে ভিজে গেছে চারপাশ। এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত গলাটা কেটে ফেলা হয়েছে ম্যাক্সের। বরফের মতো সাদা পশমগুলো লাল হয়ে গেছে রক্তে। নিষ্পাপ খোলা চোখ দুটো চেয়ে আছে জেনিফারের চোখের দিকে, অপলক।

'যোশুয়া!' চিৎকার করে উঠল জেনিফার। 'মিসেস ম্যাকি!' সারা বাড়ির আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ল জেনিফারের আর্তনাদ।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরে দৌড়ে বেড়াতে লাগল ও। জ্বালিয়ে দিচ্ছে সবগুলো আলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছুটে গেল যোশুয়ার শোবার ঘরে। সবকিছু যেমন ছিল তেমনি আছে। নেই শুধু যোশুয়া। কোঁচকানো চাদর দেখে বোঝা যায় বিছানায় শুয়েছিল যোশুয়া।

মাথার ভেতরটা খালি হয়ে গেছে জেনিফারের। কিচ্ছু চিন্তা করতে পারছে না। ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। মনে হচ্ছে যেন পায়ের নিচে মাটি নেই, বাতাসে সাঁতার কাটছে! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ও জানে, জ্যাক ধরে নিয়ে গেছে যোশুয়াকে। ফাঁকা দৃষ্টিতে চারপাশে চাইল জেনিফার। যোশুয়া নেই!

ভূতের মতো হেঁটে বেড়াতে লাগল জেনিফার সারা বাড়িতে, মনে হচ্ছে, এক্ষুনি কোনো দরজার পেছন থেকে যোশুয়া লাফিয়ে পড়বে, 'হাউ!' হাততালি দিয়ে নেচে উঠবে, 'কেমন ভয় দেখালাম!'

লনড্রি রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোত্থেকে যেন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। চমকে উঠে রুমের ভেতর তাকাল, অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আলো জ্বেলে তৃষিতের মতো চাইল চারদিকে। শব্দটা আসছে ক্লজিটের ভেতর থেকে। টান দিয়ে খুলে ফেলল ডালাটা। ককিয়ে উঠলেন মিসেস ম্যাকি। 'প্লিজ, আর মেরো না!' হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছেন, গোল গোল দু-চোখ উন্মাদের দৃষ্টি। একত্রে বাঁধা দু-হাত তুলে মুখটা আড়াল করতে চাইছেন বারবার, চিনতে পারেননি জেনিফারকে। কোলে করে ক্লজিটের বাইরে কার্পেটের ওপর শুইয়ে দিল তাঁকে জেনিফার। 'মিসেস ম্যাকি, আমি জেনিফার। শান্ত হোন, কী হয়েছে খুলে বলুন।'

ধীরে ধীরে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল তাঁর মুখ থেকে। দুচোখ ভরে গেল জলে। মাথাটা একপাশে সরিয়ে চারদিকে কী যেন খুঁজলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যোশুয়াকে নিয়ে গেছে শয়তানটা!'

তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল জেনিফার। দড়ি কেটে বসাতে রক্ত বেরিয়ে গেছে। একটা চোখ ফুলে গেছে, গালে কালসিটে। ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, 'যোশুয়াকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন! পারলাম না! পারলাম না!'

ওদের দুজনকে চমকে দিয়ে পাশের ঘরে ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল জেনিফারের। দু-চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল, 'খোদা, শক্তি দাও!' বেজেই চলল ফোন। ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল জেনিফার। ওপাশ থেকে ভেসে এল নিচু গলার কুৎসিত হাসি, 'যাক, ঠিকমতো বাসায় পৌঁছেছ!'

'আমার বাচ্চা কই?' শক্তি ফিরে পেল জেনিফার।

'চমৎকার বাচ্চাটা, তাই না?'

'যা চাও সব দেব, শুধু ফিরিয়ে দাও ওকে। দয়া করো, জ্যাক, দয়া করো!' ফুঁপিয়ে উঠল জেনিফার।

ঘিনঘিনে হাসিটা থামিয়ে কঠিন গলায় ধমকে উঠল জ্যাক, 'আমাকে দেবার মতো কিছুই নেই তোর! কুত্তী! এখন আমি শুধু তোর কান্না শুনতে চাই।'

'না...না...প্লিজ, আমার বাচ্চা...ওকে ব্যথা দিয়ো না।'

'আগামীকালের খবরের কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়িস, তা না হলে ঠকবি!' আত্মা-কাঁপানো হাসিটা আবার ভেসে এল। দু-সেকেন্ড পর লাইন কেটে দিল শয়তানটা।

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল জেনিফার। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল, এখন ভেঙে পড়ার সময় নয়। কী যেন বলল জ্যাক, 'চমৎকার বাচ্চাটা, তাই না?' তার মানে যোশুয়া এখনও বেঁচে আছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে। বেঁচে না থাকলে প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলত না জ্যাক। এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে! প্রতিটি মিনিট মূল্যবান।

প্রথমেই ইচ্ছে হল অ্যাডামকে ফোন করে সবকিছু খুলে বলে। যোশুয়া তো ওরই ছেলে, আজ রাতের মধ্যেই যে খুন হতে চলেছে। সিনেটরের অনেক ক্ষমতা। নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দিতে পারবে যোশুয়াকে জেনিফারের কোলে! কিন্তু...আজ এত বছর পর...তার ওপর প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে রয়েছে ওয়ার্নার। কী-ই বা করার থাকবে! আজকের রাতটাই যে সম্বল! না! ওকে বলে কোনো লাভ নেই। অতদূর থেকে কিছুই করতে পারবে না সে।

দিশেহারা হয়ে পড়ল জেনিফার। কার কাছে যাবে, আজ রাতের মধ্যে কে যোশুয়াকে ফিরিয়ে দিতে পারবে ওর কোলে!

আর একটা পথ এফ.বি.আই.-এর সাহায্য চাওয়া। কিডন্যাপারদের ধরার জন্যে

আলাদা ট্রেনিং রয়েছে তাদের। কিন্তু এ ব্যাপারটা যে ঠিক অন্য ঘটনাগুলোর মতো নয়। কোনো ক্লু ফেলে যায়নি জ্যাক। মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি পাঠায়নি, যোশুয়াকে মেরে ফেলার আগে হয়তো আর ফোনও করবে না! কোনো সূত্র ধরে জ্যাকের পিছু নেবে তারা! তা-ও হাতে রয়েছে মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা!

দুহাতে মুখ ঢাকল জেনিফার। লম্বা করে নিশ্বাস টানল। দু-সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল। কাঁপা হাতে টেলিফোন গাইড উল্টে সঠিক নাম্বারটা বের করল। বহু কষ্টে ডায়াল ঘোরাবার চেষ্টা করল, তিনবারের বার সফল হল। ওদিক থেকে রিং বাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

মনে হল, যেন অনন্তকাল ধরে বেজে চলেছে রিং। অবশেষে ওপাশ থেকে ঘুমজড়িত কণ্ঠ ভেসে এল, 'ইয়েস!'

'আমি মি. অ্যান্টোনিও মোরেত্তির সঙ্গে কথা বলতে চাই,' প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল জেনিফার।

সতেরো

'দুঃখিত মিস, এটা টনি'স প্লেস। এখানে মোরেট্টি নামে কেউ থাকে না,' সতর্ক কণ্ঠে বলল লোকটা।

'প্লিজ, রেখে দেবেন না!' আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জেনিফার। বহু চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রাখল। 'দেখুন, আমি সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছি। উনি আমাকে চেনেন। আমার নাম জেনিফার পার্কার। এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'দেখুন, মিস...'

'আপনি শুধু তাঁকে আমার নাম আর টেলিফোন নাম্বারটা পৌঁছে দিন,' নাম্বারটা বলল জেনিফার। 'আর বলবেন...' কথা শেষ না হতেই লাইন কেটে দিল লোকটা। রিসিভার নামিয়ে রেখে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জেনিফার।

কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না। সময় নেই! সময় নেই! আগামীকালের পেপারে জেনিফারের জন্যে একটা খবর থাকবে। না! অ্যাডামকেই ডাকবে ও, ঠিক করল। রিসিভারে হাত রাখতেই ওকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল ফোনটা। দ্রুত তুলে নিল।

'মোরেট্টি বলছি।'

'মি. মোরেট্টি!' সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল জেনিফারের। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিসিভারটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল আবার রিসিভারের ওপর। 'মি. মোরেট্টি?'

'শান্ত হোন, মিস পার্কার। কী হয়েছে খুলে বলুন।'

'আমার ছেলে...যোশুয়া...কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে। মেরে ফেলবে...' হুহু করে কেঁদে ফেলল জেনিফার।

'আপনি কিডন্যাপারকে চেনেন?' ব্যস্ততা মোরেট্টির কণ্ঠে।

'হ্যাঁ...ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন।'

'কান্নাকাটি করার সময় নয় এটা,' ধমকে উঠল মোরেট্টি। 'খুলে বলুন, ঠিক কী হয়েছে।'

ধীরে ধীরে সময় নিয়ে বলল জেনিফার।

'জ্যাকসন দেখতে কেমন?'

যিশুখ্রিস্টের মতো চেহারাটা ভেসে উঠল জেনিফারের চোখের সামনে। নির্ভুল

বর্ণনা দিতে পারল সে। জামিনে ছাড়া পাবার পরে যে গ্যাস-স্টেশনে কাজ নিয়েছিল আর যে মোটেলে থাকত, তার ঠিকানা দিল। যদিও জানে, পাওয়া যাবে না তাকে এসব জায়গায়।

ফুঁপিয়ে উঠল জেনিফার, 'আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন!'

'শুনুন, মিস পার্কার। এটা খুব জরুরি ব্যাপার। যদি আমরা তাকে খুঁজে পাই...'

'সঙ্গে সঙ্গে খুন করবেন,' নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করল জেনিফার শব্দগুলো।

'ঠিক আছে। আপনি টেলিফোনের পাশেই থাকুন,' সন্তুষ্টির সুর মোরেট্টির গলায়।

রিসিভার নামিয়ে রাখল জেনিফার। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে ও। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। যদিও জানে, সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবুও এতবড় দায়িত্বটা নিজের ওপর নেই বলে হালকা লাগছে। ভেবে অবাক হল জেনিফার, খুনী লেলিয়ে দিয়েছে ও জ্যাকের পেছনে। পরমুহূর্তে কঠোর হল, মনে পড়ল, তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটির ধর্ষিত লাশের কথা।

পাশের ঘর থেকে মিসেস ম্যাকির কান্নার শব্দ ভেসে এল। ছুটে এল জেনিফার। যত্ন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল কাটা ঘা-গুলোতে। জোর করে বিছানায় শুইয়ে দুটো ঘুমের বড়ি আর এক গ্লাস পানি নিয়ে এল বৃদ্ধার জন্যে। ছুড়ে ফেলে দিলেন মিসেস ম্যাকি ট্যাবলেট দুটো। জোরে কেঁদে উঠলেন, 'ওহ্, মিস পার্কার! বদমাশটা যোশুয়াকে আমার সামনে ঘুমের বড়ি গিলিয়ে খাইয়েছে!'

ভয়ের শীতল একটা স্রোত নেমে গেল জেনিফারের শিরদাঁড়া বেয়ে।

ডেস্কের ওপাশে বসে তিনজন সোলদাতিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে মোরেট্টি।

নিক ভিটো।

সালভাতর ফিওর।

জোসেফ কোলেল্লা।

অদ্ভুত চেহারা নিক ভিটোর। ঠোঁটদুটো এত পাতলা যে প্রায় দেখাই যায় না। সবুজ চোখদুটোয় মরামানুষের দৃষ্টি। পেটানো শরীর, কালো চুল। দামি পোশাক ছাড়া সে পরে না। যে-জুতো জোড়া পরে আছে, তার দাম দু'শো ডলারের কম নয়। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, মেপে কথা বলে সে।

সালভাতর ফিওর লম্বায় চার ফিট দশ ইঞ্চি, বামনই বলা যায় তাকে। নিষ্পাপ দৃষ্টি চোখে। কেউ ভাবতেও পারবে না ছুরিতে কতটা ওস্তাদ সে। কোনো অজ্ঞাত কারণে মেয়েরা সাংঘাতিক পছন্দ করে তাকে। এক বউ, আধ ডজন গার্লফ্রেন্ড আর সুন্দরী রক্ষিতাকে খুশি রেখেছে সালভাতর। এককালে জকি ছিল কিন্তু ঘোড়াকে

ড্রাগস্ দেয়ার অভিযোগে হলিউড পার্কস্-এর রেসিং কমিশনার এক বছরের জন্যে সাসপেন্ড করেন তাকে। এক হপ্তা পর লেক তাহোতে ভাসতে দেখা যায় কমিশনারের লাশ।

জোসেফ কোলেল্লাকে সবাই 'সবজি-বাগান' বলে ডাকে। আলুর মতো নাক, বাঁধাকপির মতো কান আর মটরদানার সমান মগজের কারণেই এ নাম হয়েছে তার। বিশাল চর্বিযুক্ত শরীর। সাংঘাতিক ভদ্র। ধার্মিক। প্রতি রোববার স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে নিয়ে চার্চে যায়। পিস্তল, অ্যাসিড আর সাইকেলের চেনে ওস্তাদ সে।

নিক ভিটোর দিকে তাকাল মোরেট্টি। 'গ্যাস-স্টেশনে যাবে তুমি। তার আশেপাশের সব মদের দোকান আর বারে খোঁজ নেবে।'

এরপর কোলেল্লা আর কার্লোর দিকে ফিরল সে, 'তোমরা যাবে মোটেলে। অন্য সব বোর্ডারের কাছে খোঁজ নেবে। আমি নিশ্চিত, কারও-না-কারও সাথে ওর যোগাযোগ রয়েছে,' ঠাণ্ডা দৃষ্টি বোলাল তিনজনের ওপর। 'ঠিক আট ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যেই বাচ্চাটাকে আমার সামনে হাজির করা চাই। অক্ষত অবস্থায়।'

রাত একটা।

মোটেলের রুমটা ছোট হলেও সাজানো-গোছানো। ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন সবসময়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। জানালার ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডগুলো নামিয়ে দিয়েছে সে, 'যাতে রাতে বাইরে থেকে কিছু দেখা না যায়। দরজায় তালা দেয়া। তারপরেও ভারি চেয়ারটা দরজার সামনে এনে রেখেছে। এগিয়ে গিয়ে বিছানার পাশে থামল জ্যাক। ঘুমোচ্ছে যোশুয়া। ঘুমের বড়ির ঘোর এখনও কাটেনি। শান্ত সুন্দর নিষ্পাপ শিশু। ওকে নিয়ে আসতে পেরেছে বলে গর্ব অনুভব করল জ্যাক। মিসেস ম্যাকিকে যে-দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, তারই বাকি অংশ দিয়ে খাটের সঙ্গে আচ্ছামতো বেঁধেছে যোশুয়াকে। সাবধানের মার নেই। বাচ্চাটার স্বর্গীয় মুখের দিকে চেয়ে দুঃখে ভরে গেল জ্যাকের সমস্ত হৃদয়।

কেন ঐ বিচ্ছিরি মানুষগুলো তাকে এসব বাজে কাজ করতে বাধ্য করে! ও তো শান্তিপ্রিয়, নম্র ভদ্র সাধারণ এক মানুষ। অথচ সারা পৃথিবীর লোক যেন ওর পিছু লেগে আছে উত্যক্ত করার জন্যে! নিজেকে বাঁচাবার অধিকার নিশ্চয়ই তার আছে। একদিন-না-একদিন সে প্রমাণ করে দেবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ সে।

পুলিশ ওকে ধরতে আসার একঘণ্টা আগেই সে টের পেয়ে যায়। গ্যাস-স্টেশনে একটা শেভ্রোলেতে তেল ভরছিল তখন ও। টেলিফোন বেজে উঠতে ওর বস্ তা রিসিভ করে। কী কথা হয়েছে, তা শুনতে পায়নি জ্যাক। শোনার দরকারও ছিল না। হঠাৎ করে গলার স্বর নিচে নামিয়ে বস্ যখন ওর দিকে ঘন ঘন চোরাদৃষ্টি ফেলতে

লাগল, তখনই ও বুঝে যায়, পুলিশ আসছে। বজ্জাত মাগীটা ঠকিয়েছে ওকে! অথচ তাকে অন্যরকম ভেবেছিল সে। একমিনিটের মধ্যে কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জ্যাক। তিন মিনিট পরে দরজা খোলা একটা গাড়িতে উঠে তার ছিঁড়ে স্টার্ট করল, সোজা চলল জেনিফারের বাড়ির দিকে। জামিনে ছাড়া পাবার দিনই জেনিফারকে ফলো করে বাসা চিনে রেখেছিল সে। এমন বুদ্ধি ওর ছাড়া আর কার আছে? গেটের উল্টোদিকে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল জ্যাক। অবাক হয়ে দেখেছিল দেবশিশুর মতো সুন্দর একটা বাচ্চা গেটের কাছে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেছিল জেনিফারকে। এই অদ্ভুত আবিষ্কারে খুশি হয়ে উঠেছিল জ্যাক নিজের ওপর।

হাউসকিপার বুড়িটার কথা মনে হতে একচোট হেসে নিল। বুড়ি ভেবেছিল, ও তাকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছে। থুঃ! কী নোংরা আর জঘন্য এই মেয়েগুলো। আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের প্রতি কোনোরকম আকর্ষণ বোধ করেনি জ্যাক। ওর শুধু ভালো লাগে শিশুদের। আহ্! কী নরম পেলব তাদের শরীর, কী মিষ্টি গন্ধ!

শেষ যে-বাচ্চাটাকে ও ভোগ করেছে, তার কথা মনে পড়ে গেল। অত তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে ওর ছিল না। নিরুপায় হয়ে মারতে হল। মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে মেয়েটা। বজ্জাত মাগীটা ওর চাকুরি খেয়ে দিয়েছিল। পুরুষগুলো খারাপ ঠিকই, কিন্তু মাগীগুলো আরও খারাপ!

ক্লারা থমাসের কথা মনে হল জ্যাকের। এখানকার এক নাইটক্লাবে নাচে, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী। একমাথা কোঁকড়া সোনালি চুল। পরিচয় হয়েছে একবারে, দিন দশেক আগে। মেয়েটা ভাবে জ্যাক ওকে ভালোবাসে। কারণ একদিনও ওকে স্পর্শ করতে চায়নি জ্যাক অন্য লোভী কুকুরগুলোর মতো। যদি আসল ব্যাপারটা জানত বেচারি! ওর সঙ্গে বিছানায় যাবার কথা মনে হলে অসুস্থবোধ করে জ্যাক।

তবে কাজে লাগিয়েছে ক্লারাকে। পুলিশ শুধু একা একজন পুরুষমানুষকে খুঁজবে। এই সুযোগে ক্লারাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে ও কানাডায়। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে জ্যাক, চুলও ছেঁটে নিয়েছে। চেনে কার সাধ্যি! বর্ডার পেরোবার পর ক্লারাকে খসিয়ে ফেলবে— কথাটা মনে হতেই পুলকিত হয়ে উঠল জ্যাক। দারুণ মজা হবে!

ঘুমন্ত যোশুয়াকে নিয়ে এই মোটেলে এসে উঠেছে জ্যাক কয়েক ঘণ্টা আগে। এই এলাকার কেউ ওকে চেনে না, তাই মোটামুটি নিশ্চিন্তেই আছে।

লাগেজ র‍্যাক থেকে তোবড়ানো সুটকেসটা নামিয়ে নিল। ভেতর থেকে বের হল একটু টুল-কিট। সেটা খুলে দুটো বড়সড় চকচকে গজাল আর ভারি একটা হাতুড়ি নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর বাথরুমে ঢুকে বাথটাবের ভেতর থেকে তুলে আনল দু-গ্যালনের একটা পেট্রলভর্তি ক্যান। যোশুয়ার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখল

ক্যানটা। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে, বাচ্চাটাকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেই জমবে ভালো। তবে তার আগে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে। সব কাজের মধ্যেই শৈল্পিক সত্তার প্রকাশ ঘটাতে ভালোবাসে জ্যাক।

রাত দুটো।

নিউইয়র্ক সিটি এবং তার আশেপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে গুজবটা। সস্তা রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ডিস্কো থেক, অল-নাইট নিউজস্ট্যান্ড—সব জায়গায় আলোচিত হচ্ছে ব্যাপারটা। ট্যাক্সি ড্রাইভার আর নিশাচর পতিতারাও জেনে গেছে— অ্যান্টোনিও মোরেত্তি একজন লোককে খুঁজছে। হ্যাংলা-পাতলা, সোনালি চুলের লোকটাকে দেখলেই যিশুখ্রিস্টের কথা মনে পড়ে। এ-ধরনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। অনেকেই উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মোরেত্তির নেকনজরে পড়ার মোক্ষম একটা সুযোগ। মোরেত্তি জানে, কীভাবে গুণের কদর করতে হয়। শহরময় তৎপর হয়ে উঠল বেশকিছু লোক। খুঁজতে শুরু করেছে তারা যিশুখ্রিস্টের মতো দেখতে একজন লোককে।

রাত দুটো বেজে পনেরো মিনিট।

অসহিষ্ণুভাবে জ্যাক অপেক্ষা করছে কখন যোশুয়া জেগে উঠবে। গজাল, হাতুড়ি, পেট্রল— সবই রেডি। কিন্তু ঘুমের ওষুধের ঘোর এখনও কাটছে না যোশুয়ার। ঘুমন্ত অবস্থায়ও শাস্তি দেয়া যায়। কিন্তু জেগে না উঠলে মজা কোথায়! চিৎকার করে কাঁদবে, ছটফট করবে, কাকুতি মিনতি করবে— তবেই না মজা! তাছাড়া ওকে জানাতে হবে, কেন ও মরছে। যখন জানবে মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে সে, তখন কেমন হবে তার মনের অবস্থা! অস্থির হয়ে উঠল জ্যাক। জাগছে না কেন এখনও! ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ক্লারা ওকে নিতে আসবে সকাল সাড়ে সাতটায়। এখনও সোয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় রয়েছে হাতে। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকল জ্যাক।

ভোর সাড়ে তিনটে।

অপেক্ষা করছে মোরেত্তিও। ওর সামনে ডেস্কের ওপর দুটো টেলিফোন। প্রতিবার ফোন আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রিসিভারের ওপর। প্রথম তিনটে ফোন ব্যর্থতার সংবাদ বয়ে এনেছে। গ্যাস-স্টেশন আর মোটেলে ঢুঁ মেরে মোরেত্তির লোকেরা কোনো সূত্র পায়নি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মোরেত্তির। ঠিক এ-সময় এল চতুর্থ ফোনটা।

'শেষ যেবার জ্যাক জেলে ছিল, ওর সেলমেট ছিল মিকি নিকোলা। শোনা যায় দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল, তাছাড়া জ্যাকের আপন বোন নিকোলার রক্ষিতা।'

'কোথায় পাওয়া যেতে পারে নিকোলাকে?' আশান্বিত হয়ে উঠল মোরেট্টি।

'পুরে কোথাও সে থাকে। ঠিকানা উদ্ধার করা যায়নি। তবে জ্যাকের বোন যে ক্লাবে নাচে, তার ঠিকানা পাওয়া গেছে। ম্যানেজারকে চেপে ধরলেই গড়গড়িয়ে মাগীটার ঠিকানা দিয়ে দেবে। তারপর নিকোলাকে ধরা কোনো ব্যাপার নয়।'

'তাহলে অপেক্ষা করছ কিসের জন্যে গর্দভ?' ধমকে উঠল মোরেট্টি। 'এখুনি কাজে লেগে যাও।'

ভোর সাড়ে চারটে।

সাদা রঙ করা বাড়িটার সামনে ছোট্ট একটুকরো ফুলের বাগান। কার্লো আর কোলেল্লা বাগান পেরিয়ে দেয়াল ঘেঁষে পৌঁছে গেল পেছনের দরজায়। দরজার তালা ভাঙতে পাঁচ সেকেন্ডের বেশি লাগল না। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এল দুজন দোতলায়। শোবার ঘর থেকে ভেসে আসছে বিছানার খচমচ আলোড়নের শব্দ আর নারীকণ্ঠের উচ্চকিত হাসি।

জড়ানো স্বরে মেয়েটা বলে উঠল, 'ওহ্! মিকি! কী দারুণ পারো তুমি! আরও জোরে দাও।'

'ভালো লাগছে, সোনা? দাঁড়াও, আরও দিচ্ছি,' পুরুষকণ্ঠের অধিকারী হাঁপাচ্ছে।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল কার্লো আর কোলেল্লা। চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। ঝট করে ঘুরে তাকাল মিকি ওদের দিকে। পিস্তল, ছোরা কিছুই চোখ এড়াল না। তবু শান্ত থাকার চেষ্টা করল সে।

'ঠিক আছে, চেয়ারের হাতলে রাখা প্যান্টের পকেটেই ওয়ালেটটা আছে। নিয়ে দয়া করে কেটে পড়ো। দেখছ না, ব্যস্ত আছি!'

'আমরা ওয়ালেটের জন্যে আসিনি, নিকোলা।' বিষণ্নদৃষ্টিতে চোখে চোখে চেয়ে আছে কার্লো।

চেষ্টা করে যে-হাসিটা ফুটিয়ে তুলেছিল নিকোলা, সেটা মুখ থেকে মুছে গেল। চারদরটা তুলে ছুড়ে দিল উলঙ্গ মেয়েটার গায়ে। যৌনাঙ্গ ঢাকল বালিশ দিয়ে। বিছানার ওপর উঠে বসে সতর্কচোখে চাইল বামন আর দৈত্যটার দিকে। 'কী চাও তোমরা?'

'ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসনকে চেনো?'

'ভাগ শালা এখান থেকে!' রাগে কুঁচকে গেল মিকির মুখের মাংসপেশি।

কিন্তু পাত্তা দিল না কার্লো। তাকাল কোলেল্লার দিকে। 'ব্যাটার অণ্ডকোষ দুটো উড়িয়ে দাও তো দোস্ত!'

কোলেল্লা পিস্তল তাক করল।

লাফিয়ে উঠল মিকি। 'কী করছ তোমরা...পাগল নাকি!' ট্রিগারে চেপে বসা কোলেল্লার আঙুলের ডগা সাদা হয়ে উঠছে দেখে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'চিনি...চিনি জ্যাককে।'

তীক্ষ্ণ স্বরে শাসাল মেয়েটা, 'মিকি!'

কার্লো এবার ঘুরে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'তুমিই তো জ্যাকের বোন, তাই না?'

রাগে বেগুনি হয়ে উঠল মেয়েটা। 'জীবনেও ও-নাম শুনিনি!'

সালভাতর ছুরি নাচাল, 'তোমার বুক-দুটো এক পোঁচে কেটে নিলে কেমন হবে, সুন্দরী?'

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল মেয়েটার। বলে কী! ছুরিটাকে এগিয়ে আসতে দেখল ওর বুকের দিকে। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল মুখ।

'বলছি...প্লিজ, থামো তোমরা। জ্যাক আমার ভাই।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' ছুরিটা স্পর্শ করল মেয়েটার পেলব ত্বক।

চিৎকার করে উঠল সে ভয়ে, 'ক্লারা! ক্লারা বলতে পারবে। আমি কিচ্ছু জানি না!'

'ক্লারা কে?'

'নাইট ক্লাবে নাচে। জ্যাকের বান্ধবী।'

'কোথায় পাব তাকে?'

একটুও ইতস্তত না করে বলে ফেলল মেয়েটা, 'শেকার্স ইন কুইনস নামে একটা বার-এ কাজ করে, এটুকুই জানি। বাসার ঠিকানা জানি না।' তার গা থরথর করে কাঁপছে।

ছুরিটা সরিয়ে নিল সালভাতর। নরম গলায় বলল, 'যে-কাজটা শুরু করেছিলে, সেটা শেষ করতে পারো এখন তোমরা।'

ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুটকেস গোছাচ্ছে ক্লারা। গুনগুন করছে আপন মনে। এতদিনে ওর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। নোংরা জীবন থেকে ওকে উদ্ধার করতে এসেছে ওর স্বপ্নের রাজকুমার, ছোঁ মেরে ওকে নিয়ে যাবে স্বপ্নের দেশে। সত্যিকারের ভদ্রলোক জ্যাক। যারা প্রতিদিন ওর শরীরের এখানে-সেখানে হাতাহাতি করে, কথা বলতে বলতে চাপড় মারে পাছায়, মোটেই তাদের মতো নয়। চারদিন দেখা হয়েছে ওদের। এর মধ্যে ওর হাতটা পর্যন্ত ধরতে চায়নি জ্যাক। আচ্ছা, বিছানায় কেমন হবে সে? ভাবতে

গিয়ে লজ্জা পেল ক্লারা। ঠিক হ্যায়, অসুবিধে নেই। এমন দু-একটা কায়দা শিখিয়ে দেবে ওকে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হবে জ্যাক। ঘড়ির দিকে তাকাল ক্লারা। সাড়ে পাঁচটা বাজে। সাড়ে সাতটায় মোটেলে জ্যাকের সঙ্গে দেখা করার কথা। তাড়াহুড়ো করে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলে ফেলল গা থেকে। চেয়ারের পিঠ থেকে জিনস্টা নেবার জন্যে ঝুঁকেছিল দু-সেকেণ্ডের জন্যে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় তাকাতেই আকাশ থেকে পড়ল সে।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন ভয়ংকর চেহারার লোক! সবাই জানে, টাকাপয়সা নেই ওর। তাহলে নিশ্চয়ই ধর্ষণ করতে চায় ওকে! বুকের কাছে তুলে ধরল জিনস্টা। 'বদমায়েশি করার ইচ্ছে থাকলে কেটে পড়ো। আমি গনোরিয়ায় ভুগছি। পরে আমাকে দুষতে পারবে না।'

জিভ আর টাকরা দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করল সালভাতর ফিওর, 'তেমন কোনো মতলব আমাদের নেই, খুকি। জ্যাকসন কোথায় আছে, জানতে পেলেই চলে যাব আমরা।'

'জ্যাকসন! সে আবার কে?' রাজ্যের বিস্ময় ক্লারার দু-চোখে।

'এখুনি মনে পড়বে,' পকেট থেকে লম্বা একটা লোহার পাইপ বের করল কার্লো।

'খবরদার, ভয় দেখিয়ো না!'

পরমুহূর্তে ওর মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল পাইপটা। ব্যথায় অন্ধকার দেখল ও চোখে। দু-চোখ ভরে উঠল পানিতে। সালভাতর পাইপটা আবার তুলতেই ভয়ে সাদা হয়ে গেল ক্লারা। 'প্লিজ...মেরো না, বলছি...' মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দাঁতের কুচি মেশানো রক্ত। ফোঁপাচ্ছে ক্লারা। চোখের সামনে ভেসে উঠল জ্যাকের শান্ত ভদ্র চেহারা। কত কষ্টই না দেবে তাকে এই গুণ্ডাদুটো! কেমন করে সইবে জ্যাক? কঠিন হয়ে উঠল ক্লারা। না। কিছুতেই বলবে না।

'দেখুন, অযথাই মারছেন আমাকে। চিনি না আমি লোকটাকে।'

মড়াৎ করে ডান পা-টা ভেঙে গেল ক্লারার। কেমন করে, বুঝতেও পারল না সে। শুধু এগিয়ে আসতে দেখেছে সালভাতরকে। উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে গোঙাতে লাগল সে, মুখভর্তি রক্ত।

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, জানে মারব না তোমাকে। শুধু একটার-পর-একটা হাড় ভেঙে দেব,' পাইপ হাতে আবার এগোল সালভাতর।

'না, না! বলছি আমি,' বলতে গিয়ে বুক ভেঙে গেল ক্লারার। 'প্রস্পেক্ট অ্যাভিন্যুর ব্রুকসাইড মোটেলে উঠেছে ও। সে...' আর কিছু বলতে পারল না, জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়ল কার্পেটের একপাশে। দুঃখ হল কোল্লেলার। বললি তো বললি,

এতকিছুর পর! বিছানার ওপর রাখা ফোনটার দিকে এগিয়ে গেল সে। আরাম করে বিছানায় বসল। তারপর ডায়াল ঘোরাল।

ওদিক থেকে মোরেট্টির গলা ভেসে এল, 'ইয়েস!'

'প্রস্পেক্ট অ্যাভিন্যুর ব্রুকসাইড মোটেল। আমরা কি যাব?'

'আমি না-পৌছুনো পর্যন্ত মোটেলের বাইরে অপেক্ষা করো। ভেতরে ঢুকবে না। লক্ষ্য রাখবে যেন বেরোতে না পারে।'

'ও কোথায়ও যাবে না, বস্,' আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল কোলেল্লার গলায়।

সকাল সাড়ে ছ'টা।

নড়াচড়া করতে শুরু করেছে যোশুয়া। জ্যাকের উদগ্রীব দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল জ্যাকের দিকে, তারপর লক্ষ করল হাত-পা বাঁধা ওর। আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল সব। এ-লোকটা কিডন্যাপ করেছে ওকে। ফিলমে দেখেছে, শেষপর্যন্ত পুলিশ এসে উদ্ধার করে। পুলিশ না-আসা পর্যন্ত সহ্য করতে হবে সবকিছু। ঠিক করল, লোকটাকে বুঝতে দেয়া চলবে না যে ভয় পেয়েছে ও। পাঁচবছরের ছেলে ভয় পেয়েছে শুনলে লোকে হাসবে! মা নিশ্চয়ই ওর সাহসের কথা শুনলে গর্ব বোধ করবে!

'আমার মা এক্ষুনি টাকা নিয়ে চলে আসবে। আমাকে ব্যথা দেবেন না তো?'

লম্বা লম্বা পা ফেলে যোশুয়ার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল জ্যাক। নিচু হয়ে হাসল। কী সুন্দর বাচ্চা! ক্লারার বদলে যদি একে নিয়ে কানাডায় যাওয়া যেত! কিন্তু না! মায়ের পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হবে বাচ্চাটাকে।

'দয়া করে আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দেবেন, মিস্টার? খুব ব্যথা করছে। কথা দিচ্ছি, পালাবার চেষ্টা করব না।'

ছেলেটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হল জ্যাক। কী চমৎকার আদবকায়দা! মোটেই আজকালকার বিচ্ছু বাচ্চাগুলোর মতো নয়। ঘড়ির দিকে তাকাল জ্যাক। নাহ্! আর দেরি করা চলে না। গজালগুলো আর হাতুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে এগোল যোশুয়ার দিকে।

'কী করবেন ওগুলো দিয়ে, মিস্টার?' ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল যোশুয়া ভয়ংকর জিনিসগুলোর দিকে।

'যা করতে যাচ্ছি, দেখে তুমি খুব খুশি হবে। যিশুখ্রিস্টের কথা তো জানো?'

মাথা কাত করল যোশুয়া।

'কীভাবে তাঁকে মারা হয়েছিল তা জানো কি?'

'জানি। ক্রুশবিদ্ধ করে।'

'এই তো তুমি জানো। আমাদের কাছে তো ক্রুশ নেই, তাই মেঝেতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।'

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল যোশুয়ার। বুঝতে আর কিছুই বাকি নেই ওর।

'ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, খোকা। যিশুও ভয় পাননি। তুমি কেন ভয় পাবে?'

'আমি যিশু হতে চাই না। আমি মা'র কাছে যাব,' কেঁদে ফেলল যোশুয়া।

বিরক্ত হল জ্যাক। পকেট থেকে পরিষ্কার সাদা সিল্কের রুমালটা বের করে দলা পাকিয়ে যোশুয়ার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল পুরোটা। তারপর টেপ দিয়ে আটকে দিল মুখ। কোলে করে শুয়ে দিল মেঝেতে। ছটফট করছে যোশুয়া। গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছ রুমাল ভেদ করে। ওর ছোট্ট বুকটা হাঁটু দিয়ে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল জ্যাক, যাতে নড়াচড়া না করতে পারে। হাতের বাঁধন খুলে দিল। জোর করে বাম হাতটা বিছিয়ে ধরল মেঝের ওপর। বাম হাত বাড়িয়ে তুলে নিল চকচকে একটা গজাল। যোশুয়ার তুলতুলে হাতের তালুতে বসিয়ে ডান হাতে চেপে ধরল। তারপর বাম হাতে তুলে নিল হাতুড়িটা। জল গড়াচ্ছে যোশুয়ার দু-চোখ থেকে। কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীর। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতুড়িটা নামিয়ে আনল জ্যাক গজালটার ওপর। টের পেল, যোশুয়ার নরম হাতের তালু ভেদ করে ঢুকে গেছে গজালটা মেঝের ভেতর।

সকাল সাড়ে সাতটা।

ব্রুকসাইড মোটেলের বাইরে গাড়িতে বসে আছে সালভাতর আর কোলেল্লা। সাত নম্বর বাংলার ঠিক সামনে অপেক্ষা করছে তারা। একটু আগেও ভেতরে জ্যাকের গলা শোনা গেছে। তার মানে, এখনও ভেতরে আছে সে।

সকাল পৌনে আটটা।

হতাশ চোখে যোশুয়ার দিকে চেয়ে আছে জ্যাক। বিনা নোটিশে জ্ঞান হারিয়েছে ছেলেটা। জ্ঞান না ফিরলে অন্য হাতটা গাঁথবে কেমন করে! কিন্তু আর কতক্ষণই বা অপেক্ষা করা যায়! যে-কোনো মুহূর্তে ক্লারা চলে আসবে। ক্যানটা খুলে ঘরের চারদিকে পেট্রল ছিটাল জ্যাক। যোশুয়ার গায়ে ঢেলে দিল অবশিষ্টটুকু। ছেলেটির সারা গায়ে হাত বোলাল সে। ইশ্! কী নরম! রীতিমতো লোভ হচ্ছে। যদি আর একটু সময় পাওয়া যেত...কিন্তু না, ক্লারা এসে পড়বে এক্ষুনি। টেবিলের ওপর যত্ন করে সাজিয়ে রাখল অব্যহৃত গজালগুলো, হাতুড়ি আর খালি ক্যানটা। এলোমেলো কাজ একেবারেই পছন্দ নয় জ্যাকের। সবাই যদি ওর মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দাম দিত!

সকাল সাতটা পঞ্চাশ মিনিট।

সাত নম্বর বাংলোর সামনে প্রচণ্ড শব্দে স্কিড করে থামল কালো একটা লিমুজিন। ড্রাইভিং সিটে বসে আছে নিক ভিটো। ডানদিকের দরজা দিয়ে ছিটকে বের হল

মোরেট্টি। তাকে দেখে সেডান থেকে লাফিয়ে নামল সালভাতর আর কোলেল্লা। কোলেল্লা আঙুল উঁচিয়ে দেখাল বাংলোটা, 'ওখানেই আছে ব্যাটা!'

'বাচ্চাটা কেমন আছে?' উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে মোরেট্টি।

'একবারও দেখিনি বাচ্চাটাকে। জানালায় ভারী পর্দা ফেলা।'

সালভাতর এগিয়ে এল। 'আমরা কি ভেতরে গিয়ে নিয়ে আসব বাচ্চাটাকে?'

'না। এখানেই থাকো।'

অবাক হয়ে মোরেট্টির দিকে চেয়ে রইল সালভাতর আর কোলেল্লা। এখন মোরেট্টি হলেন 'কাপু-রেজিম'। তাঁর নির্দেশে সব সোলদাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে যে-কোনো বিপজ্জনক কাজে। অথচ এ-মুহূর্তে তিনি নিজেই চলেছেন অ্যাকশনে! কিছুতেই তা হতে দেয়া যায় না। কারও দেহে প্রাণ থাকতে ক্ষতি হতে দেয়া চলবে না কাপু-রেজিমের।

'বস্, আমি আর সালভাতর...' বাধা দেবার চেষ্টা করল কোলেল্লা। কিন্তু ততক্ষণে দরজার সামনে পৌঁছে গেছে মোরেট্টি। পকেট থেকে পিস্তল বের করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাইলেন্সার লাগাল। দরজায় কান পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করল। তারপর পিছিয়ে এল দু'পা। প্রচণ্ড লাথি পড়ল কাঠের দরজায়। মোরেট্টির লাথি সহ্য করার মতো শক্ত করে তৈরি হয়নি দরজাটা, দড়াম করে খুলে গেল। একইসঙ্গে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল মোরেট্টি।

এক সেকেন্ডে ঘরের সবকিছু দেখে নিল সে। যোশুয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, রক্তাক্ত একটা হাতের তালুতে গজাল পোঁতা। ওর পাশে বসে বিস্মিত চোখে মোরেট্টির দিকে চেয়ে আছে জ্যাক। চারপাশে পেট্রলের গন্ধ।

জীবনের শেষ ক'টা কথা আওড়াল জ্যাক, 'তুমি তো ক্লারা নও...' তার দু-চোখের মাঝখানে তৃতীয় একটা চোখের জন্ম দিল মোরেট্টির পিস্তল। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল কণ্ঠায়। তৃতীয় গুলিটা ফুটো করে দিল হৃদপিণ্ড। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল লাশটা। মারা গেছে আগেই।

মোরেট্টি বাইরে এসে হাত নেড়ে ডাকল সালভাতর আর কোলেল্লাকে। ওরা এগিয়ে এলে নির্দেশ দিল, 'ডাক্তার পেট্রনকে তৈরি থাকতে বলো। একজন রোগী নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি।'

সকাল সাড়ে ন'টা।

ফোন বাজতে না বাজতে ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিল জেনিফার।

'হ্যালো!'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই যোশুয়াকে আপনার কাছে নিয়ে আসছি,' আশীর্বাদের মতো ভেসে এল মোরেট্টির গলা।

*

জেনিফারের কোলের মধ্যে ধীরে ধীরে নড়ে উঠল যোশুয়া। জ্ঞান ফিরে আসছে বাঁ হাতের তালু আর দু-কবজিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, ভেজা কাপড়ে মোড়া অজ্ঞান যোশুয়াকে দেখে পাগলের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জেনিফার। ডাক্তার সঙ্গেই ছিলেন। আধঘণ্টা পর তিনি ওকে বোঝাতে পেরেছেন যোশুয়ার তেমন কিছু হয়নি। জ্ঞান ফিরে পেলে চিন্তার কিছু নেই।

'হাতের ক্ষতটা সেরে উঠবে। একটা দাগ ছাড়া আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। সৌভাগ্যের কথা, কোনো নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চিন্তা করবেন না। আগামী দু'হপ্তা ওর ওপর নজর রাখব আমি। যদিও তার দরকার নেই জানি,' লম্বা লেকচার ঝাড়লেন ডাক্তার।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল যোশুয়া। মায়ের দিকে চেয়ে ম্লান হাসল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে। লোকটাকে টাকা দিয়ে দিয়েছ?'

মাথা নাড়ল জেনিফার। কেঁদে ফেলার ভয়ে কথা বলল না।

হাসল যোশুয়া, 'আমার মনে হয় ঐ টাকা দিয়ে লোকটা এত্তো এত্তো ক্যাণ্ডি আর চকোলেট কিনবে। তারপর হাপুসহুপুস করে খেয়ে পেটে ব্যথা বাধালে আমি খুব খুশি হব। আমাকে শুধু শুধু ব্যথা দিয়েছে লোকটা', যোশুয়া নালিশ জানাল মা'কে।

দু-মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আরও ঘণ্টাখানেক পর যোশুয়ার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে লিভিংরুমে এল জেনিফার। আশ্চর্য হয়ে দেখল, মোরেট্টি তখনও বসে আছে একটা সোফায়। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

'মি. মোরেট্টি...কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না...' দু হাতে মুখ ঢাকল জেনিফার। কী-ই বা বলতে পারে সে!

'যদি আমাকে শুধু অ্যান্টোনিও বলে ডাকো, তবে খুব খুশি হব, জেনিফার।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল জেনিফার। অনেকক্ষণ পর হাসল। 'ঠিক আছে সে-কথাই রইল। কিন্তু জ্যাকসন...'

'সে আর কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করবে না,' আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল মোরেট্টির চোখে।

পরদিন সব পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হল ব্রুকসাইড মোটেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবরটা। সাত নম্বর বাংলোটা একেবারে পুড়ে গেছে। অপরিচিত এক ব্যক্তির পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়েছে আগুন নেবাবার পর। এমনভাবে পুড়েছে লাশটা যে চেনার উপায় নেই। সন্দেহ করা হচ্ছে, সিগারেট খেতে গিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে বেচারা।

আঠারো

ভোরে ঘুম ভাঙার পর যোশুয়া দেখল, মা ওর নাশতা নিয়ে বসে আছে। উৎসুক চোখ বুলিয়ে নিল প্লেটে। হট ডগ, পিনাট বাটার স্যান্ডউইচ, দু-রকম মিষ্টি, এমনকি কফি পর্যন্ত ! যা যা ও ভালোবাসে, সব। চট করে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে প্লেট টেনে নিল।

'এাম্মি, তুমি যদি লোকটাকে দেখতে!' মুখভর্তি খাবার নিয়ে বহুকষ্টে কথা বলছে যোশুয়া। 'আচ্ছা, ও আমাকে যিশুখ্রিস্ট ভাবল কেন?'

শঙ্কার ছায়া নেমে এল জেনিফারের চোখেমুখে, 'লক্ষ্মীসোনা, ওসব কথা আর মনে কোরো না!'

খাওয়া থামিয়ে হাতের ব্যান্ডেজগুলো দেখতে লাগল যোশুয়া, 'মানুষ কেন মানুষকে মারতে চায়, মাম্মি?'

উত্তর দিতে পারল না জেনিফার। নিজের কথা মন পড়ল। যোশুয়া যদি কোনোদিন জানতে পারে, ও-ই জ্যাককে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিল! মোরেট্টির কথা মনে হল। এই লোকটাকে খারাপ বলার কোনো কারণ সত্যিই কি আছে? সারাজীবন চেষ্টা করলেও তার ঋণ শুধতে পারবে না ও।

চমক ভাঙল যোশুয়ার প্রশ্নে, 'মাম্মি, আজ কি স্কুলে যেতে হবে?'

'না, না, বাবা! গিয়ে কাজ নেই! পুরো হপ্তা আমরা বাড়িতে বসে বসে মজা করব। আমিও অফিসে যাব না। আমরা দাবা খেলব, লুকোচুরি খেলব..'

মোরেট্টি। 'যোশুয়া কেমন আছে, জেনিফার?'

'ভালো।'

'আর তুমি?'

কতদিন কেউ এমন করে ওর কুশল জানতে চায়নি! ভালো লাগল জেনিফারের। 'আমি...আমি ভালোই আছি।'

হাসল মোরেট্টি। 'আগামীকাল আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে তুমি। মালবেরি স্ট্রিটের ডোনাটোতে। সাড়ে বারোটায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'ঠিক আছে। আমি যাব,' আপত্তি করার কথা মনেই এল না জেনিফারের।

ডোনাটোর ম্যানেজার ওদের জন্যে সেরা টেবিলটা রিজার্ভ করে রেখেছিল। আজও

অসংখ্য লোক মোরেন্তিকে দেখে এগিয়ে এসে কথা বলে গেল। তাদের আচরণে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ছাপ সুস্পষ্ট। কোথায় যেন মোরেন্তির সঙ্গে মিল রয়েছে ওয়ার্নারের! জনপ্রিয়তা, ক্ষমতা আর ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দু-জনের তুলনা করা যায়। কিন্তু একজন আইনের লোক, অন্যজন অন্ধকারের। কিন্তু অবাক ব্যাপার, একধরনের আকর্ষণ বোধ করছে ও মোরেন্তির প্রতি। হয়তো অ্যাডামের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বলেই।

চমৎকার কথা বলে মোরেন্তি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো জেনিফার শুনল তাদের পারিবারিক ইতিহাস।

'টাকাটাই আমার ধ্যানজ্ঞান,' আত্মতৃপ্তি ফুটে উঠল মোরেন্তির চোখে। 'আমি টাকা ভালোবাসি। ক্ষমতা ভালোবাসি। আমার রাজ্যে আমিই রাজা।'

আহত হল জেনিফার। 'টাকাই কি জীবনের সবকিছু? আমি তা মানি না।'

'তুমি এ-কথা বলতে পারো, জেনিফার। জীবনে কখনও কষ্ট করতে হয়নি তোমাকে। কিন্তু আমি জানি দারিদ্র্য কী ভয়াবহ জিনিস! আমি এক মুচির ছেলে। পড়ার খরচ চালাবার জন্যে কী-না করতে হয়েছে আমাকে!' চোখমুখ লাল হয়ে উঠল মোরেন্তির। 'বড়লোকদের ফাইফরমাশ খেটেছি, ড্রাগস্ বিক্রি করেছি, এমনকি বেশ্যার দালালিও করেছি! একদিনের ঘটনা শুনবে? মেক্সিকোয় গিয়েছিলাম ধান্দাবাজিতে। এক মেয়ে পার্টিতে ইনভাইট করল। বন্ধুর শার্ট ধার করে হাজির হলাম। খাওয়াদাওয়ার পর একটা কেক কাটা হল। বলা হল, কেকের ভেতরে রয়েছে ছোট্ট একটা মাটির পুতুল। যার ভাগে পুতুলটা পড়বে, তাকে পুরো খাওয়াদাওয়ার খরচ দিতে হবে–পুরোনো মেক্সিকান প্রথা। জেনিফার, আমি পুতুলটা পেয়েছিলাম,' জেনিফারের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মোরেন্তি। 'পুতুলটা গিলে ফেলেছিলাম আমি।'

আশ্চর্য মায়া অনুভব করল জেনিফার। দুচোখ ভরে উঠল জলে। মোরেন্তির একটা হাত ধরল সে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ওরা। খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে আগেই।

'জেনিফার, আমাকে ক্ষমা করো। এসব কথা তোমাকে বলা উচিত হয়নি আমার।'

'না, না, তা কেন? বন্ধু ভেবেই তো বলেছ।'

'শুধুই কি বন্ধুত্ব?' মোরেন্তির গভীর কালো দুচোখে ফুটে উঠল আকুতি। 'এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না?' তার সুন্দর চেহারার অনেক প্রত্যাশা।

কেঁপে উঠল জেনিফার। আবার! না, না, কিছুতেই না। মোরেন্তিকে ইতিমধ্যেই ভালো লাগতে শুরু করেছে ওর। কিন্তু তাই বলে...না না!

'আন্টোনিও, বুঝতে চেষ্টা করো। আমরা দুজন শুধু বন্ধুই হতে পারি,' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল জেনিফার। 'আমি চাই না এই বন্ধুত্ব নষ্ট হোক। দ্বিতীয়বার একই ভুল

করতে চাই না আমি,' মুখ নিচু করে কেঁদে ফেলল জেনিফার।

ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা নাড়ল মোরেট্টি। চুপ করে রইল বহুক্ষণ। হঠাৎ মুখ তুলে চাইল। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি? যোশুয়ার বাবা কে?'

চমকে উঠল জেনিফার। 'নামটা না-ই বা জানলে। ভিয়েতনামে মারা গেছে সে,' অনেক কষ্টে গলার স্বর স্বাভাবিক রাখল ও।

'ঠিক আছে। আর কখনও তার কথা জানতে চাইব না। তবে বলতে দ্বিধা নেই, তাকে আমি হিংসে করি,' বিষণ্ণ হাসল মোরেট্টি। 'যখন যা চেয়েছি, ছিনিয়ে নিয়েছি আমি। কিন্তু তোমাকে আমি সেভাবে চাইব না। কারণ তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

ওর চোখের দিকে চেয়ে জেনিফার বুঝল, একটুও বাড়িয়ে বলছে না মোরেট্টি। প্রতি সপ্তাহেই দেখা হতে লাগল ওদের। তবে সেদিনের পর আর কখনও আগের প্রসঙ্গ টেনে আনেনি মোরেট্টি। সহজ-সরল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। মোরেট্টির সাহচর্য পছন্দ করে জেনিফার। আগের মতো নিজেকে আর নিঃসঙ্গ মনে হয় না।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল।

সেদিনও ওরা বসে ছিল একটা রেস্তোরাঁয়। লাঞ্চের শেষে কাস্টার্ডটা আয়েশ করে খাচ্ছিল জেনিফার।

চামচটা প্লেটে নামিয়ে রেখে মোরেট্টি ওর দিকে চাইল, 'ওহ্ হো! তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। তোমার জন্যে একটা কেস আছে।'

চমকে উঠল জেনিফার। মনে হল, কেউ চড় মেরেছে ওর গালে। 'কী ধরনের কেস অ্যান্টোনিও?'

'এই আমারই এক লোক। ভাসকো গামবুট্টি। এক পুলিশ অফিসারকে গুলি করে মেরে এখন হাজতে আছে। আমি চাই তুমি ওকে ছাড়িয়ে আনো।' চামচ দিয়ে প্লেটের ওপর ঠুনঠুন শব্দ তুলল সে।

রাগে গা জ্বলে উঠল জেনিফারের। তাহলে এই ব্যাপার! নিজের স্বার্থে ওকে ব্যবহার করতে চায় মোরেট্টি! অথচ বন্ধু হিসেবেই ওকে নিয়েছিল জেনিফার।

'আমি দুঃখিত, অ্যান্টোনিও। আগেই তোমাকে বলেছি, ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

মৃদু হাসল মোরেট্টি। 'তুমি আফ্রিকার জঙ্গলের সেই সিংহের বাচ্চার গল্পটা শোনোনি? প্রথমবারের মতো মাকে ছাড়া নদীতে পানি খেতে গিয়ে বাচ্চাটা বিপদে পড়ে গেল। প্রথমে এক গরিলার থাবড়া খেল, সামলে নিতে না নিতে একটা চিতাবাঘ তাকে তাড়া করল। দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ল হাতির পালের মধ্যে। অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় ফিরল। মায়ের কোলে লুকিয়ে পড়ে বলল, 'মা, তুমি কি জানো, বাইরে বিরাট এক জঙ্গল!''

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। বাইরের জঙ্গলের কথা ভাবছে জেনিফার। চেষ্টা করলেও কি ও পারবে জঙ্গলের বাইরে থাকতে?

'ঠিক আছে, অ্যান্টোনিও। কাজটা আমি করব।'

যোশুয়ার চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পরদিন অফিসে এসে কেন বেইলিকে ডেকে পাঠাল জেনিফার। 'আমরা ভাসকো গামবুট্টির কেসটা নিচ্ছি।'

'বলেন কী? সে তো মাফিয়ার লোক!' নগ্ন বিস্ময় কেনের দুচোখে।

'যা-ই হোক, এখন আমাদের মক্কেল সে,' কঠিন গলায় জেনিফার থামিয়ে দিল ওকে।

'কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু নয়। সুবিচার পাবার অধিকার সব মানুষরই রয়েছে।'

'আমাদের ফার্মের গুডউইল...'

'কেন, তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে ফার্মটা আমার।'

আহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কেন বেইলি।

কষ্ট হল জেনিফারের। এতটা রূঢ় না হলেও পারত সে।

দশদিন ধরে শুনানি চলল। ইতিমধ্যে সমস্ত দ্বিধা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে জেনিফার। বিশেষ করে যখন জানল ডি সিলভার বিরুদ্ধে লড়তে হবে ওকে, মনপ্রাণ ঢেলে কাজে লেগে পড়ল সে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কাভার করার জন্যে হামলে পড়েছে টিভি আর পত্রিকার লোকজন।

শেষদিন হতেই টেক্কা দেখাল জেনিফার। আশ্চর্য কৌশলে ও প্রমাণ করে দিল, নিহত পুলিশ অফিসার স্কট নরম্যানের মতো বাজে একজন লোক পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ায় দুঃখ করার কিছু নেই। দু-হপ্তা খেটে হ্যারিস সমস্ত তথ্য জোগাড় করেছে। বিশ বছরের চাকুরিজীবনে শেরম্যান তিনবার সাসপেন্ডেড হয়েছিল অকারণ ভায়োলেন্সের কারণে। জেরা করতে গিয়ে সে একবার এক লোককে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। মাতাল এক লোক তার প্রচণ্ড মার খেয়ে এক মাস হাসপাতালে ছিল। আর একবার এক লোকের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছিল তাকে।

এগুলো গত বিশ বছরের ইতিহাস। কিন্তু জেনিফার যখন আবেগময় গলায় পর পর ঘটনাগুলো উল্লেখ করল, মনে হল যেন প্রতিদিনই এসব কাজ করে বেড়াত পুলিশ অফিসার নরম্যান। উপস্থিত সবার চোখে ভাসকো আর নরম্যানের মধ্যে কোনো তফাৎ রইল না।

ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে বেঁচে গেল ভাসকো গামবুট্টি।

উনিশ

মাস দুয়েক পর মোরেত্তি জেনিফারকে নিমন্ত্রণ করল নিউ জার্সির খামারবাড়িতে। জেনিফারের মনে হল, এখানে আসার আগে পর্যন্ত এদের বৈভব আর ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ওর ছিল না।

গ্রানেল্লির সঙ্গে সেদিনই প্রথম পরিচয় হল। তাঁকে দেখে দুঃখই হল জেনিফারের। কঙ্কালসার শীর্ণ শরীরে কোনোমতে বসে আছেন হুইলচেয়ারে। কে বলবে মাত্র কিছুদিন আগেও সিংহের মতো তেজি ছিলেন তিনি!

ইটালিয়ান পোশাক পরা কালো চুলের সুন্দরী একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল। মোরেত্তি পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হল রোসা। আমার স্ত্রী।'

চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, মেয়েটি বুদ্ধিমতী। পাকা টসটসে আপেলের মতো গালে টোল ফেলে সে বলল, 'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে সত্যিই খুশি হলাম। অ্যান্টোনিও সবসময় আপনার প্রশংসা করে। আপনি নাকি সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী!'

পাশ থেকে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন গ্রানেল্লি, 'আমরা ইটালিয়ানরা মনে করি, মেয়েদের এত বুদ্ধি থাকা ভালো নয়। বুদ্ধির কাজ করবে ছেলেরা।'

রোসা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কিন্তু মোরেত্তি একটুও দেরি না করে উত্তর দিল, 'মিস জেনিফার পার্কার একজন পুরুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নন।'

আদ্যিকালের বিরাট এক কারুকার্যখচিত ডাইনিং টেবিলে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

'তুমি আমার পাশে বসবে,' গ্রানেল্লি জেনিফারকে আদেশ করলেন।

মোরেত্তি বসল রোসার পাশে। কনসিলিয়ারি কোলফ্যাক্স তেতো ওষুধ খাওয়া চেহারা বানিয়ে বসলেন জেনিফারের উল্টোদিকে।

অপূর্ব ডিনার প্রথমে সার্ভ করা হল 'অ্যান্টিপাস্তো,' চমৎকারভাবে রান্না করা। এরপর এল 'পাস্তা ফাজিওলি'। যে-স্যালাডটা পরিবেশন করা হল, তাতে আছে সিমের বিচি, সেদ্ধ ব্যাঙের ছাতা, সেদ্ধ মুরগির মাংস। এছাড়াও ভিল কাটলেট আর 'পিৎসা' এল উপরি পাওনার মতো। হাঁপিয়ে উঠল জেনিফার, মানুষ এত খেতে পারে!

তবে অবাক ব্যাপার, বাড়িভর্তি অনেক কাজের লোক, কিন্তু কেউ একটা কাজও করছে না। রোসা একাই বারবার উঠে গিয়ে খাবার নিয়ে আসছে, তুলে নিয়ে যাচ্ছে নোংরা থালাবাসন। নিশ্চয়ই এটাও ইটালিয়ান প্রথা।

'আমার রোসা চমৎকার রাঁধে,' জেনিফারের দিকে চেয়ে মেয়ের প্রশংসা করলেন গ্রানেল্লি। 'প্রায় ওর মা-র মতোই হয় ওর রান্নাটা, তাই না অ্যান্টোনিও?'

'হুঁ!' খাওয়ায় ব্যস্ত মোরেত্তি।

'স্ত্রী হিসেবেও রোসা চমৎকার,' জেনিফার ঠিক বুঝতে পারল না, বুড়ো ওকে সাবধান করার চেষ্টা করছে কিনা।

'এ কী মিস পার্কার, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না!' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করল মোরেত্তি। জেনিফার লক্ষ করল, মোরেত্তি ওকে 'মিস পার্কার' বলে সম্বোধন করছে।

'সারাজীবনেও একসাথে এত খাবার আমি খাইনি!' আপত্তি জানাল জেনিফার।

কিন্তু সবিস্ময়ে দেখল, এখানেই শেষ নয়। রান্নাঘর থেকে একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছে রোসা। ওপরে সাজানো আছে বিরাট এক বাটিভর্তি তাজা ফলের টুকরো, সাথে পনিরের কুচি। অন্য একটা প্লেটে আইসক্রিম, ফাজ সস্ ছড়ানো তার ওপর। একটা কাঠের বাটিতে প্রচুর চকোলেট ক্যান্ডি।

অবাক হল জেনিফার। এত খেয়েও মোরেত্তি কীভাবে নিজের শরীর ঠিক রেখেছে! রোসা অবশ্য একটু মোটা, কিন্তু ইটালিয়ান মেয়েরা বিয়ের পর পর এর দ্বিগুণ মোটা হয়ে যায়।

খুক্ খুক্ করে কাশলেন গ্রানেল্লি। 'আচ্ছা, তুমি কি "ইউনিয়ন সিসিলিয়ানা" সম্বন্ধে কিছু জান?'

'না তো!' ঘাড় নাড়ল জেনিফার।

'তাহলে বলি শোনো। সিসিলিতে এ সংগঠনটা তৈরি করা হয় গরিব লোকদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। আইনের পথে যেসব গরিব লোক সুবিচার পেত না, এই সংগঠন তার বিচারের ভার নিত। বিপদে পড়লে সবাই ছুটে আসত সংগঠনের কাছে সুবিচারের আশায়। ধীরে ধীরে এই সংগঠন কোর্টের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আমরা বাইবেলের সেই কথাটা বিশ্বাস করি—"বিশ্বাসঘাতককে ছেড়ে দিতে নেই"।'

বুড়ো এবার যে-ইঙ্গিতটা দিল, তা বুঝতে কষ্ট হল না জেনিফারের।

একের-পর-এক মোরেত্তির অনুরোধ রক্ষা করতে লাগল জেনিফার। এছাড়া অন্য কিছু করার ছিল না ওর! নিজেকে বোঝাল মাফিয়াদেরও সুবিচার পাবার, আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা এল অন্যদিক থেকে।

আইনজীবীরা এড়িয়ে চলতে শুরু করল ওকে। প্রায় একঘরে হবার মতো

অবস্থা। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে আগের মতো ওকে আর ডাকা হয় না। পরামর্শ চাইতে আসে না অন্য ল'ইয়াররা।

তবে ব্যবসার কোনো ক্ষতি হল না ওর। দশটা কেসে ও যা আয় করে, মাফিয়ার একটা কেসে ঐ একই পয়সা পায় সে। বরং আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেল ওর উপার্জন।

মোরেট্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর জেনিফার বুঝল, সবার জীবনেই একজন বন্ধুর প্রয়োজন রয়েছে। চমৎকার সমঝোতা হয়েছে দুজনের মাঝে। অদ্ভুত মানুষ মোরেট্টি। জেনিফার এখন বুঝতে পারে, ওর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার পেছনে রয়েছে চুম্বকের মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কেউ মোরেট্টির সাহায্য চেয়ে পায়নি এমন উদাহরণ খুব কমই আছে। এই নিউইয়র্ক সিটির হাজার হাজার মানুষ ওর এককথায় প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

তাই বলে ভালোমানুষ নয় মোরেট্টি। হেন দুষ্কর্ম নেই যা ও করেনি। রোসাকে বিয়ে করেছিল ক্ষমতার লোভেই। কখনও ভালোবাসেনি তাকে। রোসা তার স্বামীকে মনে করে দেবতা। সেবাদাসীর মতো সারাক্ষণ তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে সে। ফলে কখনও স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে মনে করতে পারেনি মোরেট্টি।

জেনিফারের ব্যক্তিত্ব ওকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। আচরণে, বুদ্ধিতে দৃঢ়তায় জেনিফারকে মনে হয় অতুলনীয়। এই প্রথম একজন নারীর দেখা পেয়েছে, যাকে নিজের সঙ্গে তুলনা করতে পারে সে। যে-কোনো সমস্যা নিয়ে বন্ধুর মতোই তার সঙ্গে আলোচনা করা যায়, পরামর্শ চাওয়া যায়।

জেনিফারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর শহরের অ্যাপার্টমেন্টে রাখা রক্ষিতার কাছে আর কখনও যায়নি মোরেট্টি।

বিশ

যোশুয়া এ-বছর ছ'য়ে পা দিল। কাছেই এক প্রাইভেট স্কুলে ওকে ট্র্যান্সফার করে নিয়ে এল জেনিফার, যাতে নিজে নিজেই যাওয়া-আসা করতে পারে। পড়াশোনায় বেশ ভালো যোশুয়া। প্রথম দু-তিনজনের মধ্যেই থাকে সবসময়। ওকে নিয়ে সবসময় গর্ব করে জেনিফার।

সেদিন একটু দেরি করে বাড়ি ফিরল জেনিফার। মিসেস ম্যাকি দুদিনের ছুটি নিয়ে বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। সদর দরজা লক করা দেখে একটু চিন্তিত হল জেনিফার। ব্যাপার কী! যোশুয়া এখনও বাড়ি ফেরেনি। স্কুল ছুটি হয়েছে অনেক আগে। তাছাড়া না বলে কোথাও যায় না তো যোশুয়া!

আশেপাশেই কোথাও আছে তার ছেলে, নিজেকে বোঝাল জেনিফার। ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে নিল। তারপর এল রান্নাঘরে। রাতের খাবার তৈরি করতে হবে।

ফ্রিজ খুলে দুধের বোতল নিতে যেতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল জেনিফারের। দুটো বোতলের মাঝখানে দুভাঁজ করা একটা স্লিপ আটকে আছে। কাঁপা হাতে ভাঁজ খুলে পড়ল জেনিফার। যোশুয়ার লেখা 'কেমন অবাক করে দিলাম! আমি টেডির বাসায় যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যা হবে।'

জেনিফার বাসায় না থাকলে অ্যাডাম ঠিক এভাবেই ফ্রিজে দুধের বোতলের মাঝখানে ম্যাসেজ রেখে যেত।

রান্না করার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলল জেনিফার। টলতে টলতে লিভিংরুমে এসে সোফায় বসে পড়ল। যোশুয়াকে যতই নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চাচ্ছে ও, ততই যেন অ্যাডামের সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে ওর মধ্যে। কিন্তু তাই বলে এমন আশ্চর্য মিল!

স্থির হতে চেষ্টা করল জেনিফার। ম্যাগাজিন র‍্যাকে রাখা টাইমসটা তুলে নিল, সময়ের অভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি। সাথে সাথে আবার চমকে উঠল! প্রথম পৃষ্ঠাতেই তিন কলাম জুড়ে হাসছে অ্যাডাম ওয়ার্নার! প্রায়ই ওর ছবি ছাপা হয়, এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়।

মনটা শান্ত করার জন্যে পড়তে চেষ্টা করল ছবির নিচের খবরের হেডিংটা

'এতদিন পরে সিনেট যোগ্য একজন অভিভাবক পেয়েছে!'

আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের নতুন উদ্ভাবিত এক্স কে-১ বোমারু বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে তৈরি করা হবে কিনা, এ নিয়ে বেশ ক'দিন ধরে সিনেটে বিতর্ক চলছিল। কারণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই প্রজেক্ট ডিফেন্স বাজেটের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

এনকোয়্যারি কমিটির হেড অ্যাডাম ওয়ার্নার এক রবিবার সকালে সরেজমিনে তদন্ত করলেন। প্রোটোটাইপের একটা টেস্ট-ফ্লাইটে অংশগ্রহণ করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে রায় দিলেন এ ধরনের বম্বার থাকলে আমেরিকার ডিফেন্স বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

লবিইস্টদের কথা কানে না তুলে কোনো সিনেটর যে এভাবে সরেজমিনে তদন্ত করেন, এ অভিজ্ঞতা দেশবাসীর নতুন। পত্রপত্রিকাগুলো ওয়ার্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা হল দেশের আগামী প্রেসিডেন্ট হবে অ্যাডাম ওয়ার্নার।

ইদানীং মেক্সিকো সীমান্তে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান অসম্ভব বেড়ে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনো চক্র রয়েছে এর পেছনে। উঠেপড়ে লাগল ওয়ার্নার। মেক্সিকো সরকারের সাহায্য নিয়ে তিন মাসের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে দিল এই অপরাধ-চক্র।

নিউ জার্সির খামারবাড়ির স্টাডিরুমে মিটিং বসেছে। জেনিফার আর মোরেত্তি ছাড়াও রয়েছে গ্রানেল্লি আর কোলফ্যাক্স। ক'দিন আগেই একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে গ্রানেল্লির। বাঁ দিক অবশ হয়ে গেছে প্রায়। কথা বললে বোঝা যায় না। অনমনীয় মনোবল বুড়োর। এখনও হুইলচেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ান। তবে মোরেত্তির ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, আজকাল আর ব্যবসার কিছুই দেখেন না তিনি।

কোলফ্যাক্সের সঙ্গে মোরেত্তির সম্পর্ক আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের কথা জানতে বাকি নেই কারও। কোলফ্যাক্স জানেন, মোরেত্তি তার জায়গায় বসাতে চায় জেনিফারকে। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, জেনিফার অসাধারণ ল'ইয়ার। কিন্তু কীভাবে মোরেত্তি একটা মেয়েকে এ দায়িত্ব দিতে চায়! মেয়েটা তিরিশ বছর পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। তার ওপর ভিনদেশী! হোক না তার জন্ম এখানে! কতটুকু জানে সে ইটালিয়ানদের ঐতিহ্যবাহী 'বোরগাটা' প্রথা সম্বন্ধে? কিংবা মাফিয়া-পরিবার সম্পর্কেই বা কী জানে পুঁচকে মেয়েটা? কোলফ্যাক্স ক্যাপেরোজিমি আর সোলদাতিদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে, কেউ জেনিফারকে

পছন্দ করে না। কিন্তু মোরেত্তির বিরুদ্ধে যাবার মতো বুকের পাটা কারও নেই। যতক্ষণ মোরেত্তি এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করছে, ওদেরকেও তা-ই করতে হবে।

চিন্তিত মুখে মোরেত্তি বলল, 'আমরা বড় ধরনের একটা সমস্যায় পড়েছি,' জেনিফারের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কি সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার সম্পর্কে কিছু জানো?'

একটা হার্টবিট মিস্ করল জেনিফার। হঠাৎ...কী মনে করে মোরেত্তি ওকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল! দিশেহারা হয়ে গেল জেনিফার। মোরেত্তি কি কিছু শুনেছে! হঠাৎ লক্ষ করল সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে আছে মোরেত্তি উত্তরের আশায়, স্বাভাবিক দৃষ্টি।

'মানে...ঐ সিনেটর?'

'ঐ নামে তো একজন সিনেটরই আছে বলে জানি,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল মোরেত্তি। 'শুয়োরের বাচ্চাটাকে এবার একটু টাইট দিতে হবে।'

মুক্ত থেকে রক্ত সরে গেল জেনিফারের। 'কেন?'

'বজ্জাতটা আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ওর চাপেই মেক্সিকান সরকার আমাদের কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। সময় থাকতেই না সরিয়ে দিলে ব্যাটা আরও ঘোলাটে করে তুলবে পরিস্থিতি।'

শান্ত হবার চেষ্টা করল জেনিফার। 'তুমি যদি সিনেটর ওয়ার্নারের গায়ে হাত দাও,' সতর্কভাবে শব্দ নির্বাচন করে বলল জেনিফার। 'নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনবে।'

'কিন্তু...'

'শোনো, অ্যান্টোনিও, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। আজ ওয়ার্নারকে সরিয়ে দিলে কালই পুরো প্রশাসন তোমার পেছনে লেগে যাবে। এখন একটা ব্যবসা বন্ধ হয়েছে, তখন সবই গুটিয়ে নিতে হবে,' কথা বলতে বলতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল জেনিফার।

'কিন্তু ব্যাটা আমাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে!' রেগে গেছে মোরেত্তি।

সুর পাল্টাল জেনিফার। 'অ্যান্টোনিও, মাথা খাটাও। বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি তো জানো, এ তদন্তগুলোর শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হয়। ক'দিন পরেই সিনেটর অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠবে। তখন আবার বন্ধ কারখানাগুলো চালু হবে। শুধু শুধু ওকে মেরে ফেলে সারাদেশের লোকের শত্রু হতে যেয়ো না। ক'দিন না হয় ধৈর্যই ধরলে!'

'আমি এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারছি না,' খুকখুক কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন বুড়ো কোলফ্যাক্স। 'আমার মতে...'

'কেউ আপনার মত জানতে চায়নি,' রূঢ়স্বরে ধমকে উঠল মোরেত্তি।

লজ্জায় অপমানে থমকে গেলেন কোলফ্যাক্স। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল

তাঁর গালের মাংসপেশি। কিন্তু মোরেট্টি একবারও তাঁর দিকে তাকাল না। বুড়ো সমর্থনের আশায় গ্রানেল্লির দিকে তাকালেন। কিন্তু গ্রানেল্লি ঘুমিয়ে পড়েছেন, আধখোলা মুখের কশ বেয়ে লাল গড়াচ্ছে।

মোরেট্টি জেনিফারের দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে। তোমার কথাই থাকল। সিনেটরকে এবারের মতো মাফ করে দেয়া হল।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জেনিফার।

'ওহ্‌হো! আর একটা ব্যাপার।'

চমকে উঠল জেনিফার। আবার কী! কিন্তু মোরেট্টি কথা বলতে শুরু করায় নিশ্চিন্ত হল সে। ওয়ার্নারের ব্যাপার নয়।

'আমাদের এক বন্ধু, মার্কো লরেনজো, এক্সটরশন এবং ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে,' জাগ থেকে কফি ঢেলে কাপে চুমুক দিল মোরেট্টি।

'তুমি কি চাও তাকে আমি ছাড়িয়ে আনি?' ওকে কিছু না বলতে দেখে প্রশ্ন করল জেনিফার।

'উঁহুঁ। আমি চাই তুমি ওকে জেলে ঢোকাও।'

'মানে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জেনিফার।

কিন্তু মোরেট্টির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। 'অবাক হবার কিছু নেই। আমার কানে এসেছে অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এই ছুতোয় ওকে সিসিলিতে পাঠিয়ে দেবার। যদি সত্যি তাকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়, তবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সে বেঁচে থাকতে পারবে না। দশ-বারোজন লোক সেখানে ওর অপেক্ষায় ছুরি শানাচ্ছে। এ মুহূর্তে দেশে ফেরত যাওয়া মানে মৃত্যু। সিংসিং কারাগারই ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। মেয়াদ শেষ না হতেই ওকে বের করে নিয়ে আসতে পারব আমরা।'

পরদিন সকাল দশটায় সিলভার অফিসে দেখা করল জেনিফার। বুড়োর রাগ পড়েনি এখনও, চোখের বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি দেখলেই বোঝা যায়। লক্ষণ ভালো, খুশি হল জেনিফার।

গোবেচারার মতো বলতে শুরু করল, 'আপনি তো ক'দিন পরেই আদালতে মার্কোর বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন। আমি আপনার জন্যে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'তুমি আনলে, আর আমি শুনলাম, তাই না? কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো,' রাগে লাল হয়ে গেছেন সিলভা।

আরও খুশি হলো জেনিফার মনে মনে। কিন্তু চেহারা করুণ করে বলল, 'দেখুন, মি. সিলভা, আমার মক্কেল মার্কো এদেশের নাগরিক নয়। বেআইনিভাবে এদেশে

বাস করছে। এমুহূর্তে যদি ওকে বহিষ্কার করে সিসিলিতে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা নেয়া যেত, তবে ভালো হত। শেষ জীবনটা বেচারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ে মুক্ত সূর্যের আলোয় কাটাতে পারত।'

রাগে দিশেহারা হয়ে গেলেন হারপার, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ মেয়ে, আমরা একটা গুণ্ডার কথা আলোচনা করছি, যার জীবন কেটেছে খুন-জখম, ধর্ষণ আর ব্ল্যাকমেইল করে। আর তুমি তাকে মুক্ত জলহাওয়া খাওয়াতে চাইছ!'

কাঁদো-কাঁদো হয়ে জেনিফার আবেদন জানাল, 'কিন্তু, মি. সিলভা, মানবতার খাতিরে...'

'তোমার আর কিছু বলার আছে?' পৈশাচিক হাসি সিলভারের ঠোঁটের কোণে।

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল জেনিফার। খুশিতে উদ্বেল। পাঁচ মিনিট পর একটা টেলিফোন বুদে ঢুকে পড়ল। ওদিক থেকে মোরেট্টির গলা ভেসে এলে হৃষ্টচিত্তে ওকে জানাল, 'কোনো চিন্তা কোরো না অ্যান্টোনিও। হারপার যে করেই হোক সিলভাকে সিংসিং-এ পাঠাবে।'

একুশ

নিউ ইয়র্কের পথে প্লেনে বসে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার। গতকালই প্রেসিডেন্সিয়াল নমিনেশন পেয়েছেন তিনি, কিন্তু তারপরেও কেন যেন খুশি হতে পারছেন না। আসলে সবকিছু পাবার পরেও শুধু একটা ব্যর্থতার জন্যে আজ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারেননি তিনি। ভালো করেই জানেন সব পাওয়ার সুখ তাঁর ভাগ্যে নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হল হোটেলে। নিউইয়র্কে এলে কখনোই নিজের বাড়িতে ওঠেন না ওয়ার্নার।

হাত-মুখ ধুয়ে রওনা হলেন রিজেন্সি হোটেলের দিকে। একটা জরুরি পার্টি-মীটিং রয়েছে সেখানে। চাচাশ্বশুর ওয়াল্ডম্যানও থাকবেন।

পৌঁছে দেখলেন, বুরুশের মতো খোঁচা খোঁচা চুলের গাট্টাগোট্টা এক লোককে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষা করছেন ওয়াল্ডম্যান।

'এই যে, অ্যাডাম। ব্লেয়ার রোমান তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। তোমার পাবলিসিটির দিকটা ও-ই দেখাশোনা করবে। দারুণ চালু লোক।'

ওয়ার্নার শুনেছে ওর কথা। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানির মালিক তিনি, চালু হতেই হবে।

দুলতে দুলতে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। 'আপনার সেবা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি হবেন আমার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট।'

'সত্যিই তাই?' লোকটাকে বেশি পছন্দ হল না ওয়ার্নারের। কেমন গায়ে পড়া ভাব!

'তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে ক্যাম্পেইন শুরু করব আমরা। কি বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট?' গা-ঘিনঘিন-করা একটা হাসি উপহার দিল লোকটা।

প্রচণ্ড বিরক্ত হল ওয়ার্নার। 'দেখুন, এধরনের সম্বোধন ইলেকশনের আগে আর কখনও করবেন না, বুঝলেন?'

চুপসে গেলেন মি. রোমান। কিন্তু তাই বলে উৎসাহ হারালেন না। কাজ জানেন তিনি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন ভদ্রলোক। টিভির জন্যে ওয়ার্নারের ছোট ছোট কয়েকটা বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে নিলেন। ঘন ঘন প্রচারিত হতে লাগল সেগুলো।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় প্রচারিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল বেকার সমস্যা এবং খনি এলাকায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ওপর। ডেট্রয়েটে সিনেটর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নগরায়নে ভয়াবহ দিকগুলো উল্লেখ করে। নিউইয়র্ক সিটির জন্যে তাঁর আলোচ্য ছিল ক্রমবর্ধমান অপরাধের হার।

দেশের আনাচেকানাচে চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সিনেটর ওয়ার্নার।

আমেরিকার বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে বার্ষিক কনভেনশনের আমন্ত্রণপত্র পেল জেনিফার। মেক্সিকোর আকাপুলকোতে এক হপ্তার প্রোগ্রাম। একবার ভাবল, যাবে না। ছ'সাতটা মামলা রয়েছে হাতে। হঠাৎ মনে পড়ল যোশুয়ার 'বাৎসরিক ছুটি' শুরু হয়ে যাবে আগামী হপ্তায়। ওকে নিয়ে মেক্সিকো ঘুরে আসার দারুণ একটা সুযোগ এটা। দেশের বাইরে যেতে সাংঘাতিক ভালোবাসে যোশুয়া। অবশ্য সেটা খুব বেশি হয়ে ওঠে না জেনিফারের ব্যস্ততা আর যোশুয়ার পড়াশোনার চাপে।

সিনথিয়াকে বলল ওদের চিঠি লিখে জানাতে, জেনিফার যাবে।

সোমবারে কনভেনশন শুরু হবে। যোশুয়া আর মিসেস ম্যাকিকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার সকালেই একটা ব্র্যানিফ জেটে চড়ে বসল জেনিফার, ঘুরে বেড়াবার জন্যে দুটো দিন হাতে পাওয়া যাবে।

আগে বেশ কয়েকবার জেটে চড়েছে যোশুয়া, কিন্তু তাই বলে আজও কম উত্তেজিত নয় সে। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। ভয়ে চুপসে গেছেন মিসেস ম্যাকি। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন শক্ত হয়ে।

যোশুয়া তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন। প্লেনটা যদি ক্র্যাশ করেও, কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবেন আপনি।'

মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেল মিসেস ম্যাকির।

দুপুর চারটেয় বেনিটো জুয়ারেয এয়ারপোর্টে প্লেনটা নিরাপদেই ল্যান্ড করল। একঘণ্টা পর ওরা পৌঁছে গেল লাস ব্রিসাস হোটেলে। আকাপুলকো থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর অনেকগুলো গোলাপি রঙের ছবির মতো সুন্দর বাংলো নিয়ে তৈরি করা হয়েছে হোটেলটা। অপূর্ব দৃশ্য! প্রতিটি বাংলোর সঙ্গে রয়েছে বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগান। এছাড়াও জেনিফারদের বাংলোর সঙ্গে আছে গরম পানির সুইমিংপুল। যোশুয়া আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

হাত-মুখ ধুতে ধুতে যোশুয়া প্রস্তাব করল, 'মাম্মি, চল না এক্ষুনি শহরে ঘুরতে যাই। ওদের কথাবার্তা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। আমি আগে কখনও এমন শহরে যাইনি যেখানে কেউ ইংরেজি বলে না।'

হাসল জেনিফার, 'ঠিক আছে, বাবা, যাব।'

খাওয়াদাওয়ার পর মা-ছেলে ঘুরতে বের হল। টেক-অ্যাওয়ে রেস্তোরাঁ থেকে আইসক্রিম কিনল যোশুয়া। যাকোলকার তীরে হাঁটল, ফুটপাতের বাজারগুলোতে ঢুঁ মারল। ঘোড়ায় টানা গাড়ি 'ক্যালেনড্রিয়া'য় চড়ে সাগরতীরে বেড়িয়ে এল। কিন্তু যোশুয়ার আশা পূরণ হল না। প্রায় সবাই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছে। বছরের এ সময়টায় আকাপুলকোতে আমেরিকান ট্যুরিস্ট উপচে পড়ে। ফলে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শোনাই যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে যোশুয়ার মজা কম হল না।

ওরা রাতের খাবার খেল আর্মান্ডো'স লা ক্লাবে। চমৎকার ছিল খাবারটা।

'মাম্মি, মেক্সিকান খাবার আমার খুব ভালো লেগেছে,' গম্ভীর স্বরে নিজের মতামত জানিয়ে দিল যোশুয়া।

মুচকি হাসল জেনিফার। 'কিন্তু খুব দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাতে হচ্ছে এটা মেক্সিকান খাবার নয়। এখানকার বিখ্যাত ফরাসি ডিশ।'

তবু দমল না যোশুয়া। 'তাতে কী! মেক্সিকান গন্ধ তো রয়েছে!'

শনিবার সারাটা দিন রঙবেরঙের দোকানগুলো ঘুরে আর রক্ত-হিম-করা একটা সার্কাস-শো দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। রাতের খাবারটা সেরে নেবার জন্যে ছোট অথচ ছিমছাম একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। পেছনের সবুজ বাগানে পেতে দেয়া হয়েছে কয়েকটা টেবিল। ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকোনো শেড থেকে বেরিয়ে আসছে হালকা ম্লান আলো।

খাওয়া শেষে পরিতৃপ্ত যোশুয়া ঢেকুর তুলল।

'মাম্মি, এটাও ফ্রেঞ্চ খাবার নয় তো!'

'না, সোনা। এটা হল সত্যিকারের "গ্রিংগো"।'

'গ্রিংগো! সে আবার কী?'

'তুমি যেমন "অ্যামিগো", খাওয়াটা হল "গ্রিংগো"।'

মেক্সিকান শব্দদুটো মনে মনে আউড়ে নিল যোশুয়া। জীবনেও আর ভুলবে না। চমৎকার স্মরণশক্তি ওর।

ওরা যে হোটেলে উঠেছে সে হোটেলের নিজস্ব একটা বিচ আছে। লা কোঞ্চা। জানালা থেকে দেখা যায়, সোনালি বালিতে মোগা তীরে অবিরাম আছড়ে পড়ছে সাদা ফেনায় সাজানো বড় বড় ঢেউগুলো। রবিবার সকালে মিসেস ম্যাকিকে সঙ্গে নিয়ে ওরা বিচে এল। হোটেল থেকে গোলাপি ছাউনি দেয়া ছোট্ট একটা জিপ দেয়া হয়েছে ওদেরকে বিচে যাতায়াতের জন্যে।

চমৎকার আবহাওয়া। সাগরে অসংখ্য স্পিডবোট আর সেইলবোট ভাসছে, বেড়াবার জন্যে সুন্দর একটা দিন।

গাড়ির পেছন থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলেন মিসেস ম্যাকি আর জেনিফার। বেশ কয়েক রকম খাবারদাবার সঙ্গে এনেছে ওরা। হট ডগ, অ্যাপল্ পাই, ক্লাব স্যান্ডউইচ, আলুর চিপস্ আর কমলার রস। এ-ছাড়াও প্রত্যেকের জন্যে সাঁতারের পোশাক।

পানির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যোশুয়া মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল বোটগুলো। 'আচ্ছা, মাম্মি, তুমি কি জানো, আকাপুলকোতেই ওয়াটার স্কিইং আবিষ্কার হয়েছিল?'

'না তো! আমি কখনও শুনিনি। তা তুমি কেমন করে জানলে?' চোখের কোণ দিয়ে জেনিফার লক্ষ করল, সাগরে বেশ ক'জন স্কিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। স্পিডবোটের পেছন বাঁধা রশি ধরে প্রচণ্ড বেগে স্কি করছে।

'মনে হচ্ছে, যেন কোথায় শুনেছি। হয়তো কোনো ম্যাগাজিনে পড়েছি,' গম্ভীর যোশুয়া।

ওর মতলব আন্দাজ করতে পারল জেনিফার। ঠোঁট টিপে হাসল। 'নাকি এই মুহূর্তে তোমার মাথা থেকে আচমকা বেরিয়ে এল তথ্যটা!'

ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিতভাবে হাসল যোশুয়া। 'তার মানে, তুমি আমাকে স্কি করতে দেবে না!' ছ'বছরের শিশুদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে যোশুয়া।

এই স্পিডবোটগুলো সাংঘাতিক জোরে ছুটছে। তুমি ভয় পাবে না তো?' বলল জেনিফার।

সোজা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে যোশুয়া বলল, 'ঐ লোকটা আমার হাতে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে বলেছিল "যীশুর কাছে পাঠাচ্ছি তোমাকে।" এাম্মি, তখনও আমি একটু ভয় পাইনি।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল জেনিফারের। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল যোশুয়ার সামনে, শক্ত করে ওর দু'কাঁধ আঁকড়ে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল, 'কেন বললে এ-কথা? কেন তোমার এ-সময় এ-কথা মনে পড়ল?'

জেনিফারকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে ভয় পেল যোশুয়া। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'না না, মাম্মি, কিছু ভেবে বলিনি। এমনিতেই মনে পড়ল।'

শান্ত হল জেনিফার। যোশুয়াকে কোলে টেনে নিল। 'আর কক্ষনো এ-সব কথা মনে কোরো না, সোনা!'

ঐ ঘটনার পর কোনোদিন জেনিফারকে যোশুয়া বলেনি ঠিক কি কি করেছিল জ্যাক ওকে নিয়ে। জেনিফারও এড়িয়ে গেছে বরাবর। এতদিন পর আজই প্রথম জেনিফারের সামনে এটুকু বলে ফেলেছে সে।

কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল জেনিফারের।

সারা সকাল সমুদ্রে সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। বিচেই একটা সুন্দর রেস্তে

রাঁ আছে। দুপুরের খাবারটা ওখানেই খাবে বলে ঠিক করল জেনিফার। বালির ওপর গোলাপি-সাদা ডোরাকাটা বড় বড় ছাতা গেঁথে নিচে টেবিল পেতে দেয়া হয়েছে। একপাশে গাছের ছায়ায় বিরাট একটা টেবিলে রাখা আছে রকমারি খাবার। যার যা পছন্দ নিয়ে এসে ছাতার তলায় বসে খাচ্ছে। জেনিফার নিল লবস্টার, কোল্ড বিফ, সেদ্ধ সবজি আর পনির। সঙ্গে প্রচুর স্যালাড। অন্য একটা টেবিলে আছে সুইট ডিশ। কেক, হরেকরকম পাই জেলাটিন, আর প্রচুর ফলমূল। যোশুয়া ঘোষণা দিল, ও আইসক্রিম খাবে।

জেনিফার অবাক হয়ে দেখল অন্য সময় যোশুয়া যা খায়, আজ তার তিনগুণ খেল। মনে মনে খুশি হল ও। ঠিক করল, এখন থেকে সুযোগ পেলেই যোশুয়াকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে। জায়গা পরিবর্তন করলে সত্যিই যোশুয়ার প্রাণচাঞ্চল্য বেড়ে যায়, স্বাস্থ্যও ভালো হয়।

খেয়েদেয়ে মায়ের অনুমতি নিয়ে আবার ছুটল যোশুয়া ওয়াটার স্কিইং দেখতে।

জেনিফার লক্ষ করল মিসেস ম্যাকি খেতেই পারছেন না প্রায়। দু-একটা খাবারের টুকরো ভেঙে মাঝে মাঝে মুখে ফেলছেন।

'কী ব্যাপার, মিসেস ম্যাকি, আপনার শরীরে খারাপ নাকি? এখানে আসার পর থেকে দেখছি কিছুই খেতে চাচ্ছে না।'

'এসব বিদঘুটে বিদেশী রান্না সহ্য হয় না আমার,' নাক কুঁচকে বললেন তিনি।

যোশুয়া দৌড়ে এল। 'মাম্মি, একটা বোট ঠিক করে ফেলেছি। স্কিইং করতে যাই?'

'আধা ঘণ্টা পরে গেলে হত না?'

'কেন, মাম্মি?'

'যে-পরিমাণ খেয়েছ, তাতে তো এমনিতেই পানিতে ডুবে যাবে তুমি,' হাসতে হাসতে বলল জেনিফার।

'আগে দ্যাখোই না!' বলতে বলতে দৌড় দিল যোশুয়া।

সেদিন সারা বিকেল বিচে কাটাল ওরা। তীর থেকে মিসেস ম্যাকি যোশুয়ার স্কিইং দেখল, বোট চালাল জেনিফার। প্রথম পাঁচ মিনিট অসংখ্যবার পানির নিচে ডুবে গেল যোশুয়া। কিন্তু তারপর আর ভুল হল না। চমৎকার স্কিইং করা শিখে গেল। কে বলবে আজই ওর হাতেখড়ি হয়েছে?

রাতে শোবার সময় যোশুয়া বলল, 'মাম্মি, আজকের দিনটা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।'

সোমবার সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠল জেনিফার। রুমেই নাশতা সেরে নিল। সুটকেস থেকে বের করল গাঢ় সবুজ রঙের স্কার্ট এবং বড় বড় লাল গোপাল এমব্রুডারি করা কাঁধ খোলা ব্লাউজ।

পোশাকটা পরে জেনিফার আয়নায় নিজের দিকে তাকাল। সৌন্দর্যে এতটুকুও ভাটা পড়েনি ওর। যোশুয়া প্রায়ই অভিযোগ করে, ওর বন্ধুরা জেনিফারকে ওর বড়বোন বলে ভুল করে। আয়নায় নিজেকে ভেংচি কাটল জেনিফার কবে বুড়ো হবে তুমি?

বেরোবার আগে মিসেস ম্যাকিকে বলে গেল, 'যোশুয়ার দিকে খেয়াল রাখবেন, যেন রোদে বেশিক্ষণ না থাকে।'

পঁয়ত্রিশ একর জমির ওপর বিশাল পাঁচটা বিল্ডিং নিয়ে কনভেনশন সেন্টারটা তৈরি হয়েছে। ফুলের বেডগুলোর মাঝে মাঝে অসংখ্য প্রি-কলাম্বিয়ার মূর্তি।

যে হলঘরটায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে পাঁচশো লোকের বসবাস ব্যবস্থা আছে। রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে সই করে হলঘরে ঢুকল জেনিফার। বেশ বুঝতে পারছে সবাই ফিরে ফিরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

প্রচুর পরিচিত ল'ইয়ারের সাথে দেখা হল। এতদিন যাদের নীরস সাদা কালো সুট পরা অবস্থায় দেখেছে, তারা ফুলপাতা আঁকা হাওয়াই শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসিখুশি উচ্ছল। খুব ভালো লাগল জেনিফারের। মনে হচ্ছে যেন সবাই ছুটি কাটাতে এসেছে। ভাগ্যিস কনভেনশনটা ডেট্রয়েট কিংবা শিকাগোতে হয়নি! দরজার গোড়াতেই ওর হাতে একটা প্রোগ্রাম শিট ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কথা বলতে বলতে ওটা দেখার সময় পায়নি জেনিফার।

মাইকে সবাইকে বসে পড়তে বলা হল, অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়ল জেনিফার। স্টেজে একদল লোক দেখা যাচ্ছে। সেদিকে মনোযোগ দিল ও। সাথে সাথে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল।

বিনীত ভঙ্গিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করছেন সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার!

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল জেনিফারের। চিন্তাও করতে পারেনি নিউইয়র্ক সিটি থেকে এত দূরে এভাবে অ্যাডামের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে! দিশেহারা হয়ে পড়ল জেনিফার। ইচ্ছে হচ্ছে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সব শক্তি যেন লোপ পেয়েছে! কলের পুতুলের মতো বসে রইল ও।

স্বাগতিক ভাষণ শুরু করলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, 'আজকের এই চমৎকার সকালে আমাদের মাঝে সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নারকে পেয়ে আমরা গর্বিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন তিনি। নিউইয়র্ক বার অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের সবার শুভেচ্ছা রইল।'

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে উঠে দাঁড়াল ওয়ার্নার। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করল। 'ধন্যবাদ, মি. সেক্রেটারি, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টল্‌ম্যান।'

ওয়ার্নারের ভারী গলায় স্বরে গমগম করতে লাগল হলরুম। 'এখানে আমরা সবাই আজ মিলিত হয়েছি একটা উদ্দেশ্যে, সেটা হল আমাদের ধ্যানধারণা আর জ্ঞানের পারস্পরিক বিনিময় এবং তার বিশদ পর্যালোচনা,' কথা বলতে বলতে বাঁ হাতটা চুলের ভেতর চালিয়ে দিলেন তিনি। চমকে উঠল জেনিফার। এটা যোশুয়ারও মুদ্রাদোষ! যোশুয়া আর ওয়ার্নার একই শহরে এত কাছাকাছি রয়েছে, কথাটা মনে পড়তেই নতুন করে ভয় পেল জেনিফার।

ওয়ার্নার বলে চলেছে, 'আমাদের পেশা পৃথিবীর পবিত্র পেশাগুলোর একটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই পেশার চরম অবমাননা করছি,' কঠিন স্বরে বলতে থাকল ওয়ার্নার, 'কিছুদিন আগে একটা তদন্ত করার সময় আমার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছে। জঘন্য একদল অপরাধীকে সাহায্য করে যাচ্ছে এ দেশেরে উকিল নামধারী কিছু ব্যক্তি। যার ফলে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এদের টিকিটিও ছুঁতে পারছে না। এই সংঘবদ্ধ অপরাধীদল ভয়ংকর পাইথনের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে আমাদের অর্থনীতিকে, গিলে খেয়েছে কোর্টগুলোকে, হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে।'

জেনিফারের মনে হল, ওকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলো বলছে ওয়ার্নার।

ঘণ্টখানেক পর প্রথম সুযোগই বেরিয়ে এল জেনিফার। এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে হবে। সন্ধের ফ্লাইটেই যোশুয়াকে নিয়ে চলে যাবে নিউইয়র্কে, ওয়ার্নারের নাগালের বাইরে।

কিন্তু দরজার কাছেই বাধা পেল। পরিচিত এক অ্যাসিস্টেন্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। 'কেমন আছেন, মিস পার্কার? কেমন লাগছে মেক্সিকো? খুব ভালো জায়গা, তাই না?'

স্মিত হাসল জেনিফার। 'আমি আগেও একবার এসেছি আকাপুলকোয়। ভালোই লাগছে।'

'তাহলে তো এখানকার নামকরা ডিস্কো ক্লাব নেপান্থার নাম শুনেছেন। ওখানকার ড্যান্সিং ফ্লোরটা নাকি কাচের তৈরি, নিচে আলো জ্বলে। চলুন না, আজ সন্ধ্যায়?' দুচোখে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

প্রমাদ গুনল জেনিফার। শুকনো হেসে বলল, 'শুনে বেশ ভালো লাগল, যেতে ইচ্ছেও করছে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমি সাংঘাতিক ব্যস্ত।'

হতাশ হলেন ভদ্রলোক। ব্যাটাকে কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতে হই হই করে এগিয়ে এলেন জাজবিল ওয়ারেন। দেখতে দেখতে জেনিফারের চারপাশে পরিচিত লোকজনের ছোটখাটো একটা ভিড় তৈরি হয়ে গেল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করতে হল ওকে। বারবার চোরাচোখে হাতঘড়ি

দেখে নিচ্ছে। ইশ্! কখন ও যে ছাড়া পাবে!

কিন্তু ছাড়া পাবার সময় পেল না জেনিফার। সাংবাদিক আর ক্যামেরাম্যানের বিরাট একটা দল পেছনে নিয়ে লবি ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ওয়ার্নারকে। লুকিয়ে পড়তে চাইল জেনিফার, কিন্তু তার আগেই দেখে ফেলেছে ওয়ার্নার।

'জেনিফার!'

ইচ্ছে হল শুনতে না-পাবার ভান করে অন্যদিকে চলে যেতে। কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে সিনেটরকে অপমান করতে খারাপ লাগল ওর। কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'হ্যালো, মি. ওয়ার্নার!'

পেছনের দলটাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওয়ার্নার। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল জেনিফারের কাছে। চারপাশে নজর বুলিয়ে আস্তে করে বলল, 'কাছেই একটা বার আছে, চলো, ওখানে যাই। খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

সবার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে পাংশুমুখে ওয়ার্নারের সঙ্গে বারের দিকে রওনা হল জেনিফার। খুব একটা দূরে নয়, হেঁটেই গেল ওরা। লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে গাড়ি নিল না ওয়ার্নার।

বারে পৌঁছে চেয়ারে বসার আগে আর কোনো কথা হল না ওদের মধ্যে। অস্বস্তি বোধ করছে জেনিফার। আশেপাশের সবাই ফিরে ফিরে ওয়ার্নারকে দেখছে। তবে ওয়ার্নার সেটাকে পাত্তা দিল না। এতবছর পর জেনিফারকে পেয়েছে, সেই খুশিই তার কাছে সবচেয়ে বড়।

'জেনিফার, অনেকবার তোমাকে ফোন করেছি, চিঠি লিখেছি, কিন্তু তুমি উত্তর দাওনি,' ওয়ার্নার একদৃষ্টে চেয়ে আছে জেনিফারের দিকে। জেনিফার কোনো উত্তর দিল না দেখে আবার বলল, 'এমন একটা দিন নেই, যেদিন তোমার কথা মনে পড়ে না আমার। কেন তুমি এমন করেছিলে, জেনিফার?'

ওয়ার্নারের ব্যথাভরা চোখের দিকে চেয়ে বুকটা মুচড়ে উঠল জেনিফারের। নিজেই কি জানে, কেন অমন করেছিল সে!

ওয়েটার এগিয়ে এলে দুটো মার্গারিটাস দিতে বলল ওয়ার্নার। নিষেধ করল না জেনিফার।

একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাগজে তোমার সম্বন্ধে ছাপা সব খবরই আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি, অ্যাডাম। তোমার জন্যে আমার গর্ব হয়।'

'ধন্যবাদ,' অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল ওয়ার্নার জেনিফারের চোখে। 'তোমার সম্বন্ধেও কাগজে অনেক খবর ছাপা হয়।'

একই সুরে টিপ্পনী কাটল জেনিফার, 'কিন্তু তুমি আমার জন্যে গর্ববোধ করতে পার না, তাই না?'

'তা তো বটেই! শুনেছি, বাছাই করা কিছু মক্কেল আছে তোমার!'

রেগে গেল জেনিফার। 'তোমার কাছ থেকে কোনো উপদেশ চাই না আমি।'

আহত হল ওয়ার্নার। 'ভুল বুঝো না, জেনিফার। তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না আমি। কিন্তু তোমার জন্যে চিন্তা হয় আমার। আমার কমিটি অ্যান্টোনিও মোরেত্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাকে মাটিতে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমাদের।'

লাল হয়ে গেল জেনিফারের মুখ। 'এ ব্যাপারে কোনো আলাপ করতে চাই না আমি। সে আমার মক্কেল,' উঠে দাঁড়াল জেনিফার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিল ওয়ার্নার। জোরে চাপ দিল জেনিফারের হাতে। 'আমার কথা একটুও মনে পড়ে না তোমার?'

হাহাকার করে উঠল জেনিফারের সমস্ত অন্তর। তারপরেও ইচ্ছে করেই খোঁচা দিল, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছে, অ্যাডাম?'

চট করে ওর হাত ছেড়ে দিল ওয়ার্নার। 'ভালো।'

'আর তোমার মেয়ে?'

এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওয়ার্নারের চেহারা, 'সেও খুব ভালোই আছে। চটপট বেড়ে উঠেছে। চমৎকার মেয়েটা!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনিফার। ওয়ার্নারের মেয়ে যোশুয়ার সমবয়সী। আচ্ছা, ওদের চেহারায় কি কোনো মিল আছে? ধ্যাৎ! কী আবোল-তাবোল ভাবছে সে!

'বিয়ে করোনি তুমি?' ওয়ার্নারের প্রশ্নে চমক ভাঙল।

'নাহ্, সময় হয়ে ওঠেনি।'

দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল দুজন। ছোট ছোট চুমুকে গ্লাসের তরল পানীয় শেষ করল। ওয়ার্নারই নীরবতা ভাঙল। 'আজ সন্ধের ফ্লাইটে ওয়াশিংটনে ফিরছি আমি। তুমি যদি বলো, প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে কালকের দিনটাও থেকে যেতে পারি।'

'তার কোনো দরকার নেই, অ্যাডাম। আমাদের আর দেখা না-হওয়াই ভালো,' মনটা শক্ত করে নিয়েছে জেনিফার।

'তা হয় না, জেনিফার। এবার আর তোমাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেব না আমি।'

'না না, তা হয় না, অ্যাডাম। তুমি যদি মোরেত্তির পেছনে লেগে থাকো...'

রেগে গেল ওয়ার্নার। 'এর সঙ্গে মোরেত্তির কী সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে একটা দিন একসঙ্গে কাটাতে চাইছি আমি। যদি আপত্তি করো, ভবিষ্যতে আর কখনও বিরক্ত করব না। কিন্তু আজ আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে, জেনিফার,' জেনিফারকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার শুরু করল, 'ইয়াট ক্লাবের ডকে আমার

একটা বোট আছে। নাম "পালোমা ব্লাঙ্কা"। রাত আটটায় তোমাকে বোটে দেখতে চাই।'

'না, অ্যাডাম, তা হয় না। আমি যেতে পারব না।'

'কিন্তু আমি যাব। অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।'

ওদের দুজনের কেউ লক্ষ করল না, একটু দূরে দুটো সুন্দরী মেয়ের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে বসে আছে নিক ভিটো। ব্যবসার কাজে মোরেত্তি ওকে পাঠিয়েছে আকাপুলকোতে। জেনিফারকে দেখে অবাক হয়ে গেল ভিটো।

'অ্যাই, তোমার রুমে নিয়ে যাচ্ছ না কেন আমাদেরকে এখনও?' ভিটোর পিঠে গা ঘষতে ঘষতে ডান দিকের মেয়েটা অধৈর্য হয়ে বলল।

নিক ভিটোর ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে জেনিফার আর তার সঙ্গের অপরিচিত লোকটার সঙ্গে কথা বলে আসে। সেটাই ভদ্রতা। ভালো করেই সে জানে, কোলফ্যাক্সের জায়গায় বসতে যাচ্ছে মেয়েটা। তাকে খুশি রাখা উচিত। কিন্তু মেয়েদুটো একই সঙ্গে ওর দু-পায়ের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর সহ্য করতে পারল না বেচারা। দুই বান্ধবীকে বগলদাবা করে রুমের দিকে এগোল।

বাইশ

চাঁদের আলোয় হাসছে 'পালোমা ব্লাঙ্কা'। রাজহাঁসের মতো সাদা শরীর। মুগ্ধ হয়ে গেল জেনিফার। চারপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে মোটর-সেইলারের দিকে এগোল ও। ওয়ার্নার তাহলে সিক্রেট সার্ভিসের লোকগুলোকে ধোঁকা দিতে পেরেছে। তা না হলে এতক্ষণে লোকজনে ভর্তি হয়ে যেত বোটের আশপাশ।

মিসেস ম্যাকি আর যোশুয়াকে হোটেলে রেখে এসেছে জেনিফার। মনটা খচখচ করছে সেজন্যে। ওদের চোখের সামনে দিয়ে চোরের মতো বেরিয়ে এসেছে, একটা ট্যাক্সিতে চেপে সোজা চলে এসেছে ডকইয়ার্ডে। তবে দুই ব্লক আগেই নেমে পড়েছে, হেঁটে এসেছে বাকি পথটা। বলা যায় না, কে কখন কোথায় দেখে ফেলে!

দুপুরবেলা হোটেলে ফেরার পর থেকেই দোটানায় ভুগছিল জেনিফার। যাবে কি যাবে না। অনেকবার ফোনের রিসিভার তুলে নিয়েছে জেনিফার ওয়ার্নারকে নিষেধ করার জন্যে, কিন্তু ডায়াল ঘোরাতে পারেনি। চিঠি লিখে জানাবার কথাও মনে হয়েছে, কিন্তু সম্বোধনটুকু লিখেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওয়েস্টপেপার বাক্সেটে।

ওয়ার্নার কতবড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ও। এই গোপন অভিসারের কথা ফাঁস হয়ে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে ওয়ার্নারের ক্যারিয়ার। এই সিনিসিজম্-এর যুগে জনগণের আদর্শে পরিণত হয়েছে ওয়ার্নার, তবু কেউ ক্ষমা করবে না তাকে। এতদিন যারা ওর গুণগান গেয়েছে, তারাই ওকে ছুড়ে ফেলবে আঁস্তাকুঁড়ে।

ওয়ার্নার এখনও ওর জন্যে এতটা বিপদ ঘাড়ে নিতে পারে! কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় জেনিফারের অন্তর। আটটা বাজার আধঘণ্টা আগে সিদ্ধান্ত নেয়, ও যাবে।

অন্ধকার গ্যাঙপ্ল্যাঙ্কের ওপর ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ওয়ার্নার। 'ভয় পাচ্ছিলাম, তুমি যদি না আসো!' জেনিফারকে বুকে জড়িয়ে ধরল ওয়ার্নার। যত্ন করে চুমু খেল ওর ঠোঁটে...বহুদিন পর। দু-মিনিট পর মুখটা সরিয়ে নিল জেনিফার। 'বোটের ক্রুরা কোথায়, অ্যাডাম?'

'আজকের জন্যে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। আমার এক বন্ধু বোটটার দেখাশোনা

করে। আকাপুলকোতে এলে মাঝে মাঝে আমি ব্যবহার করি, তবে আজকাল আর সময়ই পাই না। ভালো কথা, তুমি বোট চালাতে পারো, সাহায্য করতে হবে আমাকে।'

'হুঁ। বছর দুয়েক আগে একটা বোট-ক্লাবের মেম্বার হয়েছি,' যোশুয়ার জন্যেই বোট চালাতে শিখেছে জেনিফার। বোটে চড়ে সাগরে ভেসে বেড়াতে সাংঘাতিক পছন্দ করে যোশুয়া। ওর কথা মনে পড়তে চঞ্চল হয়ে উঠল জেনিফার।

ততক্ষণে ওয়ার্নার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পাল খাটাতে। দশমিনিট পর খোলা সাগরের দিকে ভেসে চলল 'পালোমা ব্লাঙ্কা'। প্রথম আধঘণ্টা ওরা দুজনেই ব্যস্ত থাকল নেভিগেশনের কাজে।

'কেমন লাগছে, জেনিফার?' পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ওয়ার্নার। জবাব দিল না জেনিফার। ঘুরে দাঁড়িয়ে আঁকড়ে ধরল ওয়ার্নারকে।

ওকে কোলে তুলে নিয়ে ডেকের ওপর শুইয়ে দিল ওয়ার্নার। চোখ বন্ধ করে উপভোগ করল প্রশান্ত মহাসাগরের দুলুনি। কাঠের ওপর কান পেতে শুনল পানির কুলুকুলু শব্দ। রাতের তারাখচিত খোলা আকাশের নিচে মিলিত হল ওরা।

অতীত ভবিষ্যৎ হারিয়ে গেল অন্ধকারে, বর্তমানটা সত্যি হয়ে রইল। জেনিফার জানে, আজকের পর আর কোনোদিন ওয়ার্নারের সঙ্গে দেখা হবে না ওর। অনেক বেশি দূরে সরে এসেছে ওরা পরস্পরের থেকে। কোনোমতেই এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

নীরবতা ভাঙল ওয়ার্নার, 'আগামীকাল...'

'কথা বোলো না, অ্যাডাম,' ফিসফিস করে অনুনয় করল জেনিফার। 'শুধু ভালোবাসো আমাকে।'

তেইশ

এদিকে নিউ জার্সির খামারবাড়িতে এক মেঘলা সকালে মারা গেলেন বৃদ্ধ অসুস্থ গডফাদার অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লি। স্বাভাবিকভাবেই সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল অ্যান্টোনিও মোরেট্টি।

শ্রাদ্ধের জমকালো অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেশের আনাচকানাচ থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছুটে এলেন মাফিয়া-পরিবারের প্রধানরা। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর আনুগত্য প্রকাশ করলেন তাঁরা মৃতের আত্মার প্রতি। এফ.বি.আই. আর আরও আধাডজন সরকারি প্রশাসনের লোকজনও বাদ পড়েনি। সাদা পোশাকে ক্যামেরা, অয়্যারলেস আর নোটবুক হাতে ছুটোছুটি করছে তারা।

কালো-পোশাক-পরা রোসাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে। বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে ছিল রোসা। কিন্তু সব শোক ছাপিয়ে ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে একধরনের গর্ব— যা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এখন থেকে তার স্বামীই মাফিয়া পরিবারের প্রধান, সে তাঁর স্ত্রী। একজন ইটালিয়ান মেয়ে এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে?

দুদিন পরে মোরেট্টি জরুরি পারিবারিক মিটিং ডাকল। এত তাড়াতাড়ি কাজে হাত না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে মাফিয়া-পরিবারে। সিনেটর ওয়ার্নারের তদন্ত কমিটির সরাসরি হস্তক্ষেপে একের-পর-এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওদের ব্যবসাগুলো। খুব তাড়াতাড়ি এর বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে আগামী কয়েক বছরেও এই লোকসান পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না।

আকাপুলকো থেকে এখনও ফিরে আসেনি জেনিফার। মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠেছে মোরেট্টি। এ-মুহূর্তে জেনিফারের পরামর্শের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি।

বাধ্য হয়ে কনসিলিয়ারির সঙ্গেই এখন ওকে আলাপ করতে হবে। ঐ চিপসেমুখো বুড়োর কথা মনে হতেই মেজাজ গরম হয়ে উঠল মোরেট্টির।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন কনসিলিয়ারি। বিমর্ষমুখে মোরেট্টির উল্টোদিকে চেয়ার টেনে বসলেন। গ্রানেল্লি শুধু গডফাদার ছিলেন না, কোলফ্যাক্সের অন্তরঙ্গ

একজন বন্ধুও ছিলেন। আঘাতটা এখনও সামলে উঠতে পারেননি তিনি।

'ভাবছি, বাহামাতে বড় ধরনের গ্যাম্বলিং চালু করব। আপাতত এটাই হল সবচেয়ে কম মূলধনে বেশি লাভ পাবার রাস্তা। এর পুরো দায়িত্ব আমি দিতে চাই জেনিফারকে। আশা করি ভালোই কাজ দেখাতে পারবে ও।' সন্তুষ্টি ফুটে উঠল মোরেত্তির চেহারায়।

কিন্তু বুশম্যান আপত্তি জানালেন। 'তুমি এ-ধরনের একটা সিদ্ধান্ত কিছুতেই নিতে পারো না। বাহামাতে আমাদের যে লোকজন রয়েছে, তারা আমাকেই ভালো করে চেনে। জেনিফারকে নয়। ওর চেয়ে আমি অনেক ভালোভাবে কাজটা করতে পারব।' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না তিনি।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল মোরেত্তি। 'এখন এ-কথা বলে লাভ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

হাল ছাড়লেন না বৃদ্ধ। 'আমি ঐ মেয়েটাকে একটুও বিশ্বাস করি না। অ্যান্টোনিও করত না।'

'অ্যান্টোনিওর কথা বলে কী লাভ! সে তো আর আমাদের মধ্যে নেই।' গ্রানেল্লি মারা যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে, ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করল মোরেত্তি।

কথার কৌশলে কীভাবে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তা ভালো করেই জানেন কনসিলিয়ারি। চট করে গলার স্বর নামিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে চাইলেন তিনি। 'মানে, আমি বলতে চাইছিলাম, মেয়েটাকে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে এতটা জড়ানো উচিত নয়। আমি মানি যে সে খুবই স্মার্ট আর বুদ্ধিমতী। কিন্তু বিদেশী একটা মেয়েকে এতটা বিশ্বাস করা কি ঠিক?'

কিন্তু বৃদ্ধ জানেন না ঠিক একই ধারণা মোরেত্তি তাঁর সম্বন্ধেও পোষণ করে। আজকাল মোরেত্তি প্রায়ই ভাবে ওয়ার্নার ক্রাইম কমিশন যদি কখনও কোলফ্যাক্সের নাগাল পায়, তাদের ইন্টাররোগেশনের মুখে কতক্ষণ টিকতে পারবে এই ঘাটের মড়া! মাফিয়া-পরিবারের আগাগোড়া সবই জানেন বৃদ্ধ। সে তুলনায় জেনিফার কিছুই জানে না। কোলফ্যাক্স একাই মাফিয়া-পরিবারের ধ্বংস টেনে আনতে যথেষ্ট— ঠিক একারণেই মোরেত্তি বিশ্বাস করে না তাঁকে।'

বলেই যেতে লাগলেন কোলফ্যাক্স, 'তদন্ত যতদিন চলছে, জেনিফারকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখো। একবার ধরতে পারলে ওকে কথা বলিয়ে ছাড়বে ওয়ার্নার। শত হলেও ও একটা মেয়ে। কতক্ষণ সহ্য করবে? তদন্ত শেষ হলে নাহয় ফিরিয়ে এনো ওকে।'

রহস্যময় হাসি ফুটল মোরেত্তির ঠোঁটে। চট করে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। 'ঠিক আছে, কনসিলিয়ারি। তা-ই হবে। জেনিফার কিছুদিন আমাদের থেকে

দূরেই থাকুক।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোলফ্যাক্সের চেহারা। 'এই তো, বুঝতে পেরেছ। এখন তো তুমিই পরিবারের নেতা। বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নেয়াই তোমার কাজ।'

অধৈর্য হয়ে পড়ল মোরেট্টি। 'ধন্যবাদ,' রান্নাঘরের দিকে ফিরে হাঁক দিল, 'নিক!'

পাঁচ সেকেন্ড পর নিক ভিটো হাজির হল। স্যুটেড-বুটেড পরিষ্কার চেহারা।

'কনসিলিয়ারিকে নিউইয়র্কে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে, নিক?'

'অবশ্যই পারব, বস্।'

'আর একটা কথা। পথে এক জায়গায় থেমে একটা প্যাকেট ডেলিভারি দিতে হবে,' চোখ কুঁচকে চাইল কোলফ্যাক্সের দিকে। ' যদি কিছু মনে না করেন, আপনি গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করুন, কনসিলিয়ারি।'

'আরে, এতে মনে করার কী আছে?' বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল বৃদ্ধ।

নিক ভিটোর দিকে ফিরল মোরেট্টি। 'এসো. নিক। ওপর থেকে প্যাকেটটা নিয়ে যাও।'

মোরেট্টির পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওর শোবার ঘরে উঠে এল নিক। দরজা বন্ধ করে নিষ্ঠুর চোখে তাকাল মোরেট্টি নিকের দিকে। 'নিউ জার্সি থেকে বের হবার আগে পথে এক জায়গায় থামতে পারবে তো?'

অবাক হল নিক। 'অবশ্যই, বস্।'

'এক বোঝা আবর্জনা ফেলে দিতে হবে,' নিক ভিটোর বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করল, 'কনসিলিয়ারি কোলফ্যাক্স।'

ভাবলেশহীন গলায় উত্তর দিল নিক, 'আপনি যা বলেন।'

'জাঙ্ক ইয়ার্ডে ফেলে দেবে লাশটা। এত রাতে কেউ থাকবে না ওখানে।'

পনেরো মিনিট পর নিউইয়র্কের পথে রওনা হল নিক। পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছেন বুশম্যান।

'অ্যান্টোনিও ঐ মেয়েটির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে বলে খুশি হয়েছি আমি,' পেছনে হেলান দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন তিনি। এখন রাত তিনটে। সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে।

'হুঁ,' অস্পষ্ট শব্দ করে সায় দিল নিক ভিটো। দেখে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ঝড় বয়ে চলেছে ওর ভেতরে। খুন করা ওর পেশা। এমনকি ব্যাপারটা উপভোগও করে সে। কারণ খুন করার সময় নিজেকে ঐশ্বর্যের মতো ক্ষমতাশালী মনে হয় ওর। কিন্তু তাই বলে কোলফ্যাক্সকে? মোরেট্টি কেন এমন অদ্ভুত আদেশ দিল, তার কিছুই

বুঝতে পারছে না নিক। কোলফ্যাক্স মাফিয়া-পরিবারের কনসিলিয়ারি। পরিবারের যে-কেউ বিপদে পড়লে তাঁর কাছে ছোটে। গডফাদারের পরে তিনিই সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। নিক ভিটোকে বহুবার তিনি বাঁচিয়ে এনেছেন পুলিশের হাত থেকে।

জেনিফারের ব্যাপারে কোলফ্যাক্সকেই সমর্থন করে নিক। মোরেত্তির মোটেই উচিত হয়নি বাইরেরর একটা বিদেশী মেয়েকে পরিবারের ভেতর ঢোকানো। সৌন্দর্য ছাড়া আর কী আছে মেয়েটার?

'এই, কী করছ? অ্যাকসিডেন্ট করবে তো!' পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন কোলফ্যাক্স।

সচেতন হল নিক। রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা বাইরে চলে এসেছে ও। দ্রুত উঠে এল আবার রাস্তায়।

জাঙ্ক ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে ওরা। শহরের যত অকেজো জিনিসপত্র, সব স্তূপ করে ফেলে দেয়া হয় বিরাট এলাকাটায়। লাশ গুম করার আদর্শ জায়গা এটা। কয়েক বছরেও কেউ টের পাবে না।

হার্টবিট বেড়ে গেল নিকের। চট করে দেখে নিল কোলফ্যাক্সকে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুম এসে গেছে তাঁর চোখে। বাঁ বগলের নিচে ছোট নলের পয়েন্ট থ্রি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন-এর স্পর্শ অনুভব করল নিক।

নড়েচড়ে উঠলেন কোলফ্যাক্স। 'ঘুম এসে যাচ্ছে দেখছি!' জড়িত গলায় বললেন তিনি। চোখদুটো বন্ধ।

সত্যিই ঘুমোতে যাচ্ছেন তিনি। এ ঘুম আর ভাঙবে না কখনও।

জাঙ্ক ইয়ার্ডটা দেখা যাচ্ছে সামনে। সতর্ক চোখে সামনে পেছনে ভালো করে দেখে নিল নিক। না, কোনো লোক বা গাড়ি কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ করে ব্রেকে চাপ দিল নিক। কর্কশ আওয়াজ করে থেমে গেল গাড়িটা। চমকে ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসলেন বুশম্যান।

'কী হল, নিক?'

'আর বলবেন না। ইঞ্জিনের গণ্ডগোল,' গজগজ করতে করতে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল নিক। ঘুরে এসে কোলফ্যাক্সের পাশে দাঁড়াল। ঠেলতে হবে। একটু সাহায্য করবেন, কনসিলিয়ারি?'

'এই বুড়ো হাড়ে কি আর শক্তি আছে? দেখি চেষ্টা করে...' বলতে বলতে দরজা খুলে বের হবার জন্যে ঝুঁকলেন কোলফ্যাক্স। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন নিকের হাতের অস্ত্রটা, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

বৃদ্ধ হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন,

'কী ব্যাপার, নিক?' গলাটা ভেঙে গেল তাঁর। 'কী করেছি আমি?'

এই একই প্রশ্ন এলোমেলো করে দিচ্ছে নিক ভিটোর মনটাকে। যে বৃদ্ধের ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবে না সে, তাকেই খুন করতে যাচ্ছে ও! মোরেট্টিকে নিশ্চয় কেউ ভুল বুঝিয়েছে।

নিক রাস্তার ওপর ফেলে দিল অস্ত্রটা। 'খোদার কসম, আমি জানি না। শুধু জানি, এটা ঠিক হচ্ছে না।'

আহত চোখে চেয়ে রইলেন কনসিলিয়ারি। 'তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটা পালন করো, নিক।'

'কিছুতেই তা পারব না আমি। আপনি আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্র, কনসিলিয়ারি।'

'অ্যান্টোনিও তোমাকে খুন করবে, নিক!'

কোলফ্যাক্স ঠিকই বলেছেন। মোরেট্টির কাছে কর্তব্যে অবহেলা কিংবা ব্যর্থতার একটাই শাস্তি— মৃত্যুদণ্ড। টমি অ্যাঞ্জেলোর কথা মনে পড়ল নিকের। এক অপারেশনে ব্যবহৃত গাড়ি নিউজার্সির জাঙ্কইয়ার্ডে লুকিয়ে রাখতে আদেশ দিয়েছিল তাকে মোরেট্টি। সেদিন সন্ধ্যায় এক মেয়ের সঙ্গে ডেট ছিল টমির। তাড়াহুড়ো করে নিউজার্সি পর্যন্ত না এসে ইস্ট সাইড স্ট্রিটের ডাম্পইয়ার্ডে লুকিয়ে রাখে সে গাড়িটা। পরদিন পুলিশ সেখান থেকে গাড়িটা উদ্ধার করে। তার পর থেকে টমিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

টমি নিখোঁজ হওয়ার পর নিক ভিটোকে তার জায়গায় বসায় মোরেট্টি।

মোরেট্টিকে ধোঁকা দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। কিন্তু তারপরেও নিক ভিটো ভাবে— একটা রাস্তা খোলা আছে এখনও।

'অ্যান্টোনিও কিছুই জানতে পারবে না,' নিকের ভোঁতা মগজে হঠাৎ কাজ করতে শুরু করেছে। 'আপনাকে এ দেশ ছেড়ে আজই চলে হবে,' একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি অ্যান্টোনিওকে বলব ময়লার নিচে কবর দিয়েছি আপনাকে। আপনি গোপনে এ দেশ ছেড়ে আজই চলে যাবেন। ইচ্ছে হলে সাউথ আমেরিকায় লুকিয়ে থাকতে পারেন। ওদিকটায় অ্যান্টোনিওর তেমন প্রতিপত্তি নেই। যথেষ্ট টাকা আছে তো আপনার কাছে?'

কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল কোলফ্যাক্সের সমস্ত অন্তর। 'টাকা-পয়সার অভাব নেই আমার। অ্যান্টোনিও আমাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই দিত। কিন্তু নিক, তোমার জন্যে আমার কিছু করা উচিত। কী চাও তুমি, বাবা?'

'ছি ছি! টাকার জন্যে আমি এ-কাজ করছি না, কনসিলিয়ারি। করছি,' একটু থামল নিক। 'কারণ আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। অনেকবার আমার জীবন বাঁচিয়েছেন

আপনি,' ঘড়ির দিকে তাকাল সে, 'এখনও আপনি সাউথ আমেরিকার প্লেনটা ধরতে পারবেন।'

মাথা নাড়লেন কোলফ্যাক্স। 'ঠিক আছে, নিক। একটু কষ্ট করে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আমাকে? পাসপোর্টটা নিতে হবে।'

দু-ঘণ্টা পর বুশম্যান ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের জেটে চেপে বসলেন। গন্তব্য ওয়াশিংটন ডি সি।

চব্বিশ

আকাপুলকোতে আজই ওদের শেষ দিন। কনভেনশন শেষ হবার পরেও আরও এক হপ্তা ছিল ওরা যোশুয়ার আবদারে। খুব ভালো লেগে গেছে ওর জায়গাটা।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজকের সকালটা বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। নরম রোদ বিছিয়ে পড়েছে বেলাভূমিতে। পামগাছের চিরল পাতায় শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে ভেজা বাতাস। অন্যদিনের চেয়ে সাগরপাড়ে আজ ট্যুরিস্টের সংখ্যাও বেশি।

নাশতার টেবিলে জেনিফার আর মিসেস ম্যাকি তখনও খাওয়া শেষ করেনি। সাঁতারের পোশাক পরে লাফাতে লাফাতে এল যোশুয়া। এ-ক'দিনেই সূর্যের আলোয় চমৎকার ট্যান হয়ে গেছে ওর ধবধবে সাদা চামড়া।

'মাম্মি, এতক্ষণে সকালের নাস্তা হজম হয়ে গেছে। এবার স্কি করতে যাই?'

'যোশুয়া, নাশতা করেছ এখনও দশ মিনিট হয়নি। আর একটু অপেক্ষা করে যাও।'

'তুমি কিচ্ছু জানো না। আমার মেটাবলিজম রেট অনেক বেশি। এতক্ষণে সব হজম হয়ে গেছে।'

জোরে হেসে উঠল জেনিফার। 'স্কুলে দেখছি অনেক কিছু শেখানো হয়। ঠিক আছে। যাও।'

সময় নষ্ট না করে দৌড়াল যোশুয়া। তীরের কাছে অনেকগুলো স্পিডবোট বাঁধা আছে। একটা স্পিডবোট ঠিক করে পেছন ফিরে জেনিফারের দিকে হাত নাড়ল। হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিল জেনিফার। দ্রুত স্কি পরে নিল যোশুয়া।

এতদূরে থেকেও স্পিডবোটের স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পেল জেনিফার। যোশুয়া নিপুণ ভঙ্গিতে চলতে শুরু করেছে।

গর্বিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন মিসেস ম্যাকি, 'আমাদের যোশুয়া ন্যাচারাল অ্যাথলেট, তাই না, মিসেস পার্কার?'

হঠাৎ এ-সময় পেছন ফিরে জেনিফারের উদ্দেশে হাত নাড়তে গেল যোশুয়া। সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ল পেছনে। ডুবে গেল পানির নিচে।

দৌড়ে গেল জেনিফার। আতঙ্কে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। কিন্তু তীরে

পৌঁছে দেখল পানির ভেতর থেকে মাথা বের করে ওর দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসছে যোশুয়া। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল জেনিফার। যাক, তেমন কিছু হয়নি। যদি হত...ভাবতে পারে না জেনিফার। আচ্ছা, সব মা-ই কি তাদের বাচ্চাদের ঠিক এতটা ভালোবাসে? কী-না করতে পারে জেনিফার যোশুয়ার জন্যে! নিজের হাতে না হলেও মানুষ খুন করিয়েছে ওর জন্যেই। শান্ত হতে চেষ্টা করল জেনিফার। ভাগ্যিস, কিচ্ছু হয়নি ওর!

হাঁপাতে হাঁপাতে এতক্ষণে জেনিফারের পাশে পৌঁছুলেন মিসেস ম্যাকি। 'যোশুয়ার কিছু হয়নি তো?'

'না। লাগেনি ওর,' এখনও বুকটা ধড়ফড় করছে জেনিফারের।

সাবলীল ভঙ্গিতে স্কি করছে যোশুয়া। কিন্তু কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছে না জেনিফার। ঘণ্টাখানেক পরে যোশুয়া তীরে ফিরে এলে তারপর নিশ্চিন্ত হল। জড়িয়ে ধরল ওর ভেজা শরীর। 'ব্যথা পাওনি তো, সোনা?'

'একটুও না। শুধু মাথার পেছনে একটুখানি ফুলে উঠেছে। মনে হয়, স্কি-টা ধাক্কা দিয়েছে ওখানে। ও কিছু না।'

'দেখি তো কোথায় ফুলে গেছে?' জেনিফার খুঁজতে যেতেই লাফিয়ে সরে গেল যোশুয়া।

'বলছি তো, কিচ্ছু না,' যেন পৌরুষে ঘা লাগল ওর এই ছোট্ট ব্যাপারটা নিয়ে মা-কে চিন্তিত হতে দেখে। কিন্তু জেনিফার ছাড়ল না। হাত চালিয়ে দিল যোশুয়ার ঘন চুলের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল।

'একেবারে ডিমের মতো ফুলে উঠেছে!'

'আহ্! বললাম তো কিচ্ছু না!' বিরক্ত হল যোশুয়া।

উঠে দাঁড়াল জেনিফার। 'চলো, হোটেলে ফিরে যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি!' আর্তনাদ করে উঠল যোশুয়া।

'বাহ্! মনে নেই আজ ফিরে যাব আমরা! কাপড়চোপড় গোছাতে হবে যে!'

'আরও ক'দিন থেকে গেলে হয় না, মাম্মি?'

'বা-রে, তুমি দেখছি ভুলেই বসে আছ এই শনিবারে তোমার স্কুলের বেইসবল ম্যাচের কথা। এবার খেলার ইচ্ছে নেই নাকি!'

'কে বলেছে! ঐ ব্যাটা টেরি উল্‌ফ টিমে আমার জায়গাটা হাতিয়ে নেবার তালে আছে।'

'টেরি? আরে, ও তো মেয়েদের মতো দৌড়োয়!'

মায়ের মন্তব্যে খুশি হয়ে উঠল যোশুয়া।

হোটেলে ফিরে ম্যানেজারকে ফোনে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিতে বলল জেনিফার। আধঘণ্টা পরে ডাক্তার রাউল মেনডোযা রুমে নক করলেন। দরজা খুলে দিল জেনিফার। মধ্যবয়স্ক, পুরোনো মেক্সিকান স্টাইলের সাদা-সুট-পরা হাসিখুশি ডাক্তারকে বেশ ভালো লাগল ওর।

'আমার ছেলে পড়ে গিয়ে মাথা ফুলিয়ে ফেলেছে। দেখুন তো ওকে একটু,' যোশুয়ার শোবার ঘরে ডাক্তারকে নিয়ে এল জেনিফার। যোশুয়া তখন মনোযোগ দিয়ে কাপড় গোছাচ্ছে।

'যোশুয়া, ইনিই ডাক্তার মেনডোযা।'

অবাক হল যোশুয়া। 'মাম্মি, এখানে কেউ কি অসুস্থ? ডাক্তার এসেছেন কেন?'

'না, সোনা, কেউ অসুস্থ হয়নি। উনি শুধু তোমার মাথার ফোলা জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখবেন।'

রেগে গেল যোশুয়া। 'ওহ্, মাম্মি! কি যে ছেলেমানুষি কর!' তারপর সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল ডাক্তারের দিকে। 'কোনো সুঁই ফোটাবেন না তো?'

'না, সিনর। আমি অহিংস্র ডাক্তার,' হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন তিনি।

'ভালো। আমিও এরকম ডাক্তারই পছন্দ করি,' গম্ভীর স্বরে বলল যোশুয়া।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন যোশুয়াকে। অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে চোখের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলেন। মাথার ফোলা জায়গাটায় যখন চাপ দিলেন, যোশুয়া শুধু ব্যথায় চোখ কোঁচকাল, কোনো শব্দ করল না।

খুশি হয়ে ওর পিঠে চাপড়ে দিলেন ডাক্তার। 'সাহসী ছোকরা! কিচ্ছু হয়নি ওর। সব ঠিক আছে। শুধু বরফ দিয়ে যে-জায়গাটা ফুলে গেছে সেখানে সেঁক দিয়ে দেবেন। আর ব্যথা থাকবে না।'

স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল জেনিফার। 'ধন্যবাদ।'

'আমার ছেলের অসুখে ডাক্তার ডাকব না? তোমার জন্যেই তো আমার সবকিছু, সোনা!'

'অসুখ কোথায়, মাম্মি? আমার টিমে আমিই সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ছেলে।'

'সবসময় তাই থেক,' যোশুয়াকে জড়িয়ে ধরল জেনিফার।

'ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি,' হাসল যোশুয়া।

সাড়ে ছ'টার প্লেন ধরল ওরা। সময়মতোই নিউইয়র্কে পৌছোল। স্যান্ডস পয়েন্টের বাড়িতে পৌছুতে পৌছুতে রাত অনেক হয়ে গেল। সারাটা পথ অঘোরে ঘুমোল যোশুয়া।

পঁচিশ

সেদিন সকালে স্টাডিতে বসে টেলিভিশন-বক্তৃতার খসড়া তৈরি করছিলেন অ্যাডাম ওয়ার্নার। কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না। মেক্সিকোর চাঁদনি রাতের পর জেনিফারের কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না তিনি। এতদিন পর আজ কেবলই মনে হচ্ছে, হিসেবে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে! সেদিন এভাবে জেনিফারকে হারিয়ে যেতে দেয়া তার উচিত হয়নি। চুলোয় যেত সবকিছু, জেনিফার তো থাকত তার নিজের হয়ে!

দরজায় নক করল কেউ।

'কাম ইন,' বিরক্ত মুখে বললেন ওয়ার্নার।

অ্যাডামের প্রধান সহকারী চাক মরিসন ঢুকল, 'হাতে একটা ক্যাসেট। ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন ওয়ার্নার। 'কী ব্যাপার, মরিসন? কাজের সময় বিরক্ত না করলেই নয়!'

'দুঃখিত, সিনেটর। কিন্তু আমাকে কিছুটা সময় দিতেই হবে,' উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে মরিসন।

'ঘণ্টাখানেক পরে এসো,' ওকে উপেক্ষা করে আবার টেবিলে ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

অধৈর্য গলায় জোর করল মরিসন। 'আপনাকে শুনতেই হবে। কথা দিচ্ছি, আপনার সময় নষ্ট হবে না,' চেয়ারে বসে পড়ে সামনে ঝুঁকে এল সে।'একটু আগে রহস্যময় একটা ফোনকল পেয়েছি। হতে পারে কোনো পাগলের প্রলাপ। কিন্তু যদি সত্যের লেশমাত্রও তাতে থাকে, তবে এ-বছর আমাদের জন্যে ক্রিসমাসটা আগে আগেই এসে যাবে। মন দিয়ে শুনুন।'

ওয়ার্নারের টেবিলে রাখা ক্যাসেটপ্লেয়ারের ভেতর ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিল মরিসন। প্লে-বাটনে চাপ দিল।

'কি নাম বললেন মাথাব্যথার দরকার নেই। আমি সিনেটর ওয়ার্নার ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলব না,' ও-পাশের গলার স্বর অপরিচিত, ভাঙা। হয়ত মাউথপিসের ওপর রুমাল চাপা দিয়ে কথা বলছে।

'সিনেটর এ মুহূর্তে সাংঘাতিক ব্যস্ত। কোনো খবর থাকলে বলুন...'

'না। আমাকে কথা বলতেই হবে তাঁর সঙ্গে। এটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। সিনেটরকে জানিয়ে দেবেন অ্যান্টোনিও মোরেত্তিকে তাঁর হাতের মুঠোয় পুরে দিতে পারি আমি। এই ফোনটা করার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি আমি। শুধু খবরটা পৌঁছে দেবেন তাঁকে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'থার্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের ক্যাপিটোল মোটেলে উঠেছি আমি। চোদ্দ নাম্বার রুম। তাঁকে বলবেন যেন আঁধার নামার পর আসেন। ভালোভাবে দেখে নিতে বলবেন কেউ অনুসরণ করছে কিনা। আমি জানি, প্রতিটি কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, সিনেটর ছাড়া অন্য কেউ যদি এই টেপ শোনে, তবে আমার মৃত্যু ঈশ্বরও ঠেকাতে পারবে না।'

খুট করে লাইন কাটার শব্দ পাওয়া গেল।

মরিসন উজ্জ্বল চোখে জানতে চাইল, 'কী ভাবছেন, সিনেটর?'

একটু ইতস্তত করলেন ওয়ার্নার। 'এ শহরে পাগলের অভাব নেই। কিন্তু এই পাগলটা যখন অ্যান্টোনিও মোরেত্তির নাম উচ্চারণ করেছে, এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।'

রাত দশটায় অ্যাডাম ওয়ার্নার ক্যাপিটোল মোটেলে পৌঁছলেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে চারজন সিক্রেট সার্ভিসের লোক। চোদ্দ নাম্বার রুমে নক করলেন তিনি।

দরজা একচিলতে ফাঁক হল। ওপাশে একটা চোখ ভালোভাবে দেখে নিল তাকে। তারপর আর একটু খুলে গেল দরজা। এবার চিনতে পারলেন ওয়ার্নার।

সঙ্গের লোকজনদের দিকে ফিরে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা নিচে অপেক্ষা করো। অপরিচিত কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।'

ওরা চলে গেলে দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। ভেতরে পা রাখলেন ওয়ার্নার।

'গুড ইভনিং, সিনেটর ওয়ার্নার।'

'গুড ইভনিং, মিস্টার কোলফ্যাক্স।'

মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুজন।

শেষ যেবার ওয়ার্নার কোলফ্যাক্সকে দেখেছেন, তখন অনেক শক্তসমর্থ ছিলেন তিনি। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে। ভয়ে চুপসে গেছেন বৃদ্ধ। যে অটল ব্যক্তিত্বের সামনে কোর্টে কেউ দাঁড়াতে পারত না, তার কিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই।

'কষ্ট করে এসেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বসতে বললেন তিনি অ্যাডাম ওয়ার্নারকে।

'আপনি অ্যান্টোনিও মোরেট্টি সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছিলেন,' একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন ওয়ার্নার।

'আমি ইচ্ছে করলে তাকে আপনার কোলে বসিয়ে দিতে পারি,' নির্মম স্বরে বললেন কোলফ্যাক্স।

'আপনি অ্যান্টোনিও মোরেট্টির অ্যাটর্নি। তাহলে এরকম কাজ করতে চাইছেন কেন?'

'অবশ্যই তার কারণ আছে।'

'আমি যদি আপনার সব কথা শুনতে রাজি হই, তার বদলে কী চাইবেন আপনি?'

'প্রথমত, নিরাপত্তা। দ্বিতীয়ত, অন্য কোনো দেশে চলে যেতে চাই আমি। আমার একটা নতুন পাসপোর্ট আর নতুন পরিচয়ের কাগজপত্র দরকার হবে।'

তাহলে এই ব্যাপার! অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। কিন্তু তার পরেও মনটা খচখচ করছে ওয়ার্নারের। যদি এটা ওদের কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা হয়? নিজের সৌভাগ্যে খুব কমই বিশ্বাস করে ওয়ার্নার। সারাটা জীবনই যে ব্যর্থতায় ভরা! জেনিফারের কথা মনে পড়ল!

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল নিজেকে। কী হচ্ছে! এই জরুরি মুহূর্তে এসব কথা ভাবার দরকার কী?

'আমি কথা দিচ্ছি, পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আপনার জন্যে। কিন্তু অন্যকিছু সম্বন্ধে কথা দিতে পারছি না। আপনাকে আগে কোর্টে প্রমাণ হাজির করতে হবে মোরেট্টির বিরুদ্ধে।'

'অবশ্যই সেটা করব আমি।'

'মোরেট্টি কি জানে, কোথায় আছেন আপনি?'

'মাথা খারাপ! সে জানে আমি মৃত,' নার্ভাসভাবে হাসলেন কোলফ্যাক্স। 'যদি আমাকে খুঁজে পায় মোরেট্টি, আর বেঁচে থাকতে হবে না।'

'আপনাকে খুঁজে পাবে না সে। অবশ্য যদি একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা।'

'আমি আমার জীবনটা আপনার হাতেই তুলে দিয়েছি, সিনেটর।'

'সত্যি বলতে কি,' ওয়ার্নার জানিয়ে দিল তাঁকে। 'আপনার ব্যাপারে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমরা চাই মোরেট্টিকে। যদি আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন, তবে সরকার সবধরনের সাহায্য করবে আপনাকে। আর আপনি যদি আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন, তবে সরকার প্রচুর টাকাসহ পৃথিবীর যে-কোনো দেশে আপনার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কথা দিতে হবে, কোর্টে রাজসাক্ষী হবেন আপনি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কোলফ্যাক্স। বললেন, 'আমি রাজি,' মাথা নিচু করে চোখ বুজলেন। 'অ্যান্টোনিও যদি জানত, কবর থেকে লাফিয়ে উঠত এক্ষুনি।'

ওয়ার্নার একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। এই বিজ্ঞ লোকটি হাজারবার আইনকে কলা দেখিয়েছে, ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে অসংখ্য ভয়ংকর অপরাধীকে। অথচ যাদের জন্যে এতদিন এসব কাজ করেছে, এখন তাদের বিরুদ্ধেই ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। কী বিচিত্র এই পৃথিবী!

কোলফ্যাক্স ফিরে তাকালেন ওয়ার্নারের দিকে। 'আমি লিখিত একটা চুক্তি চাই। সেটাতে সই করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল!'

'তা-ই হবে,' নোনা-ধরা অপরিষ্কার ঘরটির চারদিকে নজর বোলালেন ওয়ার্নার। 'এ জায়গাটা ছাড়তে হবে আপনাকে।'

'কিন্তু আমি কোনো হোটেলে যাব না। ওসব জায়গায় মোরেট্টির হাত পৌঁছে যাবে।'

'আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে মোরেট্টি কেন, ওর বাপেরও সাধ্যি নেই আপনার ক্ষতি করার।'

রাত বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। একটা মিলিটারি ট্রাক আর দুটো জিপ এসে দাঁড়াল ক্যাপিটোল মোটেলের চোদ্দ নাম্বার রুমের সামনে। সামনের জিপ থেকে লাফিয়ে নামল চারজন মিলিটারি পুলিশ। দ্রুত এগোল চোদ্দ নাম্বার রুমের দিকে।' ঠিক পাঁচ মিনিট পরে তারা বেরিয়ে এল। চারদিক থেকে ঘিরে আড়াল করে রেখেছে তারা কোলফ্যাক্সকে সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে। ছোট্ট মিছিলটি দ্রুত উঠে পড়ল দ্বিতীয় জিপে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল ভার্জিনিয়ার কোয়ানটিকোর পথে, ওয়াশিংটন থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পশ্চিমে। সামনে জিপ, পেছনে মিলিটারি ট্রাকের কড়া পাহারায় কোলফ্যাক্স চললেন নতুন ঠিকানায়।

ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে গাড়ির ক্যারাভানটা নিরাপদে পৌঁছে গেল কোয়ানটিকোতে অবস্থিত ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কোর বেইসে।

বেইসের কম্যান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল রয় ওয়ালেস সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গেটে অপেক্ষা করছিলেন। কোলফ্যাক্সকে জিপ থেকে নামানো হলে তিনি তাঁর ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিলেন, 'বন্দিকে স্পেশ্যাল সেলে নিয়ে যাও, কেউ যেন কথা বলার সুযোগ না পায়।'

উৎসুক চোখে অপসৃয়মাণ দলটির দিকে চেয়ে রইলেন ওয়ালেস। এই দামি বন্দির পরিচয় জানার জন্যে এই মুহূর্তে এক মাসের বেতন দিয়ে দিতেও তিনি রাজি।

তিনশো দশ একর জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই মেরিন কোর। অনেকেই জানে

না, এটা এফ.বি.আই. অ্যাকাডেমির একটা গোপন অংশ। অনেক দিন থেকে মেজর জেনারেল এখানে দায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু এর আগে আর কখনও কোনো সিভিলিয়ান বন্দিকে এখানে আনা হয়নি। একদিক থেকে এটা নিয়মের বাইরে।

ঠিক দুঘণ্টা আগে উঁচুমহল থেকে একটা ফোন এসেছিল।' একজন লোককে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, রয়। পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তার নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার ওপর। যদি কোনোরকম ক্ষতি হয় লোকটার, কাঁচা চিবিয়ে ফেলব তোমাকে।'

লোকটা যে যথেষ্ট দামি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? ভাবতে ভাবতে নিজের অফিসে গিয়ে বসলেন ওয়ালেস। ক্যাপ্টেনের ফিসের নাম্বার ঘুরিয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরলেন। একবার রিং বাজতে না বাজতেই ধরল ক্যাপ্টেন পিয়ার্স।

'লোকটাকে ঠিকভাবে সেলে রেখে এসেছ তো?'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'আমরা তার নিরাপত্তার দিকটা দেখব। আমি চাই তোমার নিজের পছন্দমতো গার্ড তুমি লোকটার জন্যে নিয়োজিত করবে। খেয়াল রাখবে, কেউ যেন তার ধারেকাছে যেতে না পারে। কোনো দর্শনার্থীকে অ্যালাউ করবে না। কোনো চিঠি, কোনো প্যাকেট— কিচ্ছু না। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর একটা ব্যাপার। লোকটির জন্যে যখন খাবার রান্না করা হবে, আমি চাই তুমি নিজে সে-সময় কিচেনে উপস্থিত থাকবে।'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'যদি কেউ লোকটির সম্পর্কে কোনোরকম কৌতূহল প্রকাশ করে, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে আমাকে। আর কোনো প্রশ্ন?'

'ভেরি গুড! যদি কোনোকিছু এদিক-ওদিক হয়, কাঁচা চিবিয়ে ফেলব তোমাকে,' গালিটা 'কোট' করতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলেন জেনারেল।

ছাব্বিশ

জানালার কাচে বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙল জেনিফারের। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে শুনল। হঠাৎ মোরেট্টির কথা মনে পড়ে যেতেই চুপসে গেল জেনিফার।

না। এখন আর সম্ভব নয়। যে অবস্থার মধ্যে সে এসে পৌঁছেছে, সেখান থেকে আর মুক্তি নেই! এই বাঁধন ছিঁড়ে তার পক্ষে সম্ভব নয়। মোরেট্টিই বা ছাড়বে কেন ওকে?

ওয়ার্নারের সাথে দেখা হবার পর থেকেই মনটা আনচান করছে জেনিফারের। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে এই চেনা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চাদর সরিয়ে উঠে পড়ল সে। অফিসে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

আধঘণ্টা পর রেডি হয়ে নিচে নেমে ডাইনিংরুমে ঢুকল জেনিফার। কিন্তু যোশুয়াকে আজ খাবার টেবিলে না দেখে অবাক হল সে। নেই। ওর চেয়ারটা খালি। ব্যাপার কী? প্রতিদিন মা-ছেলে একসঙ্গে নাশতা করে। যতক্ষণ জেনিফার নিচে না নামে, ততক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যোশুয়া।

কিচেন থেকে মিসেস ম্যাকি বেরিয়ে এলেন গরম পরিজের বাটি হাতে নিয়ে। 'গুড মর্নিং, মিসেস পার্কার।'

'গুড মর্নিং। যোশুয়া কই?'

'ওকে এত টায়ার্ড লাগছে যে আমি ভাবলাম ওর আর একটু ঘুমোনো দরকার। আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। কাল থেকে নাহয় যাবে।'

মাথা নাড়ল জেনিফার। 'আপনি যা ভালো মনে করেন।'

একা একাই নাশতা সেরে নিল ও। তারপর যোশুয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে উঠে এল ওর বেডরুমে। যোশুয়া গভীর ঘুমে অচেতন।

বিছানার কিনারায় বসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে আদর করল। তারপর নেমে এল নিচে। যোশুয়ার জন্য ক'টা স্যান্ডউইচ বানাতে নির্দেশ দিল মিসেস ম্যাকেবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল অফিসের উদ্দেশে?'

সারাদিন ব্যস্ত রইল জেনিফার। এতদিনের জমে থাকা কাজ সামলানো একদিনের ব্যাপার নয়। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধে সাতটা বেজে গেল।

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে। এখন কিছুটা ধরে এলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। টিপটিপ করে পড়ছেই। মিসেস ম্যাকি দরজা খুলে দিলেন। রেইনকোটটা খুলে তাঁর হাতে দিল জেনিফার।

'যোশুয়া কোথায়?' চুল থেকে পানির ফোঁটা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করল।

'ও তো ঘুমোচ্ছে।'

অবাক হয়ে বৃদ্ধার দিকে চাইল জেনিফার। 'বলেন কী! ও কি সারাদিনই ঘুমিয়েছে?'

'কী যে বলেন!' হেসে ফেললেন তিনি। 'এই তো একটু আগেও বল নিয়ে খেলছিল। ডিনার তৈরি করে ডাকতে যেতেই দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই আর জাগাইনি।'

'ও। বেচারা বোধহয় আসলেই খুব টায়ার্ড।'

যোশুয়ার ঘরে ঢুকল জেনিফার। ঘুমোচ্ছে যোশুয়া। দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ সুকুমার চেহারা। কপালের ওপর চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খেল জেনিফার। হাতের উল্টোদিক ছোঁয়াল গালে। না, জ্বর নেই। মুখের রঙও স্বাভাবিক। পালস্ দেখল। একদম ঠিক। চিন্তার কিচ্ছু নেই। আসলে এ ক'দিন বেশি হইহল্লা করেছে যোশুয়া। তারপর এত লম্বা জার্নি। ধকলটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। হয়তো সারাদিন বাসায় দুষ্টুমি করেছে মিসেস ম্যাকির সঙ্গে। এখন সন্ধে হতে-না-হতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর গায়ের চাদরটা ভালো করে টেনে দিল জেনিফার। লাইট নিবিয়ে দিয়ে নেমে এল নিচে।

'মিসেস ম্যাকি, কয়েকটা স্যান্ডউইচ তৈরি করে ওর বিছানার পাশে সাইড টেবিলে রেখে দিন। ঘুম ভাঙলে উঠে খেতে পারবে।'

ডেস্কে বসে কাজ করতে করতেই ডিনার সেরে ফেলল তাকিয়ে পরের দিনের কিছু ব্রিফ তৈরি করল, ট্রায়াল ডিসপোজিশন ঠিক করল। মোরেট্টিকে ফোন করেছিল সকালে। কিন্তু পায়নি। ইচ্ছে হল এখন আবার করতে। কিন্তু করল না।

অনেক রাতে ঘুমোতে যাবার সময় যোশুয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে গেল জেনিফার। স্যান্ডউইচগুলো যেমন রাখা ছিল, তেমনি আছে।

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে জেনিফারের আগেই হাজির হল যোশুয়া। স্কুলের পোশাক পরে সে রেডি।

'মর্নিং, মাম্মি।'

'গুড মর্নিং, সোনা। কেমন লাগছে শরীরটা?'

'দারুণ!'আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মেক্সিকোর সূর্যটা খুব বেশি রকমের গরম।'

হেসে ফেলল জেনিফার। 'তাই নাকি!'

'কিন্তু সত্যি খুব ভালো লেগেছে আমার। আচ্ছা মাম্মি, আগামী সামারের ছুটিতে আবার আমরা যেতে পারি না আকাপুলকোতে?'

'কেন পারব না?' আশ্বস্ত করল জেনিফার।

দুপুরবেলা ড্যানের সঙ্গে একটা মামলার ব্যাপারে জরুরি আলাপ করছিল জেনিফার। এমন সময় সিনথিয়া ওকে জানাল, 'কোন এক মিসেস স্টাউট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। লাইন দেব?'

চিনতে পারল জেনিফার। যোশুয়ার স্কুলের টিচার! 'ঠিক আছে, দাও।'

লাইন দিয়ে দিল সিনথিয়া।

'হ্যালো, মিসেস স্টাউট। কোনো গোলমাল হয়নি তো?'

'না না তেমন কিছু নয়। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাচ্ছিলাম বাড়িতে যেন যোশুয়ার ঘুমের ডিসটার্ব না হয়।'

'মানে?' অবাক হল জেনিফার।

'স্কুলে আজ সারাদিনই সে ঘুমিয়েছে। মিস উইলিয়ামস আর মিসেস টোবোকো— দুজনেই রিপোর্ট করেছেন। আপনি লক্ষ্য রাখবেন, রাতে যাতে ঠিক সময়ে ঘুমোতে যায় সে।'

'আমি...মানে...ঠিক আছে। আমি দেখব।'

'দুঃখিত, মিসেস স্টাউট,' অপ্রস্তুত গলায় ক্ষমা চাইলেন মহিলা। 'হয়তো অকারণেই আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'না না, কী যে বলেন! আমাকে জানিয়ে ভালোই করেছেন।'

টেলিফোন রেখে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেনিফার। ছুটল দরজার দিকে। 'ড্যান, পরে কথা হবে। আমাকে এক্ষুনি একবার বাসায় যেতে হবে।'

পাগলের মতো গাড়ি চালাল জেনিফার। স্পিড লিমিট ছাড়িয়ে গেল, রেড লাইটগুলোকে পাত্তা দিল না। শুধু মনে হচ্ছে, ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। যোশুয়ার যদি কিছু হয়!

বাড়িতে পৌঁছে একটু নিশ্চিন্ত হল সে। মনে মনে ভাবছিল, পৌঁছে দেখবে বাড়ির সামনে ভিড় করে আছে অসংখ্য লোক, পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি। সেসব কিছু না দেখে নিশ্চিত হল জেনিফার।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঝট করে দরজা খুলে ঘরে পা দিল জেনিফার।

'যোশুয়া!'

'জ্বী, মাম্মি! আমি এখানে।'

লিভিংরুমে বসে টিভি দেখছে যোশুয়া। এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল জেনিফারের। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। সবকিছু ঠিক আছে। হঠাৎ কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।

টিভিতে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে।

'মাম্মি, শেষ ইনিংটা যদি দেখতে না! যা দারুণ খেলেছে সোয়ান ক্রেইগ।'

'তোমার শরীর ভালো আছে তো, বাবা?' ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল জেনিফার।

'অবশ্যই ভালো আছে, মাম্মি। কিন্তু তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, সোনা, আমার কিছু হয়নি। তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

হাঁপ ছাড়ল যোশুয়া, মুচকি হাসল। 'আমার অসুবিধে? হ্যাঁ, একটু তো হচ্ছেই। আমার টিম দুই উইকেটে হেরে যাচ্ছে,' আবার মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখতে লাগল যোশুয়া।

নিজেকে মনে মনে গালি দিল জেনিফার। কী আজেবাজে চিন্তা যে আসে!

'তুমি খেলাটা দেখে ডিনার করতে এসো। আমি অপেক্ষা করব।'

প্রসন্নমনে কিচেনে গেল জেনিফার। ঠিক করল, যোশুয়ার জন্যে নিজের হাতে একটা ব্যানানা কেক বানাবে ডিনারের পর খাওয়ার জন্যে। যত্ন করে কেক বানাতে বসল জেনিফার।

ঠিক তিরিশ মিনিট পর জেনিফার যখন লিভিংরুমে ফিরে এল, যোশুয়া তখন কার্পেটের ওপর বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে আছে। অচেতন।

সাতাশ

পথ যেন আর শেষ হয় না! কতদূরে ব্লাইনডারম্যান মেমোরিয়াল হাসপাতাল! অ্যাম্বুলেন্সে নিথর হয়ে বসে আছে জেনিফার যোশুয়ার হাত ধরে। সাদা-পোশাক-পরা নার্স যোশুয়ার মুখের ওপর অক্সিজেন মাস্ক ধরে রেখেছে। এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি ওর।

অনবরত সাইরেন বাজিয়ে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু ভিড়ের জন্যে জোরে চলতে পারছে না। সুযোগ পেলেই ঘষা কাচের ওপর দিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে রাস্তার লোকজন। অসহ্য রাগ হল জেনিফারের।

'এসব অ্যাম্বুলেন্সে ওয়ান-ওয়ে গ্লাস ব্যবহার করা হয় না কেন?'

নার্স অবাক হয়ে তাকাল, 'জ্বী ম্যাডাম, কিছু বলছেন?'

'না না...কিচ্ছু না,' অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল জেনিফার।

কিন্তু নার্সের মনোযোগ তখন আর এদিকে নেই। একদৃষ্টে চেয়ে আছে যোশুয়ার মুখের দিকে। সতর্ক।

হাসপাতালের পেছনদিকে এমারজেন্সি এন্ট্রান্সে থামল অ্যাম্বুলেন্স। দু'জন ইন্টার্নি দরজায় ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে যোশুয়াকে স্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে গেল তারা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল জেনিফার।

একজন নার্স এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি বাচ্চাটার মা?'

'জ্বী।

'এদিকে আসুন, প্লিজ!'

যোশুয়াকে ট্রলিতে শুইয়ে এক্সরে রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। নার্সের পেছন পেছন সেদিকে রওনা হল জেনিফার। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেয়া হল না ওকে।

ডেস্কে বসা চিমসেমতো এক মহিলা জেনিফারকে জিজ্ঞেস করল, 'হাসপাতালের বিল কীভাবে মেটাবেন, ঠিক করেছেন? ক্যাশ পেমেন্ট নাকি ব্লু-ক্রস বা সে-ধরনের কোনো ইনস্যুরেন্স করা আছে?'

মহিলার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হল জেনিফারের। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। বেশ শান্তভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিল। ওদের দেয়া ফর্মগুলো পূরণ করার পর ওকে ভেতরে যেতে অনুমতি দিলেন ভদ্রমহিলা।

হুড়মুড় করে এক্সরে রুমে ঢুকে পড়ল ও। রুমটা খালি। যোশুয়া নেই। পাগলের মতো আবার করিডোরে বেরিয়ে এল জেনিফার। একজন নার্স পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। খপ করে তার কাঁধ খামচে ধরল জেনিফার। 'আমার ছেলে কোথায়?'

অবাক চোখে তাকাল নার্স। 'আমি কেমন করে জানব? কী নাম তার?'

'যোশুয়া...মানে যোশুয়া পার্কার।'

'কোথায় রাখা হয়েছিল ওকে?'

'ও..ছিল...এক্স..রে রুমে...আমি...কী করেছেন আপনারা ওকে? শিগগির বলুন, কোথায় আমার ছেলে? কী করেছেন আপনারা ওকে?'

সমবেদনার চোখে ওকে দেখল নার্স। মাথা নেড়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, ম্যাডাম। দেখি, ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল নার্স। 'ডক্টর মরিস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার সঙ্গে আসুন।'

থরথর করে কাঁপতে লাগল জেনিফার। দু পা এগিয়ে নার্স ফিরে তাকাল ওর দিকে। 'কী ব্যাপার, ম্যাডাম, শরীর খারাপ লাগছে?'

ভয়ে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে জেনিফারের। বহুকষ্টে বলল, 'আমার ছেলেকে এনে দাও।'

নার্স ওর কোমর জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল ডক্টর মরিসের রুমে। ভয়ানক মোটা শরীর নিয়ে বসে বসে ঘামছেন তিনি, লাল পুরু ঠোঁট, আঙুলে নিকোটিনের দাগ। চিন্তিত চোখে তাকাল জেনিফারের দিকে। 'আপনি মিসেস পার্কার?'

রক্ত হিম হয়ে এল জেনিফারের। 'যোশুয়া কোথায়?'

মুখে কিছু না বলে পাশের ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে এলেন ওকে ডাক্তার। চারদিকে ভয়ংকর দর্শন সব যন্ত্রপাতি।

'শান্ত হয়ে বসুন, মিসেস পার্কার। এতটা ভেঙে পড়লে তো চলবে না।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল জেনিফার। 'যোশুয়া...তেমন খারাপ কিছু হয়নি তো ওর?'

'এখনও আমরা জানি না,' পেন্সিল দিয়ে টেবিলের ওপর ঠুকঠুক শব্দ করলেন ডাক্তার। 'কিছু তথ্য দরকার আমার। বয়স কত আপনার ছেলের?'

'মাত্র ছয়।' 'মাত্র' শব্দটা কেন যে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বুঝতেই পারল না জেনিফার।

'কোথাও ব্যথা-ট্যাথা পেয়েছিল নাকি গত কিছুদিনের মধ্যে?'

লা কোঞ্চা বিচের সেই দৃশ্যটা জেনিফারের চোখের সামনে ভেসে উঠল— পেছন ফিরে হাত নাড়তে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল যোশুয়া, তলিয়ে গেল ঢেউয়ের নিচে।

'ও..ওয়াটার স্কি করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। মাথার পেছনদিকে ব্যথা পেয়েছিল।'

নোট নিলেন ডাক্তার। 'কতদিন আগে?'

'এই তো মাত্র ক'দিন আগে,' হিসেব গুলিয়ে গেল জেনিফারের, কিছুতেই মনে করতে পারল না ঠিক ক'দিন আগে ব্যথা পেয়েছিল যোশুয়া।

'অ্যাকসিডেন্টের পর ঠিক ছিল?'

'হ্যাঁ। একদম ঠিক ছিল। শুধু মাথার পেছনদিকে একটু ফুলে উঠেছিল...এছাড়া সবকিছু ঠিক ছিল।'

'স্মরণশক্তির দুর্বলতা টের পেয়েছিলেন গত ক'দিনে? এই যেমন সাধারণ কিছু ভুলে গিয়েছিল কিনা?'

'না,' জোরে মাথা নাড়ল জেনিফার।

'ওর আচরণে কিংবা শরীরে কোনো পরিবর্তন দেখেছিলেন?'

'না!'

লেখা থামিয়ে ওর দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'একটা এক্সরে করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। একটা ক্যাট স্ক্যান করতে হবে।'

'একটা...কী?'

'এটা ইংল্যান্ড থেকে আনা নতুন একটা কম্পিউটারাইজড্ মেশিন, এতে ব্রেনের ভেতরের ছবি নেয়া হয়। এছাড়াও আরও কিছু টেস্ট করতে হবে। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'যদি...যদি,' তোতলাতে থাকল জেনিফার। 'যদি একান্তই দরকার মনে করেন তাহলে তো করতেই হবে। কিন্তু ও ব্যথা পাবে না তো?'

'না না। একটা স্পাইনাল পাঙ্কচারেরও প্রয়োজন হবে।'

মেরুদণ্ডে সুঁই ফোটাবে? আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জেনিফার। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা বুঝতে পারলেন ডাক্তার। আশ্বস্ত করলেন ওকে। 'না না, ভয় পাবেন না, মিস পার্কার। ও কিচ্ছু টের পাবে না।'

'কী হয়েছে আমার ছেলের, ডাক্তার?' নিজের গলার স্বর চিনতে পারল না জেনিফার।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তার। 'আন্দাজে ভবিষ্যদ্বাণী করা কোনো ডাক্তারেরই উচিত নয়। দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু জেনে যাব আমরা,' গলার স্বর পাল্টালেন তিনি। 'আপনার ছেলের জ্ঞান ফিরে এসেছে। কথা বলতে চান?'

নার্সের পেছন পেছন যোশুয়াকে যে রুমে রাখা হয়েছে সেখানে এল জেনিফার।

পাণ্ডুর মুখে শুয়ে আছে যোশুয়া। মনে হচ্ছে এই অল্পসময়েই শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে

গেছে। জেনিফার ঢুকতেই ওর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'মাম্মি!'

'আমার সোনা!' ছুটে গিয়ে পাশে বসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল জেনিফার ওর ছোট্ট শরীরটা। 'কেমন লাগছে তোমার? সব ঠিক আছে তো?'

হাই তুলল যোশুয়া। 'কেমন কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে যেন আমি অন্য কোথাও আছি, এখানে নেই।'

ওর কপালে চুমু খেল জেনিফার। 'আমার লক্ষ্মী সোনা, তুমি তো এখানে আমার কাছেই আছ।'

'কিন্তু মাম্মি, আমি সবকিছু দুটো করে দেখতে পাচ্ছি। এমনকি তোমাকেও।'

চমকে উঠল জেনিফার। ডাবল ভিশন! ওর ডান হাতটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। 'ডাক্তারকে একথা বলেছ?'

'হুঁ। ডাক্তারও দুটো হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা মাম্মি, ডাক্তার দুটো বিল পাঠাবে না তো?' বলে শব্দ করে হেসে উঠল যোশুয়া।

হেসে ওর চুল এলোমেলো করে দিল জেনিফার। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। কী ক্লান্ত দেখাচ্ছে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেটাকে!

'মাম্মি!'

'কী বাবা?'

'তুমি আমাকে মরে যেতে দেবে না তো?'

চোখের সামনে পৃথিবী এলোমেলো হয়ে গেল জেনিফারের। দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। 'না সোনা, না। কেন তুমি মরতে যাবে? ডাক্তাররা দুদিনেই তোমাকে ভালো করে তুলবেন। তখন বাসায় চলে যাব আমরা।'

দুমিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল যোশুয়া। ডক্টর মরিস সাদা জ্যাকেট পরা দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে রুমে ঢুকলেন।

'এখনই টেস্টগুলো শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।'

যোশুয়াকে ট্রলিতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। চুপচাপ বসে বসে দেখল জেনিফার। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওর শরীরের সব শক্তি শুষে নিয়েছে। সাদা দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে রইল জেনিফার। নিশ্চল।

কানের কাছে কে যেন ডাকল ওকে, 'মিসেস পার্কার!'

চোখ তুলে দেখল, ডক্টর মরিস। বিরক্ত হল ও। 'কী ব্যাপার, ডাক্তার? এখনও টেস্ট শুরু করেননি?'

অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন ডাক্তার। 'টেস্ট শেষ হয়ে গেছে।'

চমকে ঘড়ির দিকে তাকাল জেনিফার। যোশুয়াকে নিয়ে যাবার পর দুঘণ্টা কেটে গেছে! কেমন করে? কখন?

জিজ্ঞাসু চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল জেনিফার। কোনোকিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিছু জিজ্ঞেস করবে, সে সাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না।

অবশেষে ডাক্তারই নীরবতা ভাঙলেন। 'আপনার ছেলে সাবডুরাল হেমাটোমাতে ভুগছে,' জেনিফারের চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'আঘাতটা ওর মগজের ঝিল্লিতে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে!'

মুখের ভেতরটা যেন একেবারে শুকিয়ে গেল জেনিফারের। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না।

অনেক কষ্টে অবশেষে বলতে পারল, 'মানে...এখন কি করতে হবে...'

সোজা ওর চোখের দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে। আপনার অনুমতি প্রয়োজন।'

ডাক্তার কি ওর সঙ্গে মজা করছে? এক্ষুনি নিশ্চয়ই হা হা করে হেসে উঠবেন তিনি, 'কেমন ভয় দেখালাম, মিসেস পার্কার? আপনার ছেলে তো সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সময় নষ্ট করেছেন বলে একটু শাস্তি দিলাম আর কী! শুধু বেশিরকম ঘুমোচ্ছে, আর কোনো সমস্যা নেই। কেন যে শুধু শুধু বিরক্ত করেন আমাদের!'

কিন্তু বাস্তবে ডাক্তারের মুখ থেকে বেরিয়ে এল অন্য কথা। 'সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে আপনার, অপারেশনের ধকল সইতে পারবে বলে মনে হয়। অপারেশন সফল হবে, নিঃসন্দেহে আশা করা যায়।'

অসহ্য রাগ হল জেনিফারের। এই লোকটা ওর ছেলের মগজের মধ্যে ছুরি চালাতে চাচ্ছে, যাকে বহু যত্নে নয়টি মাস নিজের গর্ভে বড় করেছে জেনিফার। ছয়টি বছর যাকে বুকে করে রেখেছে! ওর ছোট্ট মগজটা ছিন্নভিন্ন হবে ছুরির খোঁচায়! কিছুতেই না!

'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল জেনিফার।

'আপনি কি অপারেশনের অনুমতি দিতে চাচ্ছেন না?' বিস্মিত হলেন ডাক্তার।

'আমি...মানে...' ঢোক গিলল জেনিফার। 'অপারেশন না করলে কী হবে?'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে সে। বাচ্চার বাবা কোথায় আছেন? তাঁকে খবর দিন।'

অ্যাডাম! যে-কোনোকিছুর বিনিময়ে ওকে যদি এ-মুহূর্তে কাছে পেত! ওর শক্ত বাহুর নিরাপত্তা হয়তো এ-সময়ে দিতে পারত একটুখানি আশ্বাস।

'না,' লম্বা করে শ্বাস টানল জেনিফার। 'ওর বাবা শহরে নেই, বাইরে গেছেন। আমিই অনুমতি দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন, ডাক্তার, আমি আমার ছেলেকে

ফিরে পেতে চাই।'

ডাক্তার একটা ফর্ম ফিল-আপ করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'এখানে একটা সাইন লাগবে।'

একবার ফর্মটা না পড়ে সাইন করে দিল জেনিফার। 'কতক্ষণ লাগবে?'

'যতক্ষণ না খুলতে...মানে অপারেশন শুরু না করছি, কিছুই বলতে পারছি না। আপনি কি এখানেই অপেক্ষা করবেন?

'না!' চেঁচিয়ে উঠল জেনিফার। মনে হচ্ছে, ধবধবে সাদা দেয়ালগুলো চারদিক থেকে চেপে আসছে ওর দিকে, নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু বাতাস দরকার। 'আপনাদের হাসপাতালে প্রার্থনা করার কোনো জায়গা নেই?'

ছোট্ট একটা চ্যাপেল। দেয়ালের চারদিকে যিশুর পেইন্টিং। জেনিফার চাড় রুমটায় আর কেউ নেই। এক কোণে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও। কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়, কিছুতেই তা মনে পড়ছে না। কেউ ওকে শেখায়ওনি কখনও।

মনটাকে শান্ত করল জেনিফার। যীশুর ছবিগুলোর দিকে একবার তাকাল।

তারপর চোখ বন্ধ করে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করল জেনিফার। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে...কেন আকাপুলকোতে নিয়ে গিয়েছিল যোশুয়াকে...ভাবছে ও–কেন ওকে স্কি করতে দিলাম? কেন ঐ মেক্সিকান হাতুড়ে ডাক্তারটার কথা বিশ্বাস করলাম? মনে মনে বলল গড, তুমি যা চাও সব দেব, শুধু আমার ছেলেটাকে ভালো করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, গড বলে সত্যিই কেউ আছেন কি? যদি থাকতেন, তাহলে যোশুয়ার মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে কেমন করে এতবড় শাস্তি তিনি দিলেন, যে ছেলেটা কখনও একটা মাছিকেও আঘাত করেনি! ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা শিশুকে কীভাবে তিনি এ অবস্থায় ফেলতে পারেন!

আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, ডাক্তার তো বলেছেন, যোশুয়া অপারেশনের জন্যে ফিট আছে। তাহলে অপারেশন কেন আনসাকসেসফুল হবে?

ঈশ্বর, সবকিছু ঠিক করে দাও। কেন ঠিক হবে না? একশোবার ঠিক হবে। যোশুয়া একটু ভালো হয়ে উঠলেই ওকে নিয়ে প্যারিসে যাবে।

ধীরে ধীরে সমস্ত চিন্তাশক্তি লোপ পেল জেনিফারের। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে।

অনেক...অনেকক্ষণ পর কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখল।

পেছন ফিরে তাকাল জেনিফার। ডক্টর মরিস দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের দিকে চাইল সে! কোনো প্রশ্ন করার দরকার হল না। কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল জেনিফার। অজ্ঞান।

আটাশ

একটা সরু লোহার টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে যোশুয়াকে। নিথর নিস্পন্দ শরীর। বরফের মতো ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে যেন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। কতদিন যোশুয়ার বিছানায় বসে বসে প্রাণভরে দেখেছে ওর ঘুমন্ত অবয়ব, আদর করে চুমু খেয়েছে কপালে, কম্বল দিয়ে ডেকে দিয়েছে ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাওয়া শরীর।

অথচ আজ কত ঠাণ্ডা হয়ে আছে ওর সমস্ত শরীর! আর কখনও তা গরম হবে না। উজ্জ্বল চোখ মেলে আর কোনোদিন তাকাবে না ও, মিষ্টি করে হাসবে না, ছোট্ট দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে না মায়ের গলা।

ডাক্তারের দিকে ফিরল জেনিফার। 'একটা কম্বল দিয়ে ওকে ঢেকে দিন। ঠাণ্ডা একদম সহ্য করতে পারে না ও।'

'ও তো...' জেনিফারের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে গেলেন ডাক্তার। 'অবশ্যই, মিসেস পার্কার,' নার্সের দিকে ফিরলেন তিনি। 'একটা কম্বল নিয়ে এসো।'

ঘরের মধ্যে ডজনখানেক লোক রয়েছে। কিন্তু কারও কোনো কথা কানে ঢুকছে না জেনিফারের। মনে হচ্ছে যেন একটা সাউন্ডপ্রুফ কাচের জারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ও।

কেউ ওর বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিতেই সচেতন হয়ে উঠল জেনিফার। সঙ্গে সঙ্গে শব্দময় হয়ে উঠল সারা ঘর।

ডাক্তার ওর কানের কাছে চিৎকার করছেন, 'পোস্টমের্টেম করতে হবে। আপনার অনুমতি...'

দুচোখ জ্বলে উঠল জেনিফারের। 'খবরদার! আমার ছেলের শরীরে আবার যদি ছুরি চালাতে যান, খুন করব আমি আপনাকে!'

একজন নার্স ওকে ধরে অন্য রুমে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু নড়ল না জেনিফার। 'যোশুয়াকে একা রেখে কোথাও যাব না আমি। যদি কেউ রুমের লাইট নিবিয়ে দেয়, ও ভয় পাবে। অন্ধকার একেবারেই পছন্দ করে না আমার ছেলে।'

কে যেন ওর বাঁ হাতটা টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে সুঁইয়ের খোঁচা অনুভব করল ও। একটু পরে একধরনের আরামদায়ক উষ্ণতা ঘিরে ধরল ওকে।

ঘুমিয়ে পড়ল জেনিফার।

যখন জাগল, বিকেল হয়ে গেছে। কেউ ওর কাপড় পাল্টে হাসপাতালের গাউন পরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়।

উঠে নিজের কাপড় পরে নিল জেনিফার। সোজা ডক্টর মরিসের রুমে গেল।

ওকে দেখে হাসলেন ডাক্তার। 'একটু ভালো বোধ করছেন তো? কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আমরাই আপনার হয়ে ফিউনারেলের সব ব্যবস্থা সেরে রেখেছি। আপনি শুধু শুধু...'

'সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার,' শীতল দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাল জেনিফার।

পরের দুদিন জেনিফার ব্যস্ত রইল যোশুয়ার শেষ শয্যার জন্যে জায়গা নির্বাচনের কাজে। শহরের বাইরে সাগরতীরের এক নিরিবিলি গ্রেভইয়ার্ড পছন্দ হল ওর, যোশুয়া এখানে ভালোই থাকবে। সাটিনের লাইনিং দেয়া সাদা একটা কফিন বাছল। এই দুদিন একফোঁটা চোখের জল ফেলল না, পুতুলের মতো কাজ করে গেল। মনে হচ্ছে কেউ যেন কাজগুলো ওকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। আন্ডারটেকারের অফিস থেকে বেরোবার সময় লোকটা ওকে ডেকে বলল, 'কবর দেবার সময় যদি ছেলেকে বিশেষ কোনো পোশাক পরিয়ে দিতে চান এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা ওকে রেডি করে দেব।'

অবাক হয়ে গেল লোকটা। ভদ্রমহিলা কী জানেন যে দুদিন আগের মরা মানুষকে পোশাক পরানো কী কঠিন কাজ!

নিজে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরল জেনিফার। মিসেস ম্যাকি রান্নাঘরে বসে কাঁদছিলেন। জেনিফারকে দেখে ছুটে এলেন, 'ওহ্ মিসেস পার্কার...'

তাঁর দিকে একবারও না-তাকিয়ে দোতলায় যোশুয়ার ঘরে উঠে এল জেনিফার। সবকিছু ঠিক আগের মতোই আছে। বইপত্র, খেলনা, স্কি— সবকিছু যেন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। শুধু যোশুয়াই নেই।

ক্লজেট খুলল জেনিফার। গত জন্মদিনে দেয়া গাঢ় নীল সুট, জিনস টি-শার্ট গেঞ্জি শর্টস— সবকিছু গুছিয়ে রাখা আছে ড্রয়ারে। যোশুয়া খুব গোছানো প্রকৃতির ছেলে।

মিসেস ম্যাকি ওর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। 'আপনি ঠিক আছেন তো মিসেস পার্কার?'

'হুঁ। আমি ঠিকই আছি। ধন্যবাদ, মিসেস ম্যাকি।'

'কিছু খুঁজছেন? আমার সাহায্য দরকার?'

'না না। আমি যোশুয়াকে পরাবার জন্যে একটা সুন্দর পোশাক খুঁজছি। আপনার

কি মনে হয়, কোনো পোশাকটা ও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত?'

ওর ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন মিসেস ম্যাকি। 'আপনি বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিন, মিসেস পার্কার। আমি এক্ষুনি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।'

কোনো কথা না বলে জেনিফার হ্যাঙ্গারে ঝোলানো যোশুয়ার পোশাকগুলো টেনে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখল। একটু ভেবে নিয়ে ওর বেসবল ইউনিফর্মটা তুলে নিল হাতে। 'এই পোশাকটাই ও সবচেয়ে বেশি পরত, তাই না? আচ্ছা, আর কী কী দরকার হবে ওর বলুন তো?'

মিসেস ম্যাকের অবাক চোখের সামনে জেনিফার ড্রেসারের ভেতর থেকে আন্ডারওয়্যার, মোজা আর সাদা শার্ট বেছে নিল। এগুলো সবই যোশুয়ার দরকার হবে। ও যে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে! লম্বা একটা ছুটি।

বিরাট একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে যোশুয়াকে। টেবিলটা এতই বড় যে যোশুয়ার ছোট্ট দেহটাকে আরও ছোট মনে হচ্ছে।

জেনিফার যোশুয়ার পোশাকগুলো নিয়ে এলে মরচুয়ারির লোকটি আবার শুরু করল, 'দেখুন মিসেস পার্কার, আমরা ডক্টর মরিসের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলেছি। দায়িত্বটা আমাদেরকে দিলেই ভালো হত। আমরা এতে...

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেনিফার। বেরিয়ে যান!'

ঢোক গিলল লোকটা। 'ঠিক আছে, মিসেস পার্কার। আপনি যা ভালো মনে করেন।'

বেরিয়ে গেল সে জেনিফারকে একা রেখে। যোশুয়ার দিকে ফিরল জেনিফার। কী সুন্দর শান্তিতে ঘুমোচ্ছে! চাদর সরিয়ে উলঙ্গ শরীরটায় মমতার হাত বোলাল। ধীরে ধীরে পোশাক পরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মার্বেল পাথরের মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা শরীরটা। মনে হচ্ছে যেন যোশুয়া নয়, যোশুয়ার মূর্তি। বহুকষ্টে শর্টস পরাল, ট্রাউজার পরাল। শার্ট পরাবার সময় ওর কোল থেকে যোশুয়ার মাথাটা গড়িয়ে পড়ল, ঠকাশ করে বাড়ি খেল শক্ত লোহার টেবিলে। আর্তনাদ করে উঠল জেনিফার, 'উহ্! ব্যথা পাওনি তো, সোনা? আমি ইচ্ছে করে করিনি, হঠাৎ পড়ে গেছে!' কাঁদতে শুরু করল ও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে।

তিন ঘণ্টা লাগল যোশুয়াকে সাজাতে। বেসবল ইউনিফর্ম, প্রিয় শার্ট সাদা মোজা আর স্নিকার পরে আছে ও। বেসবল ক্যাপটা মুখের অর্ধেকটাই ঢেকে দিচ্ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত ওটা যোশুয়ার বুকের ওপর রেখে দিল জেনিফার।

আন্ডারটেকার যখন ঢুকল, জেনিফার তখন যোশুয়ার হাত ধরে কথা বলছে ওর·

সঙ্গে। ভদ্রলোক ওর কানের কাছে আস্তে খুকখুক করে কাশলেন। 'এখন থেকে ওর দায়িত্ব আমাদের।'

শেষবারের মতো চোখ ভরে দেখে নিল জেনিফার ছেলেকে। 'দয়া করে ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। জানেন তো মাথার পেছনদিকে ব্যথা পেয়েছে।'

কবর দেবার সময় জেনিফার আর মিসেস ম্যাকি ছাড়া কেউ উপস্থিত ছিল না। একবার ভেবেছিল মোরেত্তিকে খবর দেবে। কিন্তু মন থেকে সায় পায়নি। ওর জীবনটা তিনটে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। অ্যাডাম, যোশুয়া আর মোরেত্তি। এই তিনটে অংশকে পরস্পরের থেকে সযত্নে আলাদা করে রেখেছে এতদিন। অ্যাডামকে প্রথমেই হারিয়েছে, যোশুয়া চলে গেল। রইল মোরেত্তি। বন্ধু বলতে ঐ একজনই।

মিসেস ম্যাকি জেনিফারের ঠাণ্ডা হয়ে আসা হাত ধরে টানলেন, 'চলুন, আপনাকে বাসায় যেতে হবে।'

বৃদ্ধার দিকে চাইল জেনিফার, শীতল কণ্ঠে বলল, 'আমি তো ঠিকই আছি। আমার বা যোশুয়ার কারোরই আর আপনাকে দরকার হবে না, মিসেস ম্যাকি। আপনাকে এক বছরের পুরো বেতন আর ভালো কাজ করার জন্যে সার্টিফিকেট দেব। অন্য কোথাও কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। যোশুয়া এবং আমি দুজনেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক করেছেন আপনি আমাদের জন্যে।'

মিসেস ম্যাকি হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, চোখে রাজ্যের বিস্ময়। তাঁর দিকে একবারও না তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল জেনিফার গাড়ির দিকে।

ঘরে ফিরে সদর দরজা লক করে যোশুয়ার ঘরে চলে এল জেনিফার। দরজা বন্ধ করে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। চারদিকে তাকাল দিশেহারার মতো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যোশুয়ার ব্যবহার-করা প্রিয় জিনিসগুলো। জেনিফারের মনে হল, এটাই ওর পৃথিবী। বাইরের সবকিছু অলীক, মিথ্যে।

সিনেমার মতো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে জন্মের পর চিৎকার করে কাঁদছে ছোট্ট যোশুয়া...হামাগুড়ি দিচ্ছে...আধো আধো কথা বলছে...টলতে টলতে হাঁটছে...আকাপুলকো! উল্টে পড়ছে যোশুয়া পানির মধ্যে, মাথা ঠুকে গেছে স্কি-তে। আকাপুলকো! ওয়ার্নারের সঙ্গে আবার যেখানে দেখা হয়েছিল ওর! শরীর নিয়ে মাতামাতি করেছিল সেই আগের মতো। শাস্তি! হ্যাঁ, খোদা ওকে ওর পাপের শাস্তি দিয়েছেন।

চিরদিনের জন্যে নরকবাস ঘটেছে ওর। এটাই ওর নরক।

সময়ের হিসেব গুলিয়ে গেল জেনিফারের। পড়ে রইল বন্ধঘরে। ক্ষুৎপিপাসা ভুলে গেল। যোশুয়ার স্মৃতিই সত্যি হয়ে রইল কেবল।

তিনটে দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন দরজায় বেল বাজাল কেউ। কানে গেল শব্দটা, কিন্তু মস্তিষ্কে পৌঁছুল না। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিল, চেঁচিয়ে জেনিফারের নাম ধরে

ডাকল লোকটা। বিরক্তিতে ভরে গেল জেনিফারের মন। কেন ওকে জ্বালাতে এসেছে লোকটা? কে সে? কেন ওকে একা থাকতে দিচ্ছে না!

অস্পষ্টভাবে কানে এল জানালার কাচ ভাঙার শব্দ। একটু পরেই কে যেন ধাক্কা দিল যোশুয়ার রুমের দরজায়। তবুও জেনিফারের কোনো প্রতিক্রিয়া হল না।

একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দরজা। অ্যান্টোনিও মোরেট্টি লাফ দিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতরে। জেনিফারের অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠল, 'জেসাস ক্রাইস্ট!'

চিনতে পারল না ওকে জেনিফার। বিরক্ত হয়ে বহুকষ্টে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো।

মোরেট্টিকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হল জেনিফারের সঙ্গে। তবু জোর করে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি মারতে লাগল ওকে জেনিফার। আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে দিল ওর সারা শরীর। নিক ভিটো নিচে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছিল। দুজন মিলে বহুকষ্টে টেনে-হিঁচড়ে ওকে গাড়ির পেছনের সিটে তুলল।

জেনিফার কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এই দুটো গুণ্ডা কেন ওর সঙ্গে এমন করছে! কেন ওকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাচ্ছে যোশুয়ার কাছ থেকে!

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদেরকে বাধা দেবার চেষ্টা করল জেনিফার। অবশেষে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মোরেট্টির কোলে।

সুন্দর এক রোদেলা সকালে ঘুম ভাঙল জেনিফারের। পরিষ্কার ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে আছে ও চাদরের তলায়। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের সারবাঁধা পাহাড়, লেকের নীল জল টলটল করছে তরল রুপোর মতো। বিছানার পাশেই চেয়ারে বসে আছে ফুটফুটে সুন্দর একজন নার্স।

হাসল মেয়েটি। 'কেমন আছেন, মিস পার্কার?'

'আমি কোথায়?'

কথা বলার চেষ্টা করতে গলার ভেতর ব্যথা পেল জেনিফার।

'বন্ধুদের মাঝেই। মিস্টার মোরেট্টি আপনাকে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আপনার জ্ঞান ফিরেছে শুনলে আশ্বস্ত হবেন।'

খবর দেবার জন্যে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যেতে লাগল জেনিফারের। দাঁতে দাঁত চাপল সে। জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইল সব চিন্তা। ও কি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল?

মোরেট্টি ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। অ্যাডাম নয়। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল জেনিফারের। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হল মোরেট্টিকে।

মাথার কাছে পায়ের শব্দ পেল জেনিফার। তাকাল। মোরেট্টি অবাক চোখে চেয়ে

আছে ওর দিকে। নিচু হয়ে ওর কপালে হাত রাখল। 'কেন আমাকে জানাওনি, জেনিফার?'

মোরেত্তির ডান হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরল জেনিফার। 'ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলে তুমি। আমি..পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আসলেই তাই,' ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল মোরেত্তি।

'ক'দিন ধরে এখানে আছি আমি, মাইকেল?'

'চারদিন। নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়েছে তোমাকে এ ক'দিন।'

লজ্জা পেল জেনিফার। নিশ্চয়ই হইচই কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল ও। 'আমি দুঃখিত, মাইকেল।'

হাসল মোরেত্তি। ওর হাতে মৃদু চাপ দিল।

পাশ ফিরতে চেষ্টা করল জেনিফার। কিন্তু মনে হল, শরীরে একবিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

'ব্রেকফাস্ট আসছে। ডাক্তার বলেছে গলা পর্যন্ত খাইয়ে মোটাতাজা করতে হবে তোমাকে,' হাসতে হাসতে বলল মোরেত্তি।

'না না, কিচ্ছু খেতে পারব না আমি। খাবার রুচি নেই।

'খেতেই হবে তোমাকে।'

নার্স মেয়েটি ট্রে-ভর্তি খাবার নিয়ে এল। আধাসেদ্ধ ডিম, টোস্ট, কর্নফ্লেক্স, কলা আর চা। অবাক হল জেনিফার, কারণ বুঝতে পারল ভীষণ খিদে পেয়েছে ওর। অথচ এতক্ষণ টেরই পায়নি কিচ্ছু।

মোরেত্তি নিজের হাতে যত্ন করে খাইয়ে দিলেন ওকে। আনচান করে উঠল জেনিফারের মন। মনে হল, কোনোদিন কেউ ওকে এমন আদর করে খাইয়ে দেয়নি। দাদীর কথা মনে পড়ল। আদরের ঐ একটি জায়গাই ছিল ওর, কিন্তু অনেক আগে সেটা ত্যাগ করেছে ও নিজেই। যার জন্যে সবকিছু ছেড়েছিল, সে-ই তো চলে গেল ওকে ছেড়ে। আচ্ছা, দেশে ফিরে যাওয়া যায় না এখন? আর তো কোনো বাঁধন নেই ওর!

কিন্তু মোরেত্তি! মাফিয়ার বিশাল সংগঠন!

মুক্তি নেই! মুক্তি নেই!

টিস্যুপেপার দিয়ে জেনিফারের ঠোঁট মুছে দিল মোরেত্তি। বাসনপত্রসহ ট্রে-টা সরিয়ে রাখল। 'আমাকে এক্ষুনি একবার নিউইয়র্কে যেতে হবে। ফিরতে দিন পাঁচেক দেরি হবে। একা একা থাকতে কষ্ট হবে না তো?'

মাথা নাড়ল জেনিফার।

'আমি চাই, তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। মনে থাকবে?' ঝুঁকে পড়ে জেনিফারের কপালে চুমু খেল মোরেত্তি!

উনত্রিশ

ইউএস মেরিন কোর বেইসের কনফারেন্স রুমটিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। দরজার বাইরে প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড। ভেতরেও। একটা লম্বা মেহগনি কাঠের চকচকে টেবিলের একপাশে সার বেঁধে বসেছেন অ্যাডাম ওয়ার্নার, রবার্ট ডি সিলভা এবং এফ.বি.আই-এর অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর। উল্টোদিকে মাথা নিচু করে বসে আছেন সাবেক কনসিলিয়ারি কোলফ্যাক্স।

বেইশ বসে ইন্টাররোগেশন করার আইডিয়াটা ওয়ার্নারের। 'একমাত্র এখানেই কোলফ্যাক্সের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া যায়।'

উপরে মহলের সবাই মেনে নিয়েছিলেন তাঁর যুক্তি। কোলফ্যাক্সকে শহরে না নিয়ে জুরিরা সবাই চলে এসেছেন এখানে। এ-ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন সামরিক বেসামরিক অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

ওয়ার্নার শুরু করলেন, 'সবার সামনে আপনার পরিচয়টা দেবেন কি?'

'আমার নাম টমাস কোলফ্যাক্স।'

'পেশা?'

'আমি একজন অ্যাটর্নি। নিউইয়র্কে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স আছে। তবে অন্য স্টেটেও প্র্যাকটিস করতে বাধা নেই।'

'কত বছর ধরে এ-পেশায় রয়েছেন?'

'পঁয়ত্রিশ বছরেরও বেশি।'

'আপনি কী জেনারেল প্র্যাকটিস করেন?'

'না, স্যার। আমার ক্লায়েন্ট একজনই।'

'নাম কি তার?'

'এই পঁয়ত্রিশ বছরের বেশিরভাগ সময়েই আমি কাজ করেছি গডফাদার অ্যান্টোনিও গ্রানেল্লির জন্যে। সম্প্রতি মারা গিয়েছেন তিনি। মাইকেল মোরেত্তি তাঁর জায়গা নিয়েছে। আমি এখন কাজ করছি মাইকেল মোরেত্তিও আর তার অর্গানাইজেশনের জন্যে।'

'আপনি কি মাফিয়ার অর্গানাইজড ক্রাইমের কথা বলছেন?'

'জ্বী, স্যার।'

'এত বছর ধরে যখন ওদের কাজ করছেন তখন প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে আপনি ওদের অন্ধিসন্ধি সবই জানেন।'

'অর্গানাইজেশনে এমন কিছু কখনোই ঘটে না যা আমি জানি না।'

'আপনি কি অপরাধমূলক কাজের কথা বলছেন?'

'অবশ্যই সিনেটর।'

'সেসব অপরাধের কিছু কিছু বর্ণনা দিতে পারেন?'

পরের দু-ঘণ্টা কোলফ্যাক্স একাই কথা বলে গেলেন। বলিষ্ঠ, শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। আগের নার্ভাসনেস কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ফিরে পেয়েছেন হৃত ব্যক্তিত্ব।

একের-পর-এক গুরুত্বপূর্ণ লোকের নাম, জায়গা, তারিখের উল্লেখ করে গেলেন তিনি নির্দ্বিধায়। ভয়ংকর সব অপরাধের কথা শোনালেন। মাফিয়ার প্রতিহিংসা নেবার নিজস্ব প্রক্রিয়া বর্ণনা করলেন। তাদের অদ্ভুত হিংস্রতার কথা শোনালেন, যুক্তির্তক দিয়ে যার বিচার করা যায় না।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন জুরিয়া। অপরাধের সাক্ষীদের কী নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, বা ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে, কিংবা সামান্য সন্দেহের কারণে কীভাবে মেরে ফেলা হয়েছে নিজেদেরই লোককে— শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল উপস্থিত সবার। এই প্রথমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে বড় অপরাধ-সংগঠনের স্বরূপ উন্মোচিত হল।

ওয়ার্নার আর সিলভা মাঝে মাঝে তাঁকে থামিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন। এতবড় সৌভাগ্য নিজের থেকে হাতের মুঠোয় এসে পড়ায় ঠিক বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না। সোনার খনি আবিষ্কার হলেও যেন এত খুশি হতে পারত না কেউ।

জুরিদের একজন একটা সাড়া-জাগানো ঘুসের মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন কোলফ্যাক্সকে। তখনই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেল। ওয়ার্নার এই বিপদের কথাটা একবারও চিন্তা করেনি।

জুরির প্রশ্নের জবাবে ধীরেসুস্থে বলতে শুরু করলেন কোলফ্যাক্স 'ঘটনাটা ঘটেছিল বছরদুই আগে। তখন থেকেই মাইকেল আমাকে কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে শুরু করে। ঐ মামলাটা করেছিল জেনিফার পার্কার।'

আকাশ ভেঙে পড়ল ওয়ার্নারের মাথায়।

উল্লাসে ফেটে পড়লেন রবার্ট ডি সিলভা। 'জেনিফার পার্কার?

'জ্বী, স্যার,' ঘৃণা ফুটল কোলফ্যাক্সের কণ্ঠে। 'সে এখন অর্গানাইজেশনের কাউন্সেলর।'

ওয়ার্নারের প্রচণ্ড ইচ্ছে হল কোলফ্যাক্সের মুখ চেপে ধরে।

'মেয়েটি সম্পর্কে যা জানেন, খুলে বলুন,' খুশি-খুশি ভাব সিলভারের চোখেমুখে।

বলতে শুরু করলেন কোলফ্যাক্স। 'আমাদের সব বড় বড় ব্যবসাই এখন ওর প্ল্যানমতো চলে। সবকিছুর সঙ্গেই ও জড়িত। সুদের ব্যবসা, জুয়া...'

ওয়ার্নার থামাতে চাইল, 'এসব ব্যাপার...'

'...খুন।'

শব্দটা সারা ঘরে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ল। হাঁ হয়ে চেয়ে রইল ওয়ার্নার। খুন! কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। তীর ছুটে গেছে হাত থেকে। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হল— এ আশঙ্কার কথা আগে কেন মনে পড়েনি!

নিস্তব্ধতা ভাঙল ওয়ার্নারই। 'দেখুন, মিস্টার কোলফ্যাক্স, প্রমাণ ছাড়া কোনো বক্তব্যই ধোপে টিকবে না। আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছেন না যে মিস জেনিফার পার্কার খুন করেছে?'

'ঠিক সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি। খুন করা আর খুন করানো— দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আর কতটুকু? জেনিফার পার্কার ছেলের কিডন্যাপারকে খুন করার আদেশ দিয়েছিল অ্যান্টোনিওকে। লোকটির নাম ফ্র্যাঙ্ক জ্যাকসন। জেনিফারের আদেশেই তাকে গুলি করে মারে অ্যান্টোনিও।'

গুঞ্জন উঠল চারদিক থেকে।

জেনিফারের ছেলে! ওয়ার্নার ভাবতে চেষ্টা করল— নিশ্চয়ই কোথাও বড়রকমের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জেনিফারের ছেলে আসবে কোথা থেকে? বিয়েই তো করেনি ও।

তোতলাতে শুরু করল ওয়ার্নার, 'আমি মনে করি, মানে...ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া...'

'প্রমাণ ছাড়া!' অবাক হলেন কোলফ্যাক্স। 'জেনিফার যখন মাইকেলকে ফোন করেছিল, সে-মুহূর্তে আমি মাইকেলের সঙ্গে ছিলাম।'

ঘাম বেরিয়ে এল ওয়ার্নারের কপালে। অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারল 'সাক্ষীকে এ-মুহূর্তে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আজ এ-পর্যন্তই থাক।'

বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলেন কোলফ্যাক্স।

ত্রিশ

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আন্ডার কভার অপারেশন শুরু হতে যাচ্ছে।

ফেডারেল স্ট্রাইক কোর্স, এফ.বি.আই. পোস্টাল এবং কাস্টমস সার্ভিসেস, অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিভাগ, ফেডারেল ব্যুরো অভ নারকোটিক্স এবং আরও আধাডজন এজেন্সি একই সঙ্গে আদাজল খেয়ে লাগল মাফিয়া-পরিবারের পেছনে।

শুধু মাইকেল মোরেট্টির পরিবারই নয়, ঝড় বয়ে গেল অন্য সব পরিবারেও।

ম্যাজিক-বক্সের চাবি তুলে দিয়েছেন কোলফ্যাক্স সরকারের হাতে— তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়ে গেল দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত।

হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা, ব্ল্যাকমেইল, ডাকাতি, ইনকামট্যাক্স ফাঁকি ইউনিয়ন ফ্রড, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ইত্যাদি বিভিন্নরকম অপরাধের অভিযোগ প্রতিদিন গ্রেফতার হতে লাগল শত শত লোক। নড়ে উঠল অন্ধকার জগতের ভিত।

সিনেট ইনভেস্টিগেশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটতে লাগল ওয়ার্নারের। জর্জটাউনে নিজের বাড়িটিও অফিস হয়ে উঠল, দিনরাত লোকজন আসে। স্টাডিরুম প্রায় কনফারেন্সরুমে পরিণত হল। মাফিয়ার অপরাধ সংগঠনের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারলে অ্যাডাম ওয়ার্নারের সামনের অনেক বাধাই কেটে যাবে। অবধারিতভাবে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে জিতে যাবেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবে তার খুশি হবারই কথা। কিন্তু সব আনন্দ মুছে গেছে তার মন থেকে। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

কোনোভাবে যদি জেনিফারকে সাবধান করে দেয়া যেত! যাতে নিরাপদে কোথাও পালিয়ে যায় সে। এখনও হাতে কিছুটা সময় আছে। আত্মগ্লানিতে ভুগছেন ওয়ার্নার। এতদিন যাকে ভালোবেসে এসেছেন, তাকে নিজের হাতে জেলে ঢোকাতে হবে! কখনোই না! কিছুতেই না!

অথচ সিনেটের প্রতি, দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা রয়েছে তাঁর। অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বা সাহায্য করার অর্থ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। কী করে সেটা করবেন তিনি। তাঁর মতো কঠোর নীতিবান একজন সিনেটর!

যদি কখনও প্রকাশ হয়ে যায় যে ওয়ার্নার জঘন্য এক অপরাধীকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তার পারিবারিক জীবন।

কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মেলাতে পারছেন না তিনি। কোলফ্যাক্সের বক্তব্য অনুসারে ছোট একটা ছেলে আছে জেনিফারের। তা কেমন করে হয়! ক'দিন আগেই আকাপুলকোতে দেখা হয়েছে জেনিফারের সঙ্গে। এ-ধরনের কিছু তো জেনিফার তাকে বলেনি! যদি ছেলে ওর থেকেই থাকে, গোপন করার তো কোনো কারণ নেই!

সিদ্ধান্ত নিল ওয়ার্নার। এ-রহস্যের কিনারা করতে হবে। কথা বলতেই হবে জেনিফারের সঙ্গে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জেনিফারের অফিসের নাম্বার ঘোরালেন তিনি। ও-পাশ থেকে ভেসে এল একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো, কাকে চাইছেন?'

'মিস জেনিফার পার্কারকে লাইনটা দেবেন কি?'

'দুঃখিত, মিস্টার, তিনি এ-মুহূর্তে অফিসে নেই।'

'দেখুন, একটা সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু স্যার, আপনাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছি না আমি', সত্যিই দুঃখিত হল সেক্রেটারি।

'কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে, তা-ও জানেন না?'

'না, স্যার। উনি বলে যাননি। তবে অনেক অ্যাটর্নি রয়েছে আমাদের অফিসে। কোনোরকম সাহায্যের দরকার হলে বলতে পারেন।'

'না, মিস। ধন্যবাদ।'

এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে এ-মুহূর্তে ওয়ার্নারকে সাহায্য করতে পারে।

পরের হপ্তার বহুবার জেনিফারকে টেলিফোন করল ওয়ার্নার। সিনথিয়া প্রতিবারই বলল, 'দুঃখিত, মিস্টার টার্নার, উনি অনেকদিন থেকেই অফিসে আসছেন না।

সেদিন তৃতীয়বারের মতো ফোন করতে গেল ওয়ার্নার। কিন্তু মেরী বেথ ঘরে ঢুকতেই আস্তে করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

মেরী ওর ঘাড়ের পেছনে এসে দাঁড়াল। আঙুল ডুবিয়ে দিল ওয়ার্নারের ঘন চুলের ভেতর। 'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ডার্লিং।'

'কই না তো!'

ওয়ার্নারের উল্টোদিকে একটা সোয়েডের চেয়ারে বসল মেরী। 'সব ঝামেলা একসঙ্গে বেধেছে, তাই না? একে সামনে ইলেকশন, তার ওপর এই মাফিয়া-কেস।'

'আমার যা কর্তব্য, সেটা তো করে যেতেই হবে। চাইলেই তো আর পাশ

কাটাতে পারি না।'

'আশা করি সব ঝামেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এত টেনশনের মধ্যে তোমার খাওয়াদাওয়া, ঘুম সব প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে,' মেরী বেথের গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'এ-তো নতুন কোনো ব্যাপার নয়, মেরী। গত ছয়-সাতটা বছর ধরেই তো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এ-ধরনের জীবনযাপনে,' একটু বিরক্ত হল ওয়ার্নার। 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না, মেরী।'

'কিন্তু চিন্তা না করে কী করব? জেনিফার পার্কারের নাম আছে লিস্টে, তাই না?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ওয়ার্নার। 'কেমন করে তুমি জানলে সেটা?'

শব্দ করে হাসল মেরী। 'বাড়িটাকে তো তুমি ইতিমধ্যেই পাবলিক মিটিং প্লেস বানিয়ে ফেলছ। এখানে যা ঘটে, জানার ইচ্ছে না-থাকলেও কিছুকিছু কানে আসে আমার। আজকাল লক্ষ করছি, সবাই উঠেপড়ে লেগেছে মাইকেল মোরেত্তি আর তার গার্লফ্রেন্ডকে জেলে পুরতে', ওয়ার্নারের দিকে চেয়ে রইল মেরী বেথ, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না ওয়ার্নারের চেহারায়।

মমতায় ভরে গেল মেরীর অন্তর। কী বোকা এই পুরুষমানুষগুলো! জেনিয়ার পার্কার সম্পর্কে ওয়ার্নারের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে মেরী। ব্যবসা কিংবা রাজনীতিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেয় পুরুষমানুষেরা। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে কোথায় যায় তাদের মগজ উপচেপড়া বুদ্ধি! সেজন্যেই বোধহয় বহু বিখ্যাত লোকের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে সস্তা কিছু মেয়েমানুষের কারণে।

জেনিফারও সে ধরনের মেয়ে বলেই মনে করে মেরী বেথ। ওয়ার্নারের আর দোষ কী! প্রলোভনে পড়ে আদমও আপেল খেয়েছিল! ওয়ার্নার তো নেহাতই রক্তমাংসের মানুষ।

তবে নিজের ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস আছে মেরী বেথের। ঠিকসময় ঠিক কাজটা করতে পেরেছিল— এ কথা মনে করে এখনও আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ও কীভাবে মন গলিয়ে অ্যাডামকে সেদিন ওর সঙ্গে শুতে বাধ্য করেছিল, মনে হলে এখনও নিজের বুদ্ধির তরিফ করে মেরী।

তবে যা কিছু সে করেছে, সবই স্বামীর মঙ্গলের জন্যে, এটাই ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

ওয়ার্নারের দিকে চেয়ে খারাপ লাগল মেরীর। একদিনেই কেমন শীর্ণ হয়ে পড়েছে, চোখের কোলে কালি। সব ঝামেলা মিটে গেলে মেয়ে সামান্থাকে হাউসকিপারের কাছে রেখে ওরা দুজনে কোথাও থেকে ঘুরে আসবে— ঠিক করে মেরী। আচ্ছা, তাহিতিতে গেলে কেমন হয়? উঠে জানালার কাছে এল মেরী।

জানালার বাইরে দুজন সিক্রেট সার্ভিসের লোক দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্ত হল মেরী বেথ। এই একটা জিনিস কোনোমতেই সহ্য করতে পারে না ও। ব্যাক্তিগত জীবন বলতে যেন কিছুই নেই। সারাক্ষণ ওদের ওপর চোখ দিয়ে রেখেছে একদল লোক। কিন্তু একই সঙ্গে গর্বিত না হয়েও পারে না সে। ওর স্বামী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, গার্ডদের উপস্থিতি সেটাই মনে করিয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট অ্যাডাম ওয়ার্নার। সবাই তাই বলে।

হোয়াইট হাউসে থাকবার কথা ভাবলেই বাচ্চা মেয়ের মতো খুশি হয়ে ওঠে মেরী বেথের সমস্ত দেহমন। অবসর সময়ে আজকাল একটি চিন্তাই আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে হোয়াইট হাউসের কর্ত্রী হয়ে কীভাবে সময় কাটাবে। ওয়ার্নার যখন ওর মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, সেসময়টা মেরী হোয়াইট হাউসের আসবাবপত্রগুলো এদিক-সেদিক করে সাজাবে। বলতে গেলে এটাই ওর একমাত্র ছবি। ফার্স্টলেডি হবার স্বপ্ন দেখে মেরী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

হোয়াইট হাউসের এমন সব রুম দেখার সৌভাগ্য ওর হয়েছে, যা সাধারণ দর্শনার্থীদের হয় না। প্রায় তিন হাজার বই দিয়ে সাজানো বিরাট লাইব্রেরি, চায়না রুম, ডিপ্লোম্যাটিক রিসেপশন রুম— সবকিছু ছবির মধ্যে ভাসতে থাকে ওর চোখের সামনে। দোতলার সাতটা গেস্ট বেডরুমসহ ফ্যামিলি কোয়ার্টার অপেক্ষা করছে ওর জন্যে— ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে মেরী।

অদূর ভবিষ্যতে ওই ঘরগুলোতেই থাকতে চলেছে ওয়ার্নার আর ও। ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে ওরাও। কী দারুণ ব্যাপার!

মনে মনে আশ্বস্ত হয় মেরী বেথ। যাক, ঐ জেনিফার নামের মেয়েটিকে ঠিকভাবেই কাটাতে পেরেছে ওয়ার্নার। তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যেত ওর ক্যারিয়ারের।

চিন্তিত বিমর্ষ ওয়ার্নারের দিকে নরম চোখে তাকাল মেরী, 'ডার্লিং, তোমার জন্যে এককাপ কফি করে আনি?'

বারণ করতে যাচ্ছিল ওয়ার্নার, কিন্তু হঠাৎ মতো পরিবর্তন করল। 'হুঁ সেটাই চাচ্ছিলাম মনে মনে।'

মেরী কিচেনের দিকে রওনা হতেই রিসিভারটা তুলে নিল ওয়ার্নার। সন্ধে হয়ে গেছে অনেক আগেই। জেনিফারের অফিস নিশ্চয় বন্ধ এখন। কিন্তু তারপরেও আশা ছাড়তে পারে না ওয়ার্নার। অপারেটরের সাড়া পাওয়া গেল।

দ্রুত বলতে থাকল ওয়ার্নার, 'শুনুন এটা খুবই জরুরি ব্যাপার। আমি কদিন ধরেই মিস জেনিফার পার্কারকে খুঁজছি। আমার নাম টার্নার।'

'এক মিনিট ধরুন, দেখি, সাহায্য করতে পারি কিনা, 'একটু পরে আবার কথা

বলে উঠল লোকটা। 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস্টার টার্নার, মিস জেনিফার পার্কার কোথায় আছেন, তা কেউ জানে না। তবে নিশ্চিত উনি বাসায় নেই। আপনি কি কোনো মেসেজ রাখতে চান?'

'না,' ক্রেডল আছড়ে ফেলল ওয়ার্নার রিসিভারটা। হতাশায় মুষড়ে পড়ল।

জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকল ওয়ার্নার। যে গ্রেফতারি পরোয়ানাগুলো ইস্যু করতে হবে, সেগুলো একসঙ্গে ভেসে উঠল চোখের সামনে। তার মধ্যে একটা থাকবে একজন হত্যাকারীর জন্যে। ওপরে লেখা থাকবে জেনিফার পার্কারের নাম।

পাহাড়ের ওপরের ছোট্ট কেবিনটিতে বেশ ভালোই আছে জেনিফার। প্রচুর বিশ্রাম পেয়ে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। গান শুনে, বই পড়ে আর যোশুয়ার কথা চিন্তা করে কেটে যায়। যোশুয়া নেই, কক্ষনো তা ভাবে না ও। মনে হয় যেন স্কুল থেকে ট্রিপে গেছে কোথাও, কদিন পরেই ফিরে আসবে। কখনও দুঃখের স্মৃতি মনে করে না জেনিফার। সেজন্যে একা একা থাকতে খারাপ লাগে না।

প্রতিদিন ভালো ভালো খাবার দেয়া হয় ওকে, মোরেট্টির রাঁধুনি যে উঁচুদরের শিল্পী স্বীকার না করে উপায় নেই।

বিকেলবেলা পাহাড়ী রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে লেকের পাড়ে চলে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে ঘাসের ওপর। 'এই তো বেশ আছি', মনে মনে ভাবে জেনিফার। আগের ব্যস্ত জীবনের কথা মনে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। আকুলিবিকুলি করে ওঠে মনটা নিজের শহরে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু মোরেট্টি!

পাঁচদিন পরে আঁকাবাঁকা পথ ধরে পাহাড়ের নিচ থেকে একটা কালো লিমুজিনকে উঠে আসতে দেখা গেল। মোরেট্টি। দৌড়ে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এল জেনিফার।

গাড়ি থেকে নেমে হাসল মোরেট্টি। 'আগের চেয়ে তোমার শরীর অনেক ভালো হয়েছে দেখছি! ভালো ছিলে তো, জেনিফার?'

'হুঁ। নার্স মেয়েটি অনেক যত্ন নিয়েছে আমার।'

জেনিফারের হাত ধরে লেকের দিকে হাঁটতে শুরু করল মোরেট্টি। কপালে চিন্তার রেখা। 'কোথায় যেন একটা গোলমাল বেধে গেছে। হঠাৎ করে তৎপর হয়ে উঠেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বাইরেও ঝামেলা দেখা দিয়েছে,' একটু থেমে জেনিফারের দিকে ফিরে তাকাল মোরেট্টি। 'তুমি পুরোপুরি সেরে উঠেছ তো? কোনো অসুবিধে নেই তো আর?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল জেনিফার।

'তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল জেনিফার।

'সিঙ্গাপুরে যেতে হবে তোমাকে। আগামীকাল।'

'সিঙ্গাপুর!' অবাক হল জেনিফার। এর আগেও মোরেট্টির কাজে দেশের বাইরে যেতে হয়েছে ওকে। কিন্তু অতদূর কখনও যায়নি।

'এয়ারলাইন স্টুয়ার্ড স্তেফান বজর্ক। আমারই লোক। প্রচুর কোকেন সহ ধরা পড়েছে চাঙ্গি এয়ারপোর্টে। কথা বলতে শুরু করার আগেই জামিনে ওকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পারবে না?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেনিফার।

মুক্তি নেই! মুক্তি নেই!

'কেন পারব না, মাইকেল?'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মোরেট্টি। 'কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। এ কদিন তোমাকে মিস করব আমি', জেনিফারকে কাছে টানার মোরেট্টি। আস্তে করে বলল, 'তোমাকে ভালোবাসি।'

জেনিফার জানে, এই কথাগুলো এর আগে অন্য কোনো মেয়েকে বলেনি মোরেট্টি।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে সবকিছু। ভেতরে কী যেন মরে গেছে জেনিফারের, হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। এখন একাকিত্বই ওর সঙ্গী।

জেনিফার ভাবল, মোরেট্টিকে বলবে, চলে যেতে চায় ও। ওয়ার্নার এবং মোরেট্টি দুজনের কাছ থেকেই অনেক দূরে। বুঝিয়ে বললে মোরেট্টি কি আপত্তি করবে?

আবার ভাবল, যাবার আগে এই একটি কাজ করে যাবে সে। মোরেট্টির জন্যে এই শেষ কাজ। তারপর শুরু করবে ওর নতুন জীবন।

পরদিন সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হল জেনিফার।

একত্রিশ

নিক ভিটো, টনি সান্তো, সালভাতর ফিওর আর জোসেফ কোলেল্লা টনি'স প্লেসে দুপুরের খাওয়া সারছে। সামনের দিকে একটা বূদে বসেছে ওরা। প্রতিবার সদর দরজা খোলার শব্দ কানে যেতেই মাথা বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে আগন্তুককে। মোরেট্টি পেছনের স্পেশাল সুটটাতে বিশ্রাম নিচ্ছে। পারিবারিক কোন্দল দেখা না দিলে এটাই মোরেট্টির জন্যে শহরের সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা।

দরজা খোলার শব্দে আবার ফিরে তাকাল তিনজন। হকার ঢুকছে নিউইয়র্ক পোস্টের বৈকালিক সংখ্যা হাতে করে।

কোলেল্লা চিৎকার করে ডাকল, 'এদিকে এসো তো, সনি,' বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল। 'রেসের খবরটা দেখতে হবে। প্রচুর বাজি ধরেছি আজ।'

সত্তর বছরের বৃদ্ধ সনি এগিয়ে এসে কোলেল্লাকে একটা খবরের কাগজ দিল। কোলেল্লা ওয়ালেট থেকে বের করে একটা ডলার দিল তাকে, 'বাকিটা তুমি রেখে দাও, বুড়ো।'

মোরেট্টি ঠিক এভাবেই বলে।

কোলেল্লা কাগজটা মেলতে শুরু করতেই সামনের পৃষ্ঠার তিন কলাম জুড়ে ছাপা একটা ছবি নিক ভিটোর দৃষ্টি কেড়ে নিল।

'হেই!' চিন্তিত স্বরে বলল সে। 'এই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি আমি।'

টনি সান্তো পাত্তা দিল না। 'তো কী হয়েছে? প্রায়ই তো এই লোকের ছবি ছাপা হচ্ছে। এবারের সম্ভাবনাময় একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার।'

'না না,' নিক ওকে থামিয়ে দিল। 'আমি ছবি দেখার কথা বলছি না। কোথায় যেন মুখোমুখি দেখেছি,' চোখ বন্ধ করে ভুরু কোঁচকাল নিক ভিটো। মাথার পাশে তর্জনী দিয়ে টোকা মারতে লাগল— মনে করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল।

'পেয়েছি!' লাফিয়ে উঠল নিক ভিটো। 'আকাপুলকোর এক ঘিঞ্জি বারে জেনিফার পার্কারের সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছিলাম লোকটাকে।'

'কী আবোলতাবোল বকছ, নিক?' বিরক্ত হল টনি।

'তোমার মনে নেই, গতমাসে আকাপুলকোয় গিয়েছিলাম একটা প্যাকেট ডেলিভারি দিতে? তখনই দেখেছিলাম ওদের। একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করছিল ওরা।'

কোলেল্লা শক্ত চোখে তাকাল। 'তুমি কি নিশ্চিত যে এই লোকই ছিল?'

'অবশ্যই। কেন?'

কোলেল্লা নিচু গলায় বলল, 'ব্যাপারটা মাইকেলকে জানানো দরকার।'

বত্রিশ

মোরেট্টি ধমক দিল নিক ভিটোকে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, নিক? জেনিফার কীভাবে ঐ লোককে চিনবে?'

'ক্ষমা করবেন, বস্। কিন্তু সত্যিই ওরা দুজন একসঙ্গে ছিল,' দৃঢ়স্বরে বলল নিক ভিটো।

'সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার আমাদের সবচেয়ে বিপদজনক শত্রু। সুতরাং যা বলবে, ভেবেচিন্তে বলবে, বুঝেছ?' গোঁয়ারের মতো বলল মোরেট্টি।

'আমি আমার বক্তব্য পাল্টাব না, বস্। আমি নিশ্চিত, সিনেটর ওয়ার্নারই সেদিন জেনিফার পার্কারের সঙ্গে ছিল।'

স্তব্ধ হয়ে গেল মোরেট্টি। কই, জেনিফার তো কখনও ওকে বলেনি, ওয়ার্নারকে চেনে ও! আকাপুলকোর সব ঘটনাই বলেছে ওকে জেনিফার, কিন্তু একবারও ওয়ার্নারের কথা উল্লেখ করেনি। রহস্যটা কোথায়?

কার্লোর দিকে ফিরল মোরেট্টি। 'জেনিটার ইউনিয়নের বিজনেস ম্যানেজার কে, তার নাম জানো?'

'চার্লি কোরেল্লি।'

পাঁচ মিনিট পরে চার্লি কোরেল্লির সঙ্গে কথা বলল মোরেট্টি। 'আমার এক বান্ধবী সাত- আট বছর আগে বেলমন্ট টাওয়ার্সে থাকত। তখন ঐ বাড়ির জেনিটার যে ছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' কিছুক্ষণ চুপচাপ ওপাশের কথা শুনল মোরেট্টি। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ। কখনও কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে নির্দ্বিধায় আমার কাছে আসবে। ওটা তোমার পাওনা রইল,' রিসিভার রেখে দিল মোরেট্টি।

নিক ভিটো, সালভাতর আর কোলেল্লা নিঃশব্দে লক্ষ করছিল ওকে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মোরেট্টি। 'শুয়োরের বাচ্চারা! এখনও কেন বসে আছিস? বেরিয়ে যা!'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল তারা।

চেয়ারে বসে বসে ফুঁসতে লাগল মোরেট্টি। চিন্তাই করতে পারছে না এক

টেবিলে বসে ওয়ার্নারের সঙ্গে কীভাবে গল্প করতে পারে জেনিফার! সবকিছু জানার পরেও কেন ওকে কিছুই বলেনি মেয়েটা? আর...ভিয়েতনামে নিহত যোশুয়ার বাবার কথা...কেন ওকে কখনও তার কথা বলেনি জেনিফার?

খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো অফিসের চারদিকে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ভ্যালেন্টি।

চার ঘণ্টা পর টনি সান্তো ষাট বছরের এক বুড়োকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, বুড়ো অসম্ভব গরিব। তার ওপর ভয়ে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে।

'এই হল ওয়ালি কাস্তলস্কি,' নিক ভিটো পরিচয় দিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বুড়োর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল মোরেত্তি। 'এখানে আসার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, ওয়ালি,' টনির দিকে ফিরল। 'ওয়ালিকে একটা ড্রিঙ্ক বানিয়ে দাও তো!'

'না না। কিচ্ছু লাগবে না,' বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল বুড়ো। 'ধন্যবাদ, স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ,' পারলে মাইকেলের পা ছুঁড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত সে। বুড়োর কপালে ঘাম দেখা যাচ্ছে, খুশি হল মোরেত্তি। লক্ষণ ভালো।

'নার্ভাস হয়ো না, ওয়ালি। তোমাকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করব। ঠিকঠাক জবাব দেবে তো?'

'অবশ্যই, স্যার। কী জানতে চান বলুন,' উদ্‌গ্রীব চোখে চেয়ে আছে বুড়ো।

'তুমি কি এখনও বেলমন্ট টাওয়ার্সে কাজ করছ?'

'আমি? না, স্যার। অনেক আগেই ওখান থেকে চলে এসেছি আমি। পাঁচ বছর হয়ে গেল প্রায়। যে-বছর আমার শাশুড়ি হার্ট অ্যাটাকে...'

'সব ভাড়াটের কথা খেয়াল আছে?'

'অনেকের কথাই মনে আছে, স্যার। এটাই তো আমার...'

'জেনিফার পার্কারের কথা মনে পড়ে?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল বুড়োর চেহারা। 'ঐ সুন্দরী মেয়েটা তো? অমন লক্ষ্মী মেয়ে, মনে থাকবে না কেন? একবার বাসায় ডেকে নিয়ে কফি খাইয়েছিল আমাকে। আহা, বড় ভালো মেয়ে ছিল। ওর অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বারটাও মনে আছে আমার। নাইনটিন নাইনটি নাইন।'

'জেনিফার পার্কারের কাছে কি অনেক লোক আসা-যাওয়া করত?'

একটু চিন্তা করল বুড়ো। 'সেটা বলা খুব শক্ত, স্যার। কারণ আমি শুধু ওকে বের হতে আর ঢুকতেই দেখতাম। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা হত।'

'কোনো লোককে তার অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাতে দেখেছ?'

'না না, স্যার। জেনিফার অমন মেয়ে ছিল না।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মোরেট্টি। মিছেই ভয় পেয়েছিল। এটা তো সহজ কথা, জেনিফার কক্ষনো ওরকম কাজ—

'তবে শুধু ওর বয়ফ্রেন্ডকেই ওর বাসায় প্রচুর সময় কাটাতে দেখেছি।'

ভুল শুনছে না তো! 'বয়ফ্রেন্ড!'

'জ্বী, স্যার। ঐ লোকটাকেই একমাত্র দেখতাম জেনিফারকে নিয়ে বাইরে যেতে, আবার বাসায় নামিয়ে দিতে। বাসায়ও যেতে দেখেছি। ওদেরকে দেখে খুব ভালো লাগত। সুন্দর জোড়া ছিল,' স্মৃতিচারণ করতে থাকে বুড়ো।

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে শুনতে থাকল মোরেট্টি। রাগে লাল হয়ে গেল ওর সারা মুখ। হঠাৎ করেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল সে। বুড়োর শার্টের কলার ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'বজ্জাত বুড়ো! এতক্ষণে বললি...কী নাম ছিল সেই লোকের?'

বুড়োর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি মারা যাবে সে। কোনোমতে বলতে পারল, 'জানি না...স্যার! জানি না। যিশুর কিরে...জানি না।'

দূরে ছুড়ে ফেলল তাকে মোরেট্টি। টেবিলের ওপর থেকে *নিউইয়র্ক পোস্ট*টা তুলে নিয়ে বুড়োর নাকের সামনে ধরল।

ছবিটা দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল বুড়োর। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এ-ই সেই লোক! মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড।'

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মোরেট্টি। জেনিফার...জেনিফার প্রথম থেকেই মিথ্যে বলে এসেছে ওকে! অথচ ওকে ভালোবেসে দেবীর আসনে বসিয়েছিল মোরেট্টি! কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল জেনিফার! বন্ধুত্বের অভিনয়ের আড়ালে তাহলে স্বার্থসিদ্ধিই ছিল ওর লক্ষ্য! অ্যাডাম ওয়ার্নার আর জেনিফার দু-জনে মিলে লেগেছে ওর পেছনে। ব্যবসা-বিপর্যয়ের কারণ তাহলে এটাই।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে। মৃত্যুদণ্ড দিল সে ওদের দুজনকেই।

তেত্রিশ

নিউইয়র্ক থেকে লন্ডন হয়ে সিঙ্গাপুর পৌঁছল জেনিফার। বাহরাইনে দু-ঘণ্টার যাত্রাবিরতি ছিল। তেল-নগরীর প্রায় নতুন এয়ারপোর্টটা ইতিমধ্যেই বস্তিতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় পোশাক পরা বৃদ্ধ, মহিলা আর শিশু চারদিকে উপচে পড়ছে। মেঝেয়, বেঞ্চে যত্রতত্র ঘুমিয়ে আছে অসংখ্য মানুষ।

সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে বিকেল সাড়ে চারটা বেজে গেল। শহর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে নতুন এই এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। রানওয়ে থেকে দেখা যাচ্ছিল, কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এখনও।

কাস্টম বিল্ডিংটা বিরাট আর আধুনিক। অফিসাররাও ভদ্র, বিনয়ী আর কর্মতৎপর। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ছাড়া পেল জেনিফার।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগোল জেনিফার। মোটাসোটা মধ্যবয়স্ক এক চাইনিজ লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। 'মিস জেনিফার পার্কার?'

'জ্বী।'

'আমি চৌ লিঙ, চিনতে পারল জেনিফার। সিঙ্গাপুরে মোরেত্তির কন্ট্যাক্ট। 'আপনার জন্যে আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। আমার সঙ্গে আসুন।'

জেনিফারের মালপত্র একটা শেভ্রোলের ট্রাঙ্কে তুলে দিল চৌ লিঙ। দু-মিনিট পর ওরা ছুটে চলল শহরের দিকে।

'ভ্রমণে অসুবিধে হয়নি তো?' নম্র গলায় জিজ্ঞেস করল চৌ লিঙ।

'না। বেশ উপভোগ করেছি ফ্লাইটটা,' জেনিফারের মনে পড়ে, আছে মাইক রোমিলোর কাছে। চৌ লিঙ সম্ভবত মানুষের মনের কথা পড়তে পারে, সামনের বিশাল একটা বিল্ডিং দেখিয়ে বলল ওটাই চাঙ্গি কারাগার। স্তেফান ওখানেই আছে।

চলন্ত গাড়ি থেকে ফিরে তাকাল জেনিফার। হাইওয়ে থেকে একটু দূরে ভয়ংকর বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে সবুজ ঘাস বিছানো খোলা মাঠ, তারপরেই আকাশের দিকে উঠে গেছে উঁচু কালো দেয়াল। এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে ইলেকট্রিফাইড তার বসানো আছে দেয়ালের মাথায়। প্রতিটি কোণে উঁচু ওয়াচটাওয়ার। সশস্ত্র প্রহরী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'যুদ্ধের সময়,' চৌ লিঙ জেনিফারকে তথ্য দিতে শুরু করল। 'সব বৃটিশ পার্সোনেলকে এখানে রাখা হয়েছিল।'

'স্তেফানের সঙ্গে কখন দেখা করতে পারব আমি?'

খুকখুক করে কাশল চৌ লিঙ। 'পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। এই সরকার মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। যারা এর সঙ্গে জড়িত...' হতাশার সঙ্গে এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকাল চৌ লিঙ। 'আসলে কয়েকটা শক্তিশালী পরিবার সিঙ্গাপুরকে নিয়ন্ত্রণ করে। শ'পরিবার, সি. কে ট্যাঙ, ট্যান চিন তুয়ান এবং লি কাউন কিউ— আমাদের প্রধানমন্ত্রী। দ্বীপের অর্থনীতি এদেরই হাতের মুঠোয়। আর এরা সবাই মাদকদ্রব্যের ঘোর বিরোধী।'

'কিন্তু এখানে আমাদের কিছু বন্ধু থাকার কথা!'

'হুঁ। তেমন লোকও আছে। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। ডেভিড তাউ— আমাদের বড় একজন বন্ধু।'

এই বন্ধুত্ব বজায় রাখতে প্রতিমাসে মোরেট্টিকে কত টাকা খরচ করতে হয়, তা জানে না জেনিফার। জানতে চায়ও না। এটাই তো ওর শেষ কাজ।

মাথা থেকে সব চিন্তা সরিয়ে দিয়ে জানালার বাইরে মন দিল জেনিফার। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন শহর। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেউ বানিয়ে রেখে গেছে। ঘন সবুজ ঘাসপাতা আর রঙবেরঙের ফুল ফুটে আছে সব জায়গায়। খুব ভালো লাগল জেনিফারের। ম্যাকফারসন রোডের দুদিকে অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স। আবার মাঝে মাঝে প্রাচীন ধর্মমন্দির আর প্যাগোডাগুলো শহরের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। রাস্তায় মঙ্গোলিয়ান চেহারার নারী-পুরুষদের পরনে পশ্চিমি পোশাকের সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় পোশাকও দেখা যাচ্ছে। পুরো শহরটাই যেন নাগরিক সভ্যতা আর প্রাচীন সংস্কৃতির অপূর্ব সংমিশ্রণ।

'এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর আর কোথাও দেখিনি আমি,' না বলে পারল না জেনিফার।

চৌ লিঙ হাসল। 'কারণটা সহজ। রাস্তায় ময়লা ফেললে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশো ডলার জরিমানা করা হয়। কঠোরভাবে মেনে চলা হয় এই আইন।'

স্টিভেন রোডে ঢুকল গাড়ি। পাহাড়ের ওপর গাছপালা ঘেরা ফুলের বাগানের মধ্যে সুন্দর সাদা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

'ওখানেই আপনি থাকবেন। হোটেল সাংগ্রিলা।'

হোটেলের লবিটা চমৎকার। চারদিকে সাদার ছড়াছড়ি। পিলারগুলো মার্বেল পাথরের, বিরাট বিরাট কাচের জানালা।

জেনিফার রুমে যাবার জন্যে রওনা হতে চৌ লিঙ পেছন থেকে ডাকল 'মিস

পার্কার, ইন্সপেক্টর ডেভিড তাউ খুব শিগগিরই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন,' একটা কার্ড দিল ওর হাতে। 'যখন দরকার হবে, এই নাম্বারে পাবেন আমাকে।

বেলবয়ের পেছন পেছন করিডোর ধরে এগোল জেনিফার। ডানপাশের বিরাট জানালা দিয়ে জলপ্রপাতের নিচে সুন্দর একটা সাজানো বাগান দেখা গেল। পানিগুলো জমা হচ্ছে বিরাট একটা সুইমিংপুলে। যোশুয়ার কথা মনে পড়ল জেনিফারের। সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসত ও। জোর করে ভাবনাটা সরিয়ে দিল জেনিফার মন থেকে।

দোতলায় বিরাট একটা লিভিংরুম আর বেডরুম নিয়ে জেনিফারের সুট। একটা বিশাল বারান্দাও রয়েছে, যার নিচে দেখা যাচ্ছে সাদা আর লাল অ্যানথুরিয়াম, বেগুনি বোগেনভিলিয়া আর রঙবেরঙের ক্রিসেন্থিমামের সমুদ্র। চারপাশটা ঘিরে রেখেছে নারকেল আর পামগাছ।

যোশুয়া কি এর চেয়েও সুন্দর কোনো জায়গায় আছে?

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। যোশুয়া ঠিক এরকম আবহাওয়াই পছন্দ করত। জেনিফারের মনে হচ্ছে এক্ষুণি ও দৌড়ে এসে বলবে, 'মাম্মি, চলো না নৌকোয় চড়ি!' জোর করে চিন্তার রাশ টেনে ধরল জেনিফার।

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল জেনিফার। 'আমি যুক্তরাষ্ট্রে একটা কল বুক করতে চাই। নিউইয়র্ক সিটিতে। মিস্টার মাইকেল মোরেট্টির কাছে,' নাম্বারটা বলল জেনিফার।

অপারেটর মেয়েটি নম্রস্বরে উত্তর দিল, 'আমি খুব দুঃখিত। সবগুলো লাইন এনগেজড। পরে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'ধন্যবাদ,' রিসিভার নামিয়ে রাখল জেনিফার।

নিচে, অপারেটর মেয়েটি সুইচবোর্ডের সামনে দাঁড়ানো লোকটির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

লোকটি ওপর নিচে মাথা দুলিয়ে বলল, 'গুড, ভেরি গুড।'

একঘণ্টা পর ডেভিড তাউয়ের টেলিফোন পেল জেনিফার। 'মিস জেনিফার পার্কার?'

'বলছি।'

'আমি ইন্সপেক্টর তাউ,' ভালোই ইংরেজি বলেন ভদ্রলোক।

'আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। যত তাড়াতাড়ি স্তেফানকে...'

বাধা দিলেন ইন্সপেক্টর। 'আজ সন্ধেয় আমার সঙ্গে ডিনার করতে আপত্তি নেই তো আপনার?'

বুঝল জেনিফার। টেলিফোনে কথা বলতে চায় না তাউ, কে জানে, হয়তো এ-

মুহূর্তেও টেপ করা হচ্ছে ওদের কথা।

'আমি খুব খুশি হব, ইন্সপেক্টর তাউ। তা, কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার?'

'গ্রেট সাংহাই' লোকজনে ভর্তি বিশাল এক রেস্তোরাঁ। স্থানীয় লোকজন খেতে খেতে উঁচুগলায় কথা বলছে আর হাসছে। এককোণে প্ল্যাটফর্মের ওপর ব্যান্ড। সুন্দরী অষ্টাদশী এক তরুণী চিওঙসাম পরে করুণ সুরে গান গাইছে, যা এই পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান।

ওয়েটার এগিয়ে এল। 'খালি টেবিল খুঁজছেন?'

'দুজনের বসার জায়গা হলেই চলবে। আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি—ইন্সপেক্টর ডেভিড তাউ।'

হাসল ছেলেটি। 'তিনিও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনিই মিস পার্কার তো? আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকজনের ভিড় ঠেলে একেবারে ব্যান্ডস্ট্যান্ডের সামনের একটা টেবিলে নিয়ে এল সে জেনিফারকে।

ইন্সপেক্টর তাউ লম্বা, সুপুরুষ। মাঝারি স্বাস্থ্য। কাটা কাটা চেহারা, মঙ্গোলয়েডদের মধ্যে সচরাচর যা দেখা যায় না। কালো কুচকুচে চোখের মণি। চমৎকার ছাঁটের কালো স্যুট পরে আছেন ভদ্রলোক।

জেনিফারকে দেখে উঠে খালি চেয়ারটা টেনে দিলেন, বোঝা গেল সূক্ষ্ম ভদ্রতাবোধও আছে। জেনিফার ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়ল।

ব্যান্ডে রক মিউজিক শুরু হল। কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। কাছে থেকে ইন্সপেক্টরকে দেখে বোঝা গেল, দূর থেকে যত কমবয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল, আসলে ততটা নয়। পঁয়তাল্লিশের কিছু এদিক-ওদিক হবে।

সামনে ঝুঁকে ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসলেন ইন্সপেক্টর। 'আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক দিতে বলি?'

'বলুন।'

'একটা শেণ্ডল দিতে বলি আপনার জন্যে।'

'এর মধ্যে রয়েছে নারকেলের দুধ, চিনি আর ছোট ছোট জেলাটিনের টুকরো। আপনার ভালোই লাগবে।'

খুব একটা উৎসাহ পেল না জেনিফার। তবু চুপচাপ রইল। তাউয়ের ইশারায় সুদেহিনী ওয়েট্রেস ছুটে এল. শরীরে কাপড়চোপড়ের পরিমাণ খুবই কম। ইন্সপেক্টর দুটো শেন্ডল আর ডিম সামের অর্ডার দিলেন— চাইনিজ অ্যাপেটাইজার।

'আমার মনে হয় ডিনারের অর্ডারটাও আমারই দেয়া উচিত। এখানকার মেনু সম্পর্কে বলতে গেলে আপনার কোনো ধারণাই নেই।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই। আপনি ইচ্ছেমতো অর্ডার দিতে পারেন।'

'আপনাদের দেশে শুনেছি মেয়েরা ছেলেদের মতোই স্বাধীন। এখানে কিন্তু সবক্ষেত্রে পুরুষেরাই প্রধান।'

একজন সেক্সিস্ট। তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি হলো না জেনিফারের। ভদ্রলোক দেখতে যত সুন্দর, কথাবার্তায় ততটা নয়। কিন্তু একে হাতে রাখতে হবে। যে-কোনো মূল্যে। সুতরাং বিরক্তি প্রকাশ করল না জেনিফার।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। অনেক দেশই ঘোরা হয়েছে ওর, কিন্তু এখানকার নারী-পুরুষের মতো সুন্দর মানুষ কমই দেখেছে জেনিফার। সম্ভবত সবাইকে হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল দেখাচ্ছে বলেই এমনটা মনে হচ্ছে।

ওয়েট্রেস দুটো গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। নিজের গ্লাসটা হাতে নিল জেনিফার। ভেতরের পদার্থটুকু অনেকটা চকোলেট সোডার মতো দেখতে। পিচ্ছিল জেলাটিনের টুকরো ভাসছে তার মধ্যে।

'কী হল? চুমুক দিয়ে দেখুন!'

'আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না, ব্যান্ডের বাজনা ঝড় বইয়ে দিচ্ছে,' চেঁচিয়ে কথা বলতে হল জেনিফারকে।

তাউও চিৎকার করে বললেন, 'আপনাকে ওটা চেখে দেখতে বলছি।

নিরুপায় হয়ে চুমুক দিল জেনিফার। বিচ্ছিরি! অসম্ভব মিষ্টি। কিন্তু মাথা নাড়ল হাসিমুখে। 'একটু...মানে, একটু অন্যরকম। ভালোই তো মনে হচ্ছে।'

বিভিন্ন আকারের ডিম-স্যাম এসে গেল। দারুণ খেতে। ওটাই বেশি করে খেল জেনিফার।

ইন্সপেক্টর আবার চিৎকার শুরু করলেন, 'এই রেস্তোরাঁটা 'নোনিয়া' খাবারের জন্যে বিখ্যাত,' জেনিফারের চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করলেন, 'চাইনিজ উপকরণ আর মালয়েশিয়ান মশলা দিয়ে রাঁধা খাবার। এই রান্নার রেসিপি কোথাও ছাপার অক্ষরে পাবেন না।

এবার কাজের কথায় চলে এল জেনিফার। 'কিন্তু স্তেফানের ব্যাপারে তো কিছুই বললেন না।'

'কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না আমি।' খাওয়ায় মন দিয়েছেন ইন্সপেক্টর।

সামনে ঝুঁকে এসে চেঁচিয়ে কথাগুলো আবার বলল জেনিফার।

কাঁধ ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। ভান করলেন কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। নিরাপদে কথা বলার জন্যে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছেন, নাকি যাতে কোনো কথা না বলা

যায়, সেজন্যে।

ডিম-সামের পর একের পর এক খাবার আসতে থাকল। সত্যিই প্রশংসা করার মতো রান্না। কিন্তু স্তেফানের প্রসঙ্গ তুলতে না পেরে কিছুই উপভোগ করতে পারল না জেনিফার।

খাওয়া শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে,' বলতে না বলতে বিরাট একটা মার্সিডিস পার্কিং এরিয়া থেকে ওদের দিকে এগিয়ে এল। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা শোফার নেমে এসে দরজা খুলে ধরল। ব্যাপারটা কী? ইন্সপেক্টর কি এই লোকের সামনেই ব্যবসায়িক আলাপ সারবে নাকি?

দুজনেই পেছনের সিটে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করলে তাউ জিজ্ঞেস করলেন, 'সিঙ্গাপুরে এই প্রথমবারের মতো এলেন, তাই না?'

'জ্বী।

'তাহলে এ শহরে আপনার দেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে।'

'আমি তো এখানে বেড়াতে আসিনি, ইন্সপেক্টর। কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

বিরক্ত হলেন ইন্সপেক্টর। 'আপনারা, এই আমেরিকানরা, কেন যে সব কাজে এমন তাড়াহুড়ো করেন, বুঝি না। আচ্ছা, আপনি কি বুজিস স্ট্রিটের কথা শুনেছেন?'

বিরক্ত হল জেনিফারও। 'না।

রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল তাউয়ের ঠোঁটে। একটা ট্রিশ'র জন্যে গাড়ির গতি কমাতে হল শোফারকে। স্থানীয় লোকজন চালিত ত্রিচক্রযান।

দুজন ট্যুরিস্টকে নিয়ে ট্রিশ'টা অন্য রাস্তার দিকে মোড় নিতেই গরগর করে উঠলেন তাও, 'একদিন-না-একদিন এই বিচ্ছিরি জিনিসগুলোকে শহর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবই।'

বুজিস স্ট্রিটের এক ব্লক আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হল ওদেরকে। 'এই এলাকায় সব ধরনের যানবাহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ,' ব্যাখ্যা করলেন তাউ।

জেনিফারের কনুই ধরে ব্যস্ত ফুটপাতে উঠে এলেন তিনি। এত ভিড় যে হাঁটাই কষ্ট। ছোট ছোট দোকান নিয়ে ফুটপাতে বসে পড়েছে লোকজন। টুকিটাকি জিনিসপত্র ছাড়াও ফল, সবজি, মাছ-মাংস কিনছে সবাই। ছোট ছোট টেবিল আর তার চারপাশে ছোট ছোট চেয়ার সাজিয়ে দেয়া বেশ ক'টা রেস্তোরাঁও দেখা গেল রাস্তার ঠিক পাশেই। বিচিত্র বর্ণ গন্ধ আর শব্দ উপভোগ করতে করতে হাঁটছে জেনিফার। ভালোই লাগছে।

জেনিফারের কনুই ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামলেন ঘর্মাক্ত ইন্সপেক্টর। তিনটে টেবিলের সবগুলোতেই লোক রয়েছে। কোনো কথা

না বলে একজন ওয়েটারের হাত চেপে ধরলেন তাউ। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মতো এসে উপস্থিত হলেন মালিক। চাইনিজ ভাষায় কিছু একটা বললেন ইন্সপেক্টর। মালিক দৌড়ে গিয়ে একটা টেবিলের খদ্দেরদের কানে কানে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা ভয়ে ভয়ে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের পথে হাঁটতে শুরু করল। জেনিফার ও ইন্সপেক্টরকে খালি চেয়ার দুটোতে বসিয়ে দিলেন মালিক। পরবর্তী আদেশের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন পাশে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন তাউ।

'কিছু খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ,' এত লোকজনের মাঝে খাবার প্রবৃত্তি হল না জেনিফারের। তা-ছাড়া ডিনার সেরে উঠেছে মাত্র আধঘণ্টা আগে।

হাত নেড়ে রেস্তোরাঁর মালিককে চলে যেতে বললেন তাউ। জেনিফারের দিকে চেয়ে হাসলেন, 'লক্ষ্য রাখুন। মধ্যরাত হয়ে এল প্রায়।'

ইন্সপেক্টর কী বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝতে পারল না জেনিফার। তবে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, দ্রুত দোকানপাট গোটাতে শুরু করেছে লোকজন। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই হাওয়া হয়ে গেল সব দোকানদার।

অবাক হল জেনিফার। 'ব্যাপার কী?'

'শুধু দেখে যান,' রহস্যময় হাসি তাউয়ের ঠোঁটে।

ফুটপাতের লোকজনের মধ্যে কেমন যেন একটা গুঞ্জন উঠল। রাস্তায় হাঁটতে থাকা নারী-পুরুষ সবাই ফুটপাতে উঠে এল। ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। রাস্তার ঠিক মাঝখান ধরে চাইনিজ এক মেয়ে লম্বা টাইট ইভনিং গাউন পরে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। এত সুন্দর মেয়ে জীবনেও দেখেনি জেনিফার। ধীরে ধীরে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে হাঁটছে মেয়েটা, মাঝে মাঝে থামছে রেস্তোরাঁর টেবিলগুলোর সামনে, হাসিমুখে লোকজনের শুভেচ্ছা নিচ্ছে।

জেনিফারদের টেবিলের কাছে এলে তাকে আরও ভালো করে দেখল সে। দেখার মতো জিনিসই বটে! কাছে আসায় তার সৌন্দর্য যেন শতগুণ বেড়ে গেল। মাখনের মতো কোমল সোনালি চামড়া, নিখুঁত দেহের ভাঁজ। একদিকে কাটা সিল্কের গাউনের ফাঁকা দিয়ে বারবার উঁকি দিচ্ছে সুগঠিত উরু, নিশ্বাসের ছন্দে ওঠানামা করছে বুক।

কিছু বলার জন্যে তাউয়ের দিকে ফিরল জেনিফার। তক্ষুনি খেয়াল করল আরও একটা মেয়ে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে। মনে হচ্ছে যেন প্রথমটার চেয়েও বেশি সুন্দরী সে।

পেছনে আরও দুটো মেয়েকে দেখা গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা রাস্তা ভরে গেল উর্বশীতে। মালয়েশিয়ান, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ— সব ধরনের মেয়েই আছে। ছবির মতো সুন্দর তারা।

'পতিতা, তাই না?' আন্দাজ করল জেনিফার।

'হুঁ। তবে একটু অন্যধরনের। এরা সবাই ট্র্যান্সসেক্সুয়াল। আগে পুরুষ ছিল, স্বেচ্ছায় অপারেশন করে মেয়ে হয়েছে।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জেনিফার। অসম্ভব! ভালো করে তাকাল মেয়েগুলোর দিকে।

কোথাও এতটুকু পুরুষালি ভাব নেই কারও মধ্যেই।

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

হাসলেন তাউ। ওদেরকে এখানে 'বিলি বয়েজ' বলে ডাকা হয়।

'কিন্তু তা কী করে হয়? ওরা...'

'নিজেদেরকে ওরা এখন মেয়ে বলেই মনে করে। এতে আশ্চর্যের কী আছে? এরা কারও কোনো ক্ষতি করে না। পতিতাবৃত্তি এ-দেশে বেআইনি। কিন্তু বিলি বয়েজরা তার বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এরা অতিথিদের কোনো ক্ষতি করে, ততক্ষণ পুলিশ এদেরকে ঘাঁটায় না।

চারপাশের অনেকেই পছন্দমতো বিলি বয় বেছে নিয়ে রওনা দিচ্ছে। খদ্দেরদের টেবিলে বসে অনেকে ড্রিঙ্ক করছে।

'দুশো ডলার পর্যন্ত চার্জ করে এরা। প্রত্যেকেই প্রতিরাতে দুই কি তিনজন খদ্দের নেয়। এই বুজিস স্ট্রিটেই এদের আস্তানা। মধ্যরাত থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত পাওয়া যায় এদের। ঠিক ছ'টার সময় রাস্তা খালি করে দিতে হয় দোকানপাটের জন্যে। বয়স বেড়ে গেলে বিলি বয়রা দালালি করতে শুরু করে।'

ভালো লাগছিল না জেনিফারের। 'চলুন, ফেরা যাক। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

হোটেলে ফিরে যাবার সময় মরিয়া হয়ে উঠল জেনিফার। শোফার ব্যাটার সামনেই কথাটা তুলবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। গাড়ি অর্চার্ড রোডে পড়তেই ফিরে তাকাল তাউয়ের দিকে। 'স্তেফানের ব্যাপারে...'

'ও, হ্যাঁ। আগামীকাল সকাল দশটায় জেলে আপনার সঙ্গে ওর দেখা করার ব্যবস্থা করেছি।'

চৌত্রিশ

ওয়াশিংটন ডিসি। জরুরি একটা মীটিংয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ওয়ার্নার। এমন সময় নিউইয়র্ক থেকে অত্যন্ত জরুরি একটা ফোনকল এল।

ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি রবার্ট ডি সিলভা। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, খুশিতে উদ্বেল তিনি। 'এদিকের সব কাজ শেষ। এখন শুধু ধরার পালা। সব গ্রেফতারি পরোয়ানা রেডি। প্রত্যেকেরটা। আপনি শুনছেন তো সিনেটর?'

জোর করে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে পারলেন সিনেটর। 'জ্বী, বলুন শুনছি। খুব ভালো খবর দিয়েছেন।'

'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব রুই-কাতলাকে ধরে ফেলা হবে। শুধু মাঠে নামার অপেক্ষা। আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে যদি নিউইয়র্কে চলে আসতে পারেন, তবে খুব ভালো হয়। দুপুরে জরুরি একটা মিটিং হবে। সাহায্যকারী এজেন্সিগুলোর প্রতিনিধিরা আসবেন। ঠিক কীভাবে কাজ শুরু করা যায়, তার প্ল্যান তৈরি করা হবে। আপনি আসতে পারবেন তো সিনেটর?'

'অবশ্যই!'

'সব ব্যবস্থা করে রাখব তাহলে। ঠিক সকাল দশটায় আপনার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'ঠিক আছে, মিস্টার সিলভা,' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ওয়ার্নার।

সময় নেই! সময় নেই! গ্রেফতারি পরোয়ানা তৈরি হয়ে গেছে। সবগুলো!

রিসিভার তুলে নিলেন ওয়ার্নার। বারবার চেষ্টা করতে থাকলেন নিউইয়র্কের একটা বিশেষ নাম্বারে।

পঁয়ত্রিশ

চাঙ্গি কারাগারের ভিজিটর রুমটা বেশ ছোট। চারদিকে সাদা রঙ-করা-ন্যাংটা দেয়াল। লম্বা একটা কাঠের টেবিল আছে রুমটার ঠিক মাঝখানে। দুদিকে সার সার সাদামাটা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকল জেনিফার।

বিশ মিনিট পরে দরজা ঠেলে ঢুকল স্তেফান। পেছনে সশস্ত্র গার্ড।

খুব বেশি হলে বছর-তিরিশেক হবে স্তেফানের বয়স। লম্বা, শুকনো শরীর। বিষণ্ণ ভাঙা চেহারা। ঠিকরানো চোখ। নিশ্চয়ই থাইরয়েডে কোনো গোলমাল আছে—ভাবল জেনিফার। গালে আর কপালে লালচে চিতি ধরা দাগ।

নিজের পরিচয় দিল জেনিফার। 'আমি জেনিফার পার্কার। আপনার উকিল। জামিনের ব্যবস্থা করছি আপনার জন্যে।'

অনুনয় ফুটে উঠল স্তেফানের করুণ চোখে। 'তাড়াতাড়ি আমাকে বের করে নিয়ে যান, মিস পার্কার।'

মোরেত্তির কথাটা মনে পড়ে গেল জেনিফারের। কথা বলতে শুরু করার আগেই বের করে নিয়ে আসতে হবে স্তেফানকে।

'এরা আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে তো?'

চকিতে দরজার সামনে দাঁড়ানো গার্ডকে দেখে নিল স্তেফান। 'হুঁ। ব্যবহার খুব একটা খারাপ নয় এদের।'

'ইতিমধ্যেই জামিনের দরখাস্ত করেছি আমি। দেখি কী হয়।'

'জামিন পাবার সম্ভাবনা কতটুকু?' আকুল চোখে চেয়ে আছে স্তেফান। চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরে আশার চিহ্ন গোপন রাখতে পারল না।

'আমার মনে হয় না খুব একটা ঝামেলা হবে। যা-ই হোক, তিনদিনের মধ্যেই সেটা জানা যাবে,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল জেনিফার।

'এই জায়গাটা থেকে বেরোতেই হবে আমাকে।'

উঠে দাঁড়াল জেনিফার। 'পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'ধন্যবাদ, মিস,' হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল রোমিলো।

'না!' তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়ে উঠল গার্ড।

চমকে ফিরে তাকাল ওরা দুজন।

'কয়েদিকে ছোঁয়া নিষেধ,' ঠাণ্ডা স্বরে জানিয়ে দিল গার্ড।

চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে রইল স্তেফান।

হোটেলে ফিরে একটা ম্যাসেজ পেল জেনিফার। ইন্সপেক্টর ডেভিড তাউ ফোন করেছিলেন ওকে। রুমে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ফোন বেজে উঠল আবার। ইন্সপেক্টর তাউ।

'সামনের দু-তিনদিন তো আপনার কোনো কাজ নেই হাতে। বরং ঘুরেফিরে দেখতে পারেন শহরটা।'

একবার ভাবল 'না' বলে দেবে ভদ্রলোককে। আবার মনে হল, স্তেফানকে নিরাপদে প্লেনে তুলে না দেয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট রাখতে হবে ইন্সপেক্টরকে।

'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর। সত্যিই খুব ভালো হবে তাহলে।'

ঘণ্টাখানেক পরেই চলে এলেন ইন্সপেক্টর। দুপুরের খাবার খেল ওরা কাম্পাচিতে। তারপর গ্রামের দিকে চলল গাড়ি। শহরের উত্তরে বুকিত তিমাহ্ রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকল মালয়েশিয়ার দিকে। পথের দুধারে অনেকগুলো ছোট ছোট সুন্দর সাজানো গ্রাম দেখা গেল, কেন্দ্রস্থলে ফলের দোকান আর বাজার। গ্রামের লোকেরা রঙচঙে কাপড়চোপড় পরে আছে। সবাই হাসিখুশি।

পথে ওরা থামল কানযি সেমেটারি আর ওয়ার মেমোরিয়ালে। নীল রঙের গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। বিরাট একটা মার্বেলের তৈরি ক্রসের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, পেছনে বিশাল একটা পিলার। চারদিকে সাদা রঙের ক্রসের সমুদ্র।

'এই যুদ্ধ অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গেছে আমাদের। এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন, যারা কোনো আত্মীয় বা বন্ধুকে হারায়নি।'

কোনো মন্তব্য করল না জেনিফার। ওর মনের পর্দায় তখন ভেসে উঠেছে স্যাণ্ডস্ পয়েন্টের ছোট্ট কবরটার কথা। কিন্তু মাটির নিচে পরম শান্তিতে যে ঘুমিয়ে আছে, বহু কষ্টে তার কথা মন থেকে দূর করে দিল জেনিফার।

ম্যানহাটান। হাডসন স্ট্রিটের পুলিশ ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সঙ্গে অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো একটা সমঝোতায় পৌঁছেছেন। উপস্থিত সবাই উত্তেজিত, আনন্দিত। এ-ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বড় অপারেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রতিদিন আসে না। অনেকের জন্যেই এটা নতুন অভিজ্ঞতা। এতদিন ধরে তারা প্রচুর গুণ্ডাপাণ্ডা, খুনী আর ব্ল্যাকমেইলারকে ধরেছে। কিন্তু প্রতিবারই দামি উকিলেরা

ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে অপরাধীদের। কিন্তু এবার অন্যরকম ঘটনা ঘটতে চলেছে। কনসিলিয়ারি কোলফ্যাক্স রাজসাক্ষী হবেন। কে বাঁচাবে মোরেট্টিকে? মাফিয়ার সাঙ্গোপাঙ্গকে?

অ্যাডাম ওয়ার্নার সাংঘাতিক ব্যস্ত। হোয়াইট হাউসে যাবার সুবর্ণ সুযোগ এটা! ব্যস্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সাংঘাতিক টেনশনে ভুগছেন ওয়ার্নার। অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা। এতবড় একটা অপারেশনের নেতত্ব দিতে গেলে, টেনশন তো থাকবেই। কিন্তু আসল কারণটা যদি আঁচ করতে পারত কেউ!

সিনেটরের সামনে একটা লিস্ট রয়েছে। যাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নাম আছে সেখানে। লিস্টে চার নাম্বারে রয়েছে অ্যাটর্নি জেনিফার পার্কারের নাম। হত্যা এবং আরও আধাডজন ফেডারেল ক্রাইমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালেন ওয়ার্নার। অনেক কষ্টে কেবল বলতে পারলেন, 'আপনাদের...আপনাদের সবার জন্যে রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা,' আরও কিছু বলার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন ওয়ার্নার, কিন্তু একটা শব্দও বেরোল না মুখ থেকে। অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন সিনেটর।

'স্প্যানিশরা ঠিকই বলে, 'অ্যান্টোনিও মোরেট্টি ভাবল—'প্রতিশোধ হল এমন একটা খাবার জিনিস, যা ঠাণ্ডা করে খেতেই মজা।' নাগালের বাইরে আছে বলেই এখনও বেঁচে আছে জেনিফার। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই ফিরবে সে। ইতিমধ্যে মোরেট্টিও ভেবেচিন্তে ওর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখবে। চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জেনিফার। আর কেউ কখনও মোরেট্টিকে এতটা বোকা বানাতে পারেনি। ওর শাস্তি টা তাই হওয়া উচিত একটু বিশেষ ধরনের।

ঠিক এসময় সিঙ্গাপুর থেকে মোরেট্টিকে ফোন করার চেষ্টা করছে জেনিফার।

'দুঃখিত, মিস,' সুইচবোর্ড অপারেটর দুঃখের সঙ্গে জানাল। 'সবগুলো লাইনই এনগেজড।'

'দয়া করে আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান,' অনুরোধ করল জেনিফার।

'অবশ্যই, মিস।'

অপারেটর মেয়েটি সুইচবোর্ডের পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। মাথা নেড়ে হাসির প্রত্যুত্তর দিল লোকটা।

নিজের অফিসে বসে অপেক্ষা করছেন রবার্ট ডি সিলভা। আনন্দে আত্মহারা। পরম তৃপ্তিতে হাত বোলাচ্ছেন বিশেষ একটা ওয়ারেন্টের ওপর। জেনিফার পার্কারের নাম

লেখা আছে তাতে।

'এতদিন বাগে পেয়েছি তোমাকে'—ভাবছেন তিনি। বর্বরোচিত উল্লাসে ভয়ে গেল তার মন।

টেলিফোন অপারেটর জেনিফারকে জানাল, 'ইন্সপেক্টর ডেভিড তাউ আপনার জন্যে লবিতে অপেক্ষা করছেন।'

অবাক হল জেনিফার। এখন তো তাঁর আসার কথা নয়! তবে কি স্তেফানের কোনো খবর আছে?

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল জেনিফার। কাফতানটা খুলে পরে নিল জিনস্ আর আকাশনীল সিল্কের ফুলহাতা শার্টটা। দ্রুত চিরুনি বুলিয়ে নিল লম্বা চুলে। কালো চামড়ার স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে রওনা হল নিচে।

একটা সোফায় আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছেন ইন্সপেক্টর। হাতে সিগারেট।

'আমি দুঃখিত, আপনাকে ফোন না করেই এসে পড়েছি,' ক্ষমা চাইলেন তিনি। 'আমার মনে হল মুখোমুখি আলাপ করা দরকার।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল জেনিফার। 'কোনো খবর আছে?'

উঠে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টর। 'গাড়িতে বসেই নাহয় কথা বলা যাবে। আপনাকে একটা মজার জিনিস্ দেখাব আজ।'

ইয়ো চু ক্যাঙ রোড ধরে এগোচ্ছে ওদের গাড়ি।

'কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না জেনিফার।

'না না, কোনো সমস্যা নেই। কাল না হলে পরশু জামিন হয়ে যাবে।'

তাহলে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লোকটা? রাগে গা জ্বলে উঠল জেনিফারের।

জালান গোয়াটোপাহ্ রোডের সার-সার বিল্ডিংগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। এমন সময় একজায়গায় ওদের নামিয়ে দিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোল শোফার।

হতভম্ব জেনিফারের দিকে ফিরে হাসলেন ইন্সপেক্টর। 'আমি নিশ্চিত যে আপনি খুব মজা পাবেন দেখে।'

রাগ হল জেনিফারের। 'ব্যাপারটা কী?'

'আসুন আমার সঙ্গে। না দেখলে বোঝানো যাবে না।'

বিশাল বাড়িটার বাইরে চাকচিক্য থাকলেও ভেতরটা দেখে বোঝা গেল, বহুদিন আগে তৈরি হয়েছিল এটা। ছাদে নোনা ধরেছে, মাঝে মাঝে ইট বেরিয়ে আছে দেয়ালে। কেমন যেন ছাতাধরা একটা গন্ধ লাগছে নাকে। গন্ধটা একেবারেই অচেনা

আর নতুন লাগল জেনিফারের কাছে। কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল ওর।

নোংরা জামাকাপড় পরা এক তরুণী ছুটে এল ইন্সপেক্টর তাউয়ের দিকে। 'আপনাদের কি সঙ্গী দরকার হবে? আমি...'

হাত নেড়ে নিষেধ করলেন তিনি, 'কোনো দরকার নেই।'

জেনিফারের কনুই ধরে অন্ধকার করিডরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে দু'পাশের দেয়াল থেকে। জেনিফারের মনে হল, অনন্তকাল ধরে এখানে হাঁটছে সে।

পেছনদিকের সরু দরজা দিয়ে একসময় আলোর দেখা পাওয়া গেল। দ্রুত পা চালিয়ে বাইরে চলে এল জেনিফার। বুক ভরে বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে। ভেতরে এতক্ষণ দম আটকে আসছিল।

সামনে বিশাল খোলা একটা মাঠ। মাঝে মাঝে পুকুরের মতো কয়েকটা জলাশয়। কেমন যেন অদ্ভুত একটা শব্দ উঠে আসছে সেগুলো থেকে। মোট ছ'টা পুকুর-গুনল জেনিফার। ওর হাত ধরে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর সবচেয়ে কাছের পুকুরটার দিকে। একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে কিনারায়—'পুকুর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। বিপজ্জনক!'

ব্যাপারটা যে কী, এখনও ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না জেনিফার। পুকুরের মধ্যে কিছু জিইয়ে রাখা হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। নোংরা পানিতে সারাক্ষণ আলোড়ন উঠছে, জীবগুলো আকারে বড়সড়, তা-ও বোঝা যাচ্ছে হঠাৎ করে গাছের গুঁড়ির মতো অমসৃণ ভয়ংকর একটা কুমির পানির ওপরে উঠে এল। তারপর একের-পর-এক নানা আকৃতির আরও কয়েকটা দেখা গেল। সারাক্ষণ নড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। কী কুৎসিত! ভয়ে, ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠল জেনিফারের।

জেনিফারের মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হল না ইন্সপেক্টরের। বোঝা যাচ্ছে, বেশ উপভোগ করছেন তিনি ব্যাপারটা। বিকৃত হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তিনি, 'এটা একটা ক্রোকোডাইল ফার্ম। কুমিরের চাষ করা হয় এখানে,' পানির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটলেন তিনি। 'তিন থেকে ছ'বছর বয়সের কুমিরগুলো মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়। সেই চামড়া দিয়ে তৈরি হয় ওয়ালেট, বেল্ট, জুতো, মেয়েদের ব্যবহারের ব্যাগ। জানেন তো, কুমিরের চামড়ার অনেক দাম।'

কোনো কথা বলতে পারল না জেনিফার। কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না বিদঘুটে জীবগুলো থেকে।

ইন্সপেক্টর তখনও বলে চলেছেন, 'খেয়াল করে দেখুন, প্রায় সবগুলো কুমিরই হাঁ করে আছে। এভাবেই ওরা বিশ্রাম নেয়। যখন ওদের মুখ বন্ধ থাকে তখনই এরা হয়ে ওঠে বিপজ্জনক।'

হাঁ-করা মুখের ভেতরে সার-সার তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি যে-কারোর পিলে চমকে দিতে যথেষ্ট। অস্থির হয়ে উঠল জেনিফার।

এবার আরেকটা পুকুরের দিকে এগোলেন ইন্সপেক্টর। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনুসরণ করল জেনিফার।

এই পুকুরটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। দেখা যাচ্ছে, মাত্র দুটো বিশাল কুমির রয়েছে এখানে।

'এদের দুজনেরই বয়স পনেরো। একটা পুরুষ, অন্যটা মেয়ে। এদেরকে রাখা হয়েছে শুধু প্রজননের জন্যে। বাচ্চা উৎপাদন করাই এদের একমাত্র কাজ।'

শিউরে উঠল জেনিফার। 'কী বিচ্ছিরি দেখতে! এরা একে অন্যকে সহ্য করে কী করে?'

'সত্যি বলতে কি, আসলেই সহ্য করতে পারে না এরা পরস্পরকে। খুব কম সময়ই মিলিত হয় ওরা।'

'দেখে মনে হয়, জীবগুলো এই পৃথিবীর নয়। অন্য কোথাও থেকে এসেছে।'

'একদিক থেকে ঠিকই বলেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে ওরা একইরকম আছে। অন্য প্রাণীদের মতো বিবর্তনের ধারা তেমন একটা কাজ করেনি। খুব কমই পরিবর্তন এসেছে এদের মধ্যে। বলতে পারেন, সৃষ্টির প্রথম থেকে এদের চেহারা একইরকম আছে।'

জেনিফার বুঝে উঠতে পারল না ইন্সপেক্টর কেন ওকে এমন বিদঘুটে জায়গায় নিয়ে এসেছেন। যদি তিনি ভেবে থাকেন জেনিফার এতে খুব উৎসাহ পাবে, তবে তিনি ভুল করেছেন।

'আমরা কি এখন যেতে পারি?' দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে জেনিফারের।

'একটু ধৈর্য ধরুন,' ইন্সপেক্টর পেছন ফিরে তাকালেন। একটু আগে দেখা মেয়েটি দুহাতে একটা ভারী ট্রে বয়ে নিয়ে আসছে।

প্রথম পুকুরের কাছে গিয়ে থামল মেয়েটি। জেনিফারের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। ঝুঁকে নিচের কুমিরগুলো দেখতে লাগলেন। চকচক করছে তাঁর চোখদুটো। 'আজ ওদের খাবার দিন,' উল্লসিত গলায় বললেন তিনি। 'দেখুন, কেমন মজা হয়,' রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবার বললেন। 'সাধারণত মাছ আর শুয়োরের ফুসফুস খেতে দেয়া হয় এদেরকে, তিনদিন পর পর।'

মেয়েটি রক্তমাখা টুকরোগুলো ছুড়ে দিতে লাগল পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠল যেন পুকুরে। এক-একটা টুকরো পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একসাথে সেদিকে লাফ দিচ্ছে সবগুলো কুমির। হুড়োহুড়ি কামড়াকামড়ি বেধে গেল। দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল পুকুরের মধ্যে।

রক্তমাখা গোলাপি একটা মাংসের টুকরো ছুড়ে দিল মেয়েটি। একই সঙ্গে কামড়ে ধরল সেটা প্রমাণ সাইজের দুটো কুমির। টানাহেঁচড়া চলতে থাকল দুজনের মধ্যে। খানিকক্ষণের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হল সেটা। বর্বরের মতো আক্রমণ করতে শুরু করল পরস্পরকে। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে চেষ্টা করল প্রতিপক্ষকে। রক্তে লাল হয়ে উঠল পুকুরের অশান্ত পানি। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে দেখা গেল, একজনের একটা চোখ গলে গেছে, ঝুলে আছে সেটা মাথার সাথে। কিন্তু তাতে হতোদ্যম হয়নি সে একটুও। প্রতিপক্ষের শরীরে দাঁত বসিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছিঁড়ে নিতে চাইছে মাংস।

পুকুরের পানি আর পানি বলে মনে হচ্ছে না। লাল রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। রক্তের গন্ধে উন্মাদ হয়ে উঠল অন্য সব ক'টা কুমির। ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত যুদ্ধমান দুই প্রতিবেশীর ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার চামড়া অদৃশ্য হয়ে সাদা খুলি বেরিয়ে পড়ল হতভাগা কুমিরদুটোর। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল তারা।

জেনিফারের মনে হল, এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে ও। টলতে লাগল মাতালের মতো। কোনোমতে শুধু বলতে পারল, 'দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যান আমাকে।'

জেনিফারের কাঁধে হাত দিয়ে শক্ত করে ওকে ধরে রাখলেন ইন্সপেক্টর। জুলজুলে চোখে এখনও চেয়ে আছেন পানির দিকে। 'আর একটু অপেক্ষা করুন না!'

চোখ বন্ধ করে ইন্সপেক্টরের কাঁধে এলিয়ে পড়ল জেনিফার। বাধ্য হলেন তিনি ফিরতি পথে রওনা হতে।

সে-রাতে জেনিফার স্বপ্ন দেখল— পুকুরভর্তি কুমির যুদ্ধে মেতে উঠেছে। তাদের মধ্যে থেকে দুটো বিশাল আকারের কুমির হঠাৎ করে মোরেটি আর ওয়ার্নারে পরিণত হল— পরস্পরকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে।

দুঃস্বপ্নের মাঝে উঠে বসল জেনিফার। ঘামে ভিজে গেছে সারাশরীর। চেষ্টা করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁপুনি থামাতে পারল না।

বাকি রাতটুকু ঠায় বসে রইল জেনিফার।

অভিযান শুরু হল। ফেডারেল এবং স্থানীয় আইনপ্রয়োগনকারী সংস্থাগুলো একইসঙ্গে সব স্টেটগুলোতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। শুধু দেশের ভেতরেই নয়, আধাডজন বিদেশী রাষ্ট্রেও ধরপাকড় শুরু হল।

ওহাইও। উইমেনস্ ক্লাবে সরকারি কর্মচারীদের সততা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেবার সময় গ্রেফতার হলেন একজন সিনেটর।

নিউ অর্লিয়েন্স। বিশাল একটা বেআইনি ন্যাশনাল বুকমেকিং অপারেশন বন্ধ

করে দেয়া হল, গ্রেফতার হল বেশকিছু লোক।

অ্যামস্টার্ডাম। প্রচুর পরিমাণ চোরাই হীরা উদ্ধার করা হল। বন্ধ করে দেয়া হল চোরাচালানের রাস্তা।

ইণ্ডিয়ানা। বিখ্যাত এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার গ্রেফতার হল ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাত করার অভিযোগে।

ক্যানসাস সিটি। মূল্যবান চোরাই মালামাল ভর্তি একটা গুদামঘর রেইড করা হল।

অ্যারিজোনা। ছ'জন গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করা হল।

নেপলস্। একটা বিরাট কোকেন ফ্যাক্টরি সিজ করা হল।

লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল সারাদেশে।

টেলিফোনে কিছুতেই জেনিফারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে ওর অফিসে এসে উপস্থিত হল অ্যাডাম ওয়ার্নার।

এতদিন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সিনথিয়া চিনতে পারল তাকে।

তার প্রশ্নের জবাবে নার্ভাসভাবে সে বলল, 'আমি দুঃখিত, সিনেটর ওয়ার্নার। মিস জেনিফার পার্কার দেশের বাইরে গেছেন।'

'কোথায়?'

'সিঙ্গাপুরে।'

'সিঙ্গাপুরের ঠিকানা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার।'

মাথা ঝাঁকাল সিনথিয়া। হোটেল সাংগ্রিলা, সিঙ্গাপুর।

আশ্বস্ত হল ওয়ার্নার। এখনও সময় আছে। এর মধ্যেই টেলিফোনে সাবধান করে দেয়া যাবে ওকে।

গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরোল জেনিফার। এমন সময় হোটেলের হাউস-কিপার ঢুকল ঘরে। একটু যেন থমকে গেলেন মহিলা।

'মাফ করবেন। আজ কখন আপনি রুম ছেড়ে দিচ্ছেন, মিস পার্কার?'

'আজ তো রুম ছাড়ার কথা নয়। আগামীকাল আমার যাবার কথা,' একটু আশ্চর্যই হল জেনিফার।

অবাক চোখে চাইলেন মহিলা। অপ্রস্তুত গলায় বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে রুমটা ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে রাখতে। রাতেই নাকি নতুন বোর্ডার আসবেন।'

রাগ হল জেনিফারের। 'কে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে?'

'ম্যানেজার।'

নিচে। সুইচবোর্ডে একটা ওভারসিজ কল এসেছে। ডিউটি বদল হয়েছে। অপারেটর মেয়েটি নতুন, তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিও। মাউথপিসে কথা বলছে অপারেটর, যেন ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না। 'কী বলছেন?...নিউইয়র্ক সিটি থেকে জেনিফার পার্কারের কল?'

পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে ঘুরে তাকাল মেয়েটি। এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে নিষেধ করল তাকে লোকটি।

মেয়েটি মাউথপিসে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত। মিস পার্কার আজই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

ধ্বংস-অভিযান চলতেই থাকল। হন্ডুরাস, সান সালভাডর, তুরস্ক আর মেক্সিকোতে শত শত লোক গ্রেফতার হলো। ধসে পড়ল ফোর্ট লডার ডেল, আটলান্টিক সিটি আর পাম স্প্রি-এ মাফিয়ার বিশাল নেটওয়ার্ক।

অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলতে থাকল ঢালাও ম্যাসাকার।

নিউইয়র্কে রবার্ট ডি সিলভা নিজের অফিসে বসে কলকাঠি নাড়ছে। পুরো অপারেশনের দায়িত্ব তাঁর হাতে। জালটা যতই গুটিয়ে আনছেন, যতই এগিয়ে যাচ্ছেন মোরেত্তি আর জেনিফারের কাছাকাছি, ততই আনন্দে আটখানা হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

অল্পের জন্যে বেঁচে গেল মোরেত্তি। রোসাকে নিয়ে শ্বশুরের কবরে ফুল দিতে গিয়েছিল সে।

বেরিয়ে যাবার ঠিক পাঁচ মিনিট পর এফ.বি.আই. এজেন্টরা হানা দিল মোরেত্তির বাসভবনে। ওখানে তাকে না-পেয়ে ওর অফিস রেইড করা হল। সেখানেও পাওয়া গেল না তাকে।

দু-জায়গাতেই ধৈর্য ধরে মোরেত্তির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল পুলিশ।

হাউসকিপার বিদায় নেবার পর জেনিফারের হঠাৎ খেয়াল হল, স্তেফানের জন্যে প্লেনে রিজার্ভেশন করতে ভুলে গেছে ও। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনে ফোন করল।

'আমি জেনিয়ার পার্কার বলছি। আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইট ওয়ান-টুয়েলভে একটা বুকিং আছে আমার। লন্ডনের ফ্লাইট এটা। এ-মুহূর্তে আমার আরও একটা রিজার্ভেশন দরকার।'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ভদ্র আর নম্রভাবে জবাব দিল এয়ারলাইন কর্মচারী।

'ধন্যবাদ। আপনি লাইনে থাকুন, দেখি ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

পাঁচ মিনিট পর আবার ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর। 'আপনি কি মিস পার্কার? আর-এ-এইচ-এম-এ-এন?'

'জ্বী।'

'দুঃখিত, মিস। আপনার রিজার্ভেশন বাতিল করা হয়েছে।'

'বাতিল করা হয়েছে!' আকাশ থেকে পড়ল জেনিফার। 'কী বলছেন আপনি? কে বাতিল করল?'

'সেটা তো আমাদের জানার কথা নয়। এ-মুহূর্তে প্যাসেঞ্জার লিস্টে আপনার নাম নেই।'

'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়ে গেছে। আপনি আমাকে আরেকটা রিজার্ভেশন দিন। আমাকে কাল অবশ্যই যেতে হবে,' আতঙ্কিত বোধ করল জেনিফার।

'আমি খুব দুঃখিত, মিস পার্কার। ফ্লাইট ওয়ান-টুয়েলভে কোনো সিট খালি নেই, সবই বুকড্ হয়ে গেছে।'

দিশেহারা হয়ে গেল জেনিফার। এসব রহস্যের সমাধান ইন্সপেক্টর ডেভিড তাউ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না। আজ তাঁর সঙ্গে ডিনার করার কথা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল জেনিফার।

একটু আগেভাগেই এসে পড়লেন ইন্সপেক্টর। খবর পেয়ে নিচে নেমে এল জেনিফার। রাগে ফুঁসছে। হোটেলের রুম আর টিকেটের গণ্ডগোলের কথা বলল তাঁকে জেনিফার।

কাঁধ ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। 'আর বলবেন না! এখানের রীতিনীতিই এরকম। একফোঁটা দায়িত্ববোধ নেই কারও। মন দিয়ে কাজ করে না একটা লোক!' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। 'আমি খুব দুঃখিত, মিস পার্কার। আজই ব্যাপারটা চেক করে দেখব।'

একটু নিশ্চিন্ত হল জেনিফার। 'আর স্তেফানের খবর কী?'

'সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালে ছেড়ে দেয়া হবে ওকে।'

শোফারকে চাইনিজ ভাষায় কী যেন বললেন ইন্সপেক্টর। সঙ্গে সঙ্গে ইউ-টার্ন নিয়ে দিক পরিবর্তন করল গাড়িটা।

ইন্সপেক্টর হাসলেন জেনিফারের দিকে চেয়ে। 'আপনাকে কালাং রোডটা দেখানো হয়নি। দেখার মতো আরেকটা জায়গা।'

আবার কী দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন ওকে ইন্সপেক্টর! ভয় পেল জেনিফার। দুনিয়ার সব উদ্ভট আর বিদঘুটে জিনিসের প্রতিই ইন্সপেক্টরের যত উৎসাহ!

ল্যাভেন্ডার স্ট্রিটে পড়ল গাড়িটা। একটা ব্লক পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিল

কালাং বাহরুর দিকে। রাস্তার দুদিকে বড় বড় সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর দামি দামি সব কফিনের বিজ্ঞাপন।

'আমরা কোথায় এসেছি?'

জেনিফারের দিকে ফিরে শান্ত গলায় জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর, 'আমরা এখন আছি স্ট্রিট উইথ নো নেম-এ। বেনামী সড়কও বলতে পারেন।'

হঠাৎ করে গাড়ির গতি কমে গেল। রাস্তার দুদিকে শুধু আন্ডারটেকারদের অফিস। অদ্ভুত সব নাম ট্যান কি সেঙ, ক্লিন নোহ্, ল্যাঙ ইয়ুঙ ল্যাভ, গোহ্ সুন। সামনের একজায়গায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছে। পরিবারের শোকাহত সব সদস্য আর বন্ধুবান্ধবরা সাদা পোশাকে সজ্জিত, একপাশে করুণ সুরে ব্যান্ড বাজছে। একটা সরু টেবিলের ওপর বৃদ্ধ এক লোকের মৃতদেহ রাখা হয়েছে, বুকের ওপর রাজ্যের ফুল—মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন। মাথার কাছে দাঁড় করানো আছে মৃতব্যক্তির বিরাট একটা ছবি। টেবিলের চারদিক ঘিরে চেয়ার পেতে বসে কী যেন খাচ্ছে সবাই। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

ইন্সপেক্টরের দিকে ঘুরে তাকাল জেনিফার। তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইল, 'ব্যাপার কি?'

'এগুলো হল মৃত্যুর ঘর। স্থানীয় লোকেরা বলে 'মৃতের বাড়ি', সরাসরি তাকালেন তিনি জেনিফারের চোখে। 'কিন্তু মৃত্যুটা তো জীবনেরই একটা অঙ্গ। তাই না, মিস পার্কার?'

ইন্সপেক্টরের মাছের মতো ঠাণ্ডা চোখের দিকে চাইতেই ভয়ের একটা শিরশিরে স্রোত নেমে গেল জেনিফারের শিরদাঁড়া বেয়ে।

বিখ্যাত 'গোল্ডেন ফিনিক্স' হোটেলে খেতে এল ওরা। চেয়ারে না-বসা পর্যন্ত চেষ্টা করেও কথা বলতে পারল না জেনিফার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। শুধু মনে হচ্ছে, ওর অজান্তে কোথায় যেন ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে।

'ইন্সপেক্টর, আমাকে ক্রোকোডাইল ফার্ম আর মৃতের বাড়ি দেখানোর পেছনে কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?'

অর্থপূর্ণ চোখে ইন্সপেক্টর সরাসরি তাকালেন জেনিফারের দিকে। 'অবশ্যই! আমি ভেবেছিলাম, এসব ব্যাপারে উৎসাহ খুঁজে পাবেন আপনি। বিশেষ করে স্তেফানের মতো জঘন্য অপরাধীকে যখন ছাড়িয়ে নিতে এসেছেন, তখন ধরেই নেয়া যায় যে আপনি মৃত্যু আর হিংস্রতা দুটোই ভালোবাসেন,' রাগে জ্বলতে থাকল ইন্সপেক্টরের চোখ দুটো। 'আমাদের তরুণ সম্প্রদায় আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে পাচার করা ড্রাগস্ তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এদের চিকিৎসার জন্যে যে হাসপাতাল আছে, সেটা আপনাকে দেখাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরে

ভাবলাম, এডিক্টদের পরিণতি কী, সেটাই আপনাকে আগে দেখানো দরকার। এজন্যেই মৃতের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম আপনাকে।'

রাগ হল জেনিফারের। 'দেখুন, এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই আমার। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি।'

'প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর মতামত রয়েছে,' কঠোর ঠাণ্ডা স্বরে বললেন ইন্সপেক্টর।

'দেখুন, ইন্সপেক্টর, আমার ধারণা প্রচুর টাকা দেয়া হয় আপনাকে...'

'আমাকে সন্তুষ্ট করার মতো টাকা এ পৃথিবীতে কারোরই নেই,' ধমকে উঠলেন তিনি।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জেনিফারের পেছন দিকে কাকে যেন ইশারা করলেন, মাথা ঝাঁকিয়ে জেনিফারকে দেখিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে পেছনে ফিরে তাকাল জেনিফার। ধূসর রঙের সুট-পরা দুজন লোক এগিয়ে আসছে ওদের টেবিলের দিকে।

'মিস জেনিফার পার্কার?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'জ্বী।'

পরিচয়পত্র বের করার কোনো দরকার ছিল না ওদের। তারা মুখ খোলার আগেই চিনতে পেরেছে জেনিফার। এফ.বি. আই.।

পরিচয়পত্র বের করে তারা জেনিফারের চোখের সামনে ধরল, মুখে বলল, 'এফ. বি.আই.। আমাদের কাছে আপনার নামে ইস্যু করা একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে। আজকের মধ্যরাতের ফ্লাইটে আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিউইয়র্কে ফিরে যেতে হবে।'

ছত্রিশ

কবরস্থানে এমনিতেই বেশকিছুটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে মোরেত্তির। একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল একজনের সঙ্গে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। সময় পেরিয়ে গেছে। ঠিক করল, অফিসে ফোন করে নতুন করে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে রাখতে বলবে।

রাস্তার পাশের এক টেলিফোন বুথে থামল মোরেত্তি। অফিসের নাম্বার ঘোরাল।

'অ্যাকমে বিল্ডার্স,' ওর পি. এ.-র গলা শোনা গেল।

'মাইকেল বলছি। এক্ষুনি...'

'মিস্টার মোরেত্তি এ-মুহূর্তে অফিসে নেই। পরে আবার চেষ্টা করুন।'

শরীরের সমস্ত মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেল মোরেত্তির। বিপদ! 'টনি'স প্লেস,' শব্দ দুটো উচ্চারণ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল মোরেত্তি।

দৌড়ে গাড়িতে উঠল। রোসা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, অ্যান্টোনিও? তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কোনো বিপদ হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপাতত বাড়িতে না-ফেরাই ভালো। তোমাকে তোমার খালাত ভাইয়ের বাসায় নামিয়ে দিচ্ছি। আমি খবর না-দেয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে।'

রোসাকে নামিয়ে দিয়ে সোজা টনি'স প্লেসে চলে এল মোরেত্তি। চট করে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ল। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার দৌড়ে এল ওকে দেখে।

'আমি খবর পেয়েছি আপনার বাড়ি আর অফিসে পুলিশ গিজগিজ করছে। ভাগ্যিস, আপনার কিছু হয়নি! খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'ধন্যবাদ, টনি,' চিন্তিত মুখে চুলে হাত বোলাল মোরেত্তি। 'আর লক্ষ্য রাখবে, কেউ যেন বিরক্ত না করে আমাকে।'

'আমি থাকতে সে সাহস কেউ পাবে না, স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারেন।'

রেস্তোরাঁর পেছনদিকে ওর ছোট্ট অফিস-কাম-রেস্টরুমে চলে এল মোরেত্তি। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

টেলিফোন তুলে নিল সময় নষ্ট না করে।

মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে জেনে গেল মোরেট্টি, ভরাডুবি হয়েছে ওর। চারদিক থেকে যতই গ্রেফতার আর রেইডের খবর আসতে লাগল, ততই মোরেট্টির অবিশ্বাসের মাত্রা বাড়তে লাগল। এ কেমন করে সম্ভব! অর্ধেকেরও বেশি সোলদাতি আর লেফটেন্যান্ট গ্রেফতার হয়ে গেছে, বড় গুদামগুলো সিজ করা হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে সবক'টা বড় বড় জুয়ার আড্ডা। এমনকি অফিসে যেসব গোপনীয় কাগজপত্র ছিল, সবই এখন পুলিশের হাতে। দুঃস্বপ্নের মতো ঘটে গেছে সবকিছু।

সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মোরেট্টির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? জেনিফার? হতে পারে, সে ওয়ার্নারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু পরিবার বা সংগঠনের ভেতরের খবর বলতে গেলে কিছুই জানে না ও। শুধু ওর একার পক্ষে এতবড় বিপর্যয় টেনে আনা অসম্ভব!

মাফিয়ার অন্যান্য পরিবারগুলোর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগা করল মোরেট্টি। সবাই জানতে চাইছে ফুটোটা কোথায়! শুধু মোরেট্টি-পরিবারই নয়, সবগুলো পরিবারেই একসঙ্গে বিপর্যয় নেমে এসেছে। খেপে গেছে সবাই মোরেট্টির ওপর। কারণ সবাই নিশ্চিত, মোরেট্টির পরিবারেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

লাস ভেগাসের ডন জিমি গার্ডিনো সাবধান করে দিলেন মোরেট্টিকে— 'আমাকে কমিশনের পক্ষ থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করা হয়েছে, মাইকেল,' কোনো পরিবার বিপদে পড়লে বা দুর্বল হয়ে পড়লে ন্যাশনাল কমিশন তার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। 'পুলিশ কিন্তু সবগুলো পরিবারের পেছনেই লেগেছে। বড় কোনো চাঁই পুলিশের কাছে গলা ছেড়ে গান গাইছে। আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তোমার পরিবারের মধ্যেই রয়েছে এই ফুটোটা। যাই হোক, চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাকে দেয়া হল তাকে খুঁজে বের করার জন্যে,' জবাবের অপেক্ষা না করে রিসিভার আছড়ে ফেললেন ডন।

অতীতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, এমন নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুনোপুঁটিরা পুলিশের প্যাঁদানি খেয়ে ভুল করে 'ওমের্তা' ভেঙে মুখ খুলে ফেলেছে, এমনটাই দেখা গেছে। কী-ই বা জানত তারা! তাই খুব একটা ক্ষতি কখনোই করতে পারেনি পুলিশ। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি জায়গামতোই পৌঁছে যেত যথাসময়ে।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকমের। ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠেছে সংগঠনের। এই প্রথমবারের মতো অন্য সব পরিবারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোরেট্টি-পরিবার। *'বড় কোনো চাঁই পুলিশের কাছে গলা ছেড়ে গান গাইছে...তোমার পরিবারের মধ্যেই আছে ওই ফুটোটা,'* ঠিকই বলেছেন লাস ভেগাসের ডন। কারণ মোরেট্টির পরিবারকে ঘিরেই শুরু হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ।

মোরেট্টির পেছনেই সবার আগে লেগেছে পুলিশ। নিশ্চয়ই কেউ প্রমাণসহ তথ্য তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। তা না হলে পুলিশ কিছুতেই এতবড় ঝুঁকি নিত না। কিন্তু কে সে? রুমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঝড়ের বেগে পায়চারি করতে থাকল মোরেট্টি। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে মনে মনে।

নিশ্চয়ই খুব কাছের কেউ। এসব তথ্য সামান্য দু-একজন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। সুতরাং সহজেই বৃত্তটাকে ছোট করে আনা যায়। কোলেল্লা, সালভাতর, নিক ভিটো, আর মোরেট্টি স্বয়ং— এই চার জনের মধ্যেই পারিবারিক গোপনীয়তা সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য কেউ তার অর্ধেকও জানে না। অবশ্য আরও একজন জানতেন, টমাস কোলফ্যাক্স। কিন্তু সহজেই তাঁকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়। নিউ জার্সির জাঙ্ক ইয়ার্ডের ময়লার নিচে তাঁর হাড় ক'খানা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল, অফিসের যে গোপন জায়গায় লেজারগুলো লুকানো ছিল, সে জায়গাটা চিনত না নিক ভিটো। আগে থেকে না জানলে পুলিশের বাপ-দাদারও সাধ্য ছিল না জায়গাটা খুঁজে বের করে। তার মানে, নিক ভিটোকে আপাতত সন্দেহের বাইরে রাখা যায়।

বাকি রইল সালভাতর আর কোলেল্লা। এ দুজনের কেউ ওমের্তা ভেঙে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কোনোভাবেই তা বিশ্বাস করা যায় না। প্রথম থেকেই ওরা আছে মোরেট্টির সঙ্গে। রাস্তা থেকে তুলে এনে ওদেরকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে মোরেট্টি। এমনকি স্বাধীনভাবে কিছু সুদের ব্যবসা আর নারী-ব্যবসা করার অনুমতিও তাদের দিয়েছিল সে। তাহলে কেন ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে? অবশ্য একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে— সিংহাসনের লোভ। ভেবেছে, মোরেট্টিকে সরিয়ে দিতে পারলে সহজেই তার জায়গা দখল করে নেয়া যাবে। হয়তো সেজন্যেই ওরা দুজনেই একসঙ্গে কাজ করছে মোরেট্টির বিরুদ্ধে।

খুনের নেশায় পেয়ে বসল মোরেট্টিকে। রক্ত চাই! রক্ত! কুত্তার বাচ্চারা ওর সর্বনাশ চেয়েছিল, কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ করার জন্যে বেশিক্ষণ সময় দেয়া যাবে না ওদের।

কিন্তু সবচেয়ে আগে গ্রেফতার হয়ে যাওয়া অনুচরদের জন্যে জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বাস করা যায়, এমন একজন উকিল দরকার। কোলফ্যাক্স মৃত, আর জেনিফার— জেনিফার! আবার সেই উন্মাদনা ফিরে এল মোরেট্টির রক্তে। মনে পড়ে গেল জেনিফারকে বলা ওর শেষ কথাগুলো— 'কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো। তোমাকে মিস করব আমি।...তোমাকে ভালোবাসি,' অন্তর থেকে কথাগুলো বলেছিল মোরেট্টি, অথচ সে-ই কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করল! এর উপযুক্ত দাম দিতে হবে জেনিফারকে।

একটা কল বুক করে অপেক্ষা করছিল মোরেত্তি। মিনিট পনেরো পরে দৌড়ে অফিসে এসে ঢুকল নিক ভিটো। ওকে একটু আগে বাড়ি আর অফিসের অবস্থা দেখে আসতে পাঠিয়েছিল মোরেত্তি।

'কী অবস্থা, ভিটো?' জানতে চাইল সে।

'পুলিশের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। বাড়ি আর অফিস— দু-জায়গাতেই কয়েকবার টহল মেরেছি। কিন্তু আপনার কথামতো দূরেই ছিলাম, কাছে যাইনি,' হাঁপাচ্ছে নিক ভিটো।

'তোমার জন্যে একটা কাজ আছে, ভিটো।'

'অবশ্যই বস্, বলুন, কী করতে হবে?'

'সালভাতর আর জোকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।'

জীবনেও এত অবাক হয়নি নিক ভিটো। 'আমি...মানে, বুঝতে পারছি না...আপনার ভাষায় শিক্ষা দেয়া মানে...আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছেন না যে...'

রাগে চিৎকার করে উঠল মোরেত্তি। 'আমি বলতে চাচ্ছি, ওদের দুজনের নোংরা মগজ দুটো উড়িয়ে দাও। এখন বুঝতে পেরেছ তো? নাকি কেমন করে তা করতে হবে, তা-ও শিখিয়ে দিতে হবে।'

'না-না,' ভয়ে তোতলাতে শুরু করল নিক ভিটো। 'আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম...মানে, কার্লো আর জো দুজনেই আপনার সেরা লোক।'

ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মোরেত্তি। ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তার সুন্দর চেহারাটা। 'তুমি কি আমাকে ব্যবসা শেখাতে চাইছ, ভিটো?'

'না না, বস্। আমাকে ভুল বুঝবেন না,' দুপা সরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল নিক ভিটো। 'আপনার হয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি আমি। কিন্তু... মানে, কখন?'

'এক্ষুনি। এই মুহূর্তে। আজকে রাতের চাঁদ যেন ওরা দেখতে না পায় বুঝেছ?'

'জ্বী। বুঝতে পেরেছি।'

দুহাত মুঠি পাকাল মোরেত্তি। 'আমার হাতে যদি যথেষ্ট সময় থাকত, তবে নিজের হাতে খুন করতাম শুয়োরের বাচ্চাদুটোকে। আমি চাই, ওরা কষ্ট পেয়ে মরুক। বুঝতে পারছ তো, নিক? ধীরে ধীরে খুন করবে ওদের।'

' "সুপ্পিলু সুপ্পিলু", ' দেশীয় ভাষায় নিক ভিটোকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল ওদের জন্যে ঠিক কীরকম মৃত্যু ও চাইছে।

'ঠিক আছে, বস্,' ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে নিক ভিটোকে।

হঠাৎ দরজা খুলে ম্যানেজার টনি হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। রক্ত সরে গেছে তার মুখ থেকে। হড়বড় করে বলে ফেলল, 'বাইরে দুজন এফবিআই এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে আপনার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি,

বস্, আমি এর কিছুই জানি না। তারা...'

দ্রুত নিক ভিটোর দিকে ফিরে তাকাল মোরেত্তি। 'ওদেরকে বলো, দুটো মিনিট যেন কষ্ট করে একটু ধৈর্য ধরে। টুকিটাকি দু-একটা নাম্বার ঘোরাল। এক মিনিট পরে কথা বলতে পারল নিউইয়র্কের সুপিরিয়র কোর্টের বিচারকের সঙ্গে।

'বাইরে দুজন এফবিআই অপেক্ষা করছে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে।'

'কী অভিযোগ আনা হয়েছে, জানেন কি?'

'না, জানি না। তাছাড়া জানার কোনো আগ্রহও আমার নেই। আমি আপনাকে ফোন করেছি যত দ্রুত সম্ভব জামিনের ব্যবস্থা করার জন্যে। হাজতে বসে থাকার মতো সময় আমার নেই, এদিকে প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলের জাজ। অবশেষে মোরেত্তির ধৈর্যের বাঁধ যখন ধসে পড়ার উপক্রম, তখন আমতা আমতা করে বলতে শুরু করলেন, 'আমি দুঃখিত, মাইকেল। মানে... এমন অবস্থায় তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে পারব না। সারাদেশে ধরপাকড় চলছে। এ অবস্থায়...'

বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলতে শুরু করল মোরেত্তি, শুনে পিলে চমকে উঠল জজ সাহেবের। 'মন দিয়ে শুনুন, খুব ভালো কথা বলতে যাচ্ছি আমি। একটা ঘণ্টাও যদি আমাকে হাজতে কাটাতে হয়, তবে প্রতিজ্ঞা করছি—সারা জীবনের জন্যে জেলের ভাত খাওয়াব আপনাকে। বহুদিন ধরেই আমি আপনার দেখাশোনা করছি। আপনি কি চান যে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে আমি বলে দিই, ঠিক কটা মামলায় আমাকে আপনি জিতিয়ে দিয়েছেন? অথবা নাম্বারটা আমি জানিয়ে দিই? তার চেয়েও ভালো হয় যদি...'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, মাইকেল! এমন নিষ্ঠুর আচরণ কোরো না!'

'তাহলে এক্ষুনি কাজে লেগে পড়ুন।'

'দেখি, কী করতে পারি,' ভয়ে চুপসে গেছেন ভদ্রলোক। 'আমি চেষ্টা করব...'

'চেষ্টা করবেন!' ধমকে উঠল মোরেত্তি, 'চেষ্টার কথা শুনতে চাই না আমি। শুধু জানি, কাজটা আপনি করে দেবেন। শুনতে পাচ্ছেন তো! এক্ষুনি শুরু করুন, ' রিসিভারটা ক্রেডলে আছড়ে ফেলল মোরেত্তি।

আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল মোরেত্তি। মগজটা আবার দ্রুত কাজ করতে শুরু করেছে, সম্পূর্ণ শান্তভাবে।

হাজতের ব্যাপারে এ-মুহূর্তে ওর মাথায় কোনো চিন্তা নেই। জানে, যে-কোনোকিছুর বিনিময়ে ওর বেতনভুক্ত জাজ বের করে নিয়ে আসবে ওকে। নিক ভিটোর ওপরেও যথেষ্ট আস্থা আছে মোরেত্তির। ঠিকমতোই তার দায়িত্ব পালন করবে সে। কার্লো আর কোলেল্লার সাক্ষ্য ছাড়া মোরেত্তিকে ফাঁসানো খুব একটা

সহজ হবে না।

দেয়ালে ঝোলানো চারধারে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা বেলজিয়াম আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল মোরেট্টি। র‍্যাক থেকে হাতির দাঁতের চিরুনি তুলে নিয়ে যত্নের সঙ্গে মাথাটা আঁচড়ে নিল। বেঁকে যাওয়াটাই ঠিক করে নিল। তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে বাইরে বেরিয়ে এলএফবিআই এজেন্টেদের হাতে ধরা দিতে।

জাজ তাঁর কাজ ঠিকমতোই করেছেন। যদিও এ ব্যাপারে মোরেট্টির কোনো সন্দেহ ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর পছন্দমতো একজন উকিলকে দিয়ে প্রাথমিক শুনানির সময় জামিনের আবেদন করলেন। জামিনের পরিমাণ ঠিক করা হল পাঁচশো হাজার ডলার।

অসহ্য রাগ আর হতাশায় ভেঙে পড়লেন রবার্ট ডি সিলভা। তাঁর নিরুপায় দৃষ্টির সামনে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল মোরেট্টি।

সাঁইত্রিশ

নিক ভিটোর মগজে হলুদ পদার্থের পরিমাণ খুবই কম। সত্যিকার অর্থে মাত্র দুটো কারণেই সংগঠনে সে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে এসেছে। প্রথমত, কোনো প্রশ্ন না করেই আদেশ পালনে অভ্যস্ত সে। দ্বিতীয়ত, সাধারণত তার কাজে কোনো খুঁত থাকে না। বহুবার তাকে রিভলভার, পিস্তল আর ছোরার বিরুদ্ধে পড়তে হয়েছে, কিন্তু কখনও ভয় কাকে বলে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সত্যিকার ভয় কাকে বলে, এতদিন পর সেটা বুঝতে পারছে সে। ওর বোধশক্তির বাইরে কোথাও ভয়ংকর কিছু ঘটে যাচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে, যা ঘটছে সবকিছুর পুরো দায়িত্ব ওর নিজের। ওর কারণেই সংগঠনের এই অন্তিম দশা উপস্থিত হয়েছে।

সারাদিন ধরেই নিক ভিটো শুনেছে কী হারে সারাদেশে রেইড, গ্রেফতার আর ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গেছে। ওদের সংগঠনকে কেন্দ্র করে বাজারে জোর গুজব—সংগঠনের কোনো কর্তাব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সীমিত বুদ্ধি দিয়েও নিক ভিটো বুঝতে পারছে, কোলফ্যাক্সকে প্রাণে না মেরে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার পরপরই দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে সংগঠনের মাথার ওপর। অদৃশ্য কেউ যেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে সংগঠন ও পরিবারের বিরুদ্ধে। নিক ভিটো জানে সালভাতর কিংবা কোলেল্লা এসবের জন্য দায়ী নয়। এ দুজনকে সে আপন ভাইয়ের চেয়েও ভালোবাসে। ওরা দুজনেও মাইকেল বলতে অজ্ঞান। প্রাণ গেলেও কোনদিন মাইকেলের সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু এ কথা মোরেট্টিকে বলা যাবে না এখন। বললে একঘন্টার মধ্যেই ওর শরীরের মাংসের কুচিগুলোকে কবর দেবে মোরেট্টি। কারণ সালভাতর আর কোলেল্লা ছাড়া অন্য আর একজনই আছে, যাকে দোষী বলে মনে করা যায় সে হলো কোলফ্যাক্স। আর মাইকেল জানে কোলফ্যাক্স মৃত।

অনিশ্চয়তায় দুলছে নিক ভিটোর মন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে নিজেকে যতটা ভালোবাসে, ঠিক ততটাই ভালোবাসে ও সালভাতর আর কোলেল্লাকে। ওরা দুজনেই কোলফ্যাক্সের মতো অসংখ্য উপকার করেছে ওর।

সারাজীবন চেষ্টা করলেও সে ঋণ শোধ করতে পারবে না নিক।

কিন্তু কোলফ্যাক্সের ঋণ শোধ করার ফল তো হাতে হাতেই পাচ্ছে। ও আবার একই ভুল করবে ও? কক্ষনো না। মনটাকে শক্ত করে নিল ভিটো। এখন নিজের জীবন বাঁচাতে হবে ওকে। সালভাতর আর কোলেল্লাকে মরতেই হবে। তবেই ও নিশ্চিন্ত। কিন্তু যেহেতু ওরা ওর ভাইয়ের মতো সেহেতু একটু দয়া দেখাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিক ভিটো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করবে ওদের জন্যে। মোরেট্টি তো আর দেখতে আসবে না!

সালভাতর আর কোলেল্লার সারাদিনের রুটিন মুখস্থ নিক ভিটোর। সালভাতরকে এখন পাওয়া যাবে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মের কাছে ওর রক্ষিতার অ্যাপার্টমেন্ট। প্রতিদিন ঠিক পাঁচটার সময় ওখান থেকে বাড়িতে বউয়ের কাছে ফিরে যায় কার্লো। এখন বাজে তিনটে।

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে, নাকি সোজা ওপরে চলে যাবে, এ নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল নিক। নাহ্! সোজা ওপরে গেলেই নার্ভাস বোধ করছে নিক, সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। নার্ভাস লাগছে ব্যাপারটা টের পেয়ে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। ঠিক করল, এদিকের কাজকর্মগুলো ভালোয় ভালোয় শেষ হলে মোরেট্টির কাছে লম্বা একটা ছুটি চাইবে।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের এককোণে গাড়িটা পার্ক করে রাখল নিক ভিটো। হেঁটে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল। চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে পকেট থেকে একটুকরো সেলুলয়েড বের করে চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে চাড় দিল। অনায়াসে খুলে গেল সদর দরজা। এলিভেটরের দিকে না-তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে এল তিনতলায়। করিডোরের শেষ মাথার দরজাটায় চিৎকার করে বলল, 'দরজা খোলো! পুলিশ!'

দরজার ওপাশ থেকে ধুপধাপ শব্দ ভেসে এল। ভয় পেয়েছে ওরা। একটু পরেই দরজা খুলে গেল খানিকটা, ভেতরে মোটা একটা চেইন দিয়ে আটকানো। দু'ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে সালভাতরের রক্ষিতা মারিনার ভয়ার্ত চেহারা আর ফর্সা শরীরের কিছুটা দেখা গেল। নিককে দেখে ভয়ের চিহ্ন কেটে গিয়ে বিরক্তি ফুটে উঠল চেহারায়। 'নিক! বোকা গাধা কোথাকার! এটা কোন্ ধরনের ঠাট্টা?'

দরজার চেইনটা খুলে নিক ভিটোকে ভেতরে আসতে দিল সে। তারপর পেছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'স্যাল, পুলিশ নয়, নিক এসেছে।'

বেডরুমের দরজা দিয়ে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল সালভাতর। 'কী ব্যাপার, নিক? কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এখানে চলে এলে!'

'স্যাল, মোরেট্টির কাছ থেকে তোমার জন্যে একটা ম্যাসেজ নিয়ে এসেছি।'

সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট টু-টু অটোমেটিকটা উঁচু করে ট্রিগারে চাপ দিল নিক ভিটো। ফায়ারিং পিনটা আছড়ে পড়ল পয়েন্ট টু টু ক্যালিবারের কারটিজের ওপর। মাজল দিয়ে বেরিয়ে আসা বুলেটটার গতি এখন সেকেন্ডে হাজার ফিট। প্রথম বুলেটটা কার্লোর নাকের বাঁশি উড়িয়ে দিল, দ্বিতীয়টা সোজা ঢুকল বাঁ চোখে। ঠিকরে আসা চোখে চিৎকার করার জন্যে মাত্র হাঁ করে ছিল মারিনা, নির্দ্বিধায় ওর মুখের ভেতর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিল নিক। সাবধানের মার নেই!

মারিনার রক্তমাখা শরীরটার দিকে তাকিয়ে আফসোস হল নিকের। আহা! বড় সুন্দর ছিল মেয়েটা! কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না ওর।

কখনও কোনো সাক্ষীকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয় না মোরেট্টি।

জোসেফ কোলেল্লার একটা দামি রেসের ঘোড়া আছে। লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট পার্কে আজ সেটার অষ্টম প্রতিযোগিতা। কোলেল্লা নিককে অনুরোধ করেছিল ওর চমৎকার ঘোড়াটার ওপর বাজি ধরতে। আগে কয়েকবার কোলেল্লার ঘোড়া নিয়ে প্রচুর জিতেছে নিক। নিক উপস্থিত না-থাকলেও কোলেল্লা দৌড়ের সময় ওর নামে নিজের ঘোড়ার ওপর অল্প টাকার বাজি ধরে।

পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ট্র্যাকের দিকে এগোল নিক। কোলেল্লার বক্সটা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ খুব দুঃখ হল ওর। দুই বন্ধু মিলে আর কখনও এমন সুন্দর আবহাওয়ায় রেস দেখতে পারবে না!

চার নাম্বার দৌড় মাত্র শুরু হয়েছে। কোলেল্লার দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড ঘোড়াটা রাজকীয় ভঙ্গিতে সবগুলোকে ছাড়িয়ে সামনে এসে পড়েছে। বক্সের মধ্যে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে কোলেল্লা, দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উৎসাহ, আকাশ-বাতাস ফেটে পড়ছে তাদের চিৎকারে।

বক্সে ঢুকে কোলেল্লা পেছনে এসে দাঁড়াল নিক। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা, দোস্ত?'

'হেই, নিক! ঠিক সময়মতো এসে পড়েছ তুমি। আমার বিউটি কুইন এবার সহজেই জিতে যাচ্ছে। তোমার নামেও বাজি ধরেছি আমি।'

'সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জো।'

কোলেল্লার মেরুদণ্ডের ঠিক মাঝখানে পয়েন্ট টু টু অটোমেটিকটা চেপে ধরল নিক। কোটের ওপর দিয়েই পরপর তিনবার গুলি করল। কোলেল্লা অস্ফুট আর্তনাদ চারদিকের হর্ষধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে গেল। নিকের চোখের সামনে মাটিতে আছড়ে পড়ল কোলেল্লার লাশটা। একবার ভাবল ওর পকেট থেকে টিকেটটা বের করে নেবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিল না। বলা যায় না, হারতেও পারে ঘোড়াটা।

কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে বক্সের বাইরে বেরিয়ে এল নিক। মিশে গেল

হাজারো লোকের ভিড়ে।

মোরেট্টির ব্যক্তিগত ব্যবহারের লাল রঙের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'মিস্টার মোরেট্টি?'

'কে বলছেন আপনি?'

'আমি ক্যাপ্টেন ট্যানার।'

একটু চিন্তা করতেই চিনতে পারল মোরেট্টি। পুলিস ক্যাপ্টেন ব্রুস ট্যানার। প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয় লোকটাকে। মোরেট্টির বেতনভুকদের একজন।

'আমি মোরেট্টি।'

'খুব মূল্যবান একটা তথ্য পেয়েছি একটু আগে। শুনলে চমকে উঠবেন, আমি নিশ্চিত।'

'কোথেকে ফোন করছেন আপনি?'

'একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে।'

'তাহলে ঠিক আছে। এখন বলুন, তথ্যটা কী।'

'কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা আমি জানতে পেরেছি,' মোরেট্টিকে চমকে দিতে পেরেছে মনে করে খুশি হয়ে উঠল ট্যানার।

কিন্তু বেশি উৎসাহ পেল না মোরেট্টি! 'আপনি একটু দেরি করে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে ওদের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' আমি তো শুধু কনসিলিয়ারি কোলফ্যাক্সের কথাই জানি।'

'কী আবোল-তাবোল বকছেন, কোলফ্যাক্স তো বেঁচে নেই।'

এবার বিস্মিত হবার পালা ক্যাপ্টেন ট্যানারের। 'কী বলছেন আপনি, মিস্টার মোরেট্টি! কোলফ্যাক্স এই মুহূর্তে কোয়ানটিকোর মেরিন বেসে বসে সকলের সামনে ঝেড়ে কাশছেন!'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন!' ধমকে উঠল মোরেট্টি। 'আমি ভালো করেই জানি...' হঠাৎ থেমে গেল। কী ভালো করে জানে সে? নিক ভিটোকে পাঠিয়েছিল কোলফ্যাক্সকে খতম করার জন্যে, নিক এসে বলেছে কাজটা সে করেছে। ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করতে যায়নি মোরেট্টি। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল সে। 'আপনি কতটুকু নিশ্চিত যে কোলফ্যাক্স বেঁচে আছে?'

'মিস্টার মোরেট্টি, আপনার কি মনে হয় শুধু উড়ো খবর শুনেই ফোন করেছি আমি? নিশ্চিত না হলে আপনাকে জানাতাম না,' আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে ট্যানারের।

'হয়তো আপনিই ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। আমি এক্ষুনি খোঁজখবর করে

দেখছি। বড় রকমের একটা পাওনা রইল আপনার। শুধু অঙ্কটা জানিয়ে দেবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মিস্টার মোরেট্টি। খুশিতে বাগবাগ ক্যাপ্টেন ট্যানার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। মোরেট্টির মতো উদার মানুষ আর হয় না। বহুবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে ট্যানারের। এবার সবচেয়ে বেশি চাইবে বলে ঠিক করল ও। এত বেশি, যাতে আর চাকরি করতে না হয়। অবসর নিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে তাহলে।

টেলিফোন বুদ থেকে বেরিয়ে অক্টোবরের হিমেল হাওয়ায় এসে দাঁড়াল ট্যানার। শীত হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ও লক্ষ করেনি, বুদের দুপাশে দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল। ট্যানার এগোতে যেতেই পাশ কাটিয়ে সামনে এসে পথ বন্ধ করে দাঁড়াল তারা। আপাদমস্তক ওভারকোটে ঢাকা। একজন পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে মেলে ধরল ট্যানারের চোখের সামনে।

'ক্যাপ্টেন ট্যানার? আমি লেফটেন্যান্ট ওয়াইল্ড। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিভিশন। পুলিশ কমিশনার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল মোরেট্টি। সহজাত প্রবৃত্তিই ওকে বলে দিচ্ছে, নিক ভিটো মিথ্যে বলেছিল। কোলফ্যাক্স এখনও বেঁচে আছে। এই একটা সত্যকে দিয়েই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে। সব রহস্যের জট খুলে গেছে এখন। ওই একটা লোকই এ ধ্বংস টেনে এনেছে। হ্যাঁ, ওই লোকটাই!

অথচ নিক ভিটোকে ও পাঠিয়েছে সালভাতর আর কোলেল্লার মতো বিশ্বস্ত, সংগঠনের সেরা দুজন লোককে খুন করতে! হায় যিশু! কতবড় ক্ষতি হয়ে গেল! এই বোকামি শোধরাবার আর কোনো উপায় নেই। নিজের ওপরই প্রচণ্ড রাগ হল ওর।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে হবে।

বিশেষ একটা নাম্বারে ফোন করল মোরেট্টি। দু-মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। তারপর কথা বলল আরও এক জায়গায়।

কাজ সেরে নিজের আরামদায়ক রিভলভিং চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে থাকল মোরেট্টি।

যথাসময়ে বেজে উঠল টেলিফোন। নিক ভিটো। বহুকষ্টে কণ্ঠস্বরে রাগ গোপন রাখল মোরেট্টি। স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'সবকিছু ঠিক আছে তো, নিক?'

'অবশ্যই, বস্। আপনার কথামতোই ঘটেছে সবকিছু। মরার আগে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে ওরা দুজনই।'

'তোমার ঋণ কোনোদিন আমি শোধ করতে পারব না, নিক। অনেককিছু করেছ

তুমি আমার জন্যে।'

অবাক হল নিক। সোলদাতিদের সঙ্গে কখনও এই সুর কথা বলে না মোরেট্টি। 'ধন্যবাদ বস্,' বিস্ময় চেপে রেখে শান্ত স্বরেই কথা বলছে নিক।

'আরও একটা ছোট্ট কাজ তোমাকে করতে হবে, নিক। আমাদেরই এক ছেলে নাইনটি ফিফথ স্ট্রিট আর ইয়র্কের মোড়ে একটা গাড়ি রেখে গেছে। লেটেস্ট মডেলের পোর্শে, লাল রঙের। চাবিটা ড্যাশবোর্ডেই রাখা আছে। আজ রাতের একটা অপারেশনে ওই গাড়ি ব্যবহার করা হবে। গাড়িটা এখানে চালিয়ে নিয়ে আসতে হবে তোমাকে। পারবে না, নিক?'

'কেন পারব না, বস্? কখন দরকার হবে গাড়িটা? মানে, আমি একটু...'

'এক্ষুনি গাড়িটা চাই আমার। এই মুহূর্তে।'

'ঠিক আছে বস্। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

'গুডবাই, নিক।'

আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল মোরেট্টি।

বহু কাজ পড়ে আছে সামনে। জেনিফার ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। ওর অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা সেরে রাখতে হবে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই নাইনটি ফিফথ স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছে গেল নিক ভিটো। নিজের গাড়িটা পার্ক করে রাখল। দরজা খুলে নেমে চারদিকে চোখ করে রাখা আছে লাল রঙের পোর্শিটা। নিজের গাড়ি লক করে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সেদিকে পা চালাল নিক।

ইচ্ছে ছিল ছোটখাটো একটা বারে ঢুকে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবে। সকাল থেকে কম টেনশন তো যায়নি! কিন্তু মোরেট্টির কথা মনে হতে আর সে চেষ্টা করেনি। একবার ভুল করেছে, সেটাই যথেষ্ট। আর মাশুল দিতে চায় না সে।

পোর্শির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নিক। বন্ধ করে দিল দরজাটা। ভেতরে চমৎকার গরম। ড্যাশবোর্ড খুলে চাবি তুলে নিল নিক। ছোট্ট একটা মার্বেলের তৈরি নারীমূর্তির সঙ্গে ঝুলছে চাবিটা, মূর্তিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আঙুল বোলাল সেটার শরীরে। তারপর ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল।

প্রচণ্ড শব্দে গাড়িটার ছিন্নভিন্ন টুকরোগুলো লাফিয়ে উঠল আকাশে। আগুন ধরে গেছে চারপাশে। জনবহুল রাজপথ ছিটকে পড়ল নিক ভিটোর হাড়, মাংস আর মগজের টুকরো।

আটত্রিশ

যেন হলিউডের কোনো সিনেমার শূটিং হচ্ছে, বিরক্তির সঙ্গে ভাবলেন মেজর জেনারেল রয় ওয়ালেস, আর নায়ক হলেন একজন বন্দি।

মেরিন কোরের বিরাট কনফারেন্স রুমটা উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়ে। সিগন্যাল কোরে টেকনিশিয়ানরা চারদিকে ক্যামেরা, সাউন্ড আর লাইটিং ইকুইপমেন্টে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে।

কোলফ্যাক্সের পুরো বক্তব্য আজ ক্যামেরায় ধারণ করা হবে।

'এটা হল অতিরিক্ত সাবধানতা,' যুক্তি দেখালেন রবার্ট ডি সিলভা। 'আমরা জানি যে এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কেউ কোলফ্যাক্সের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারপরেও আমি মনে করি তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করে রাখা উচিত।'

সবাই তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করেছেন। এরচেয়ে ভালো আইডিয়া আর হয় না।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সবাই। আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেছেন তাঁরা। শুধুমাত্র কোলফ্যাক্সই অনুপস্থিত। সবকিছু রেডি হলে শেষ মুহূর্তে তাঁকে আনা হবে।

ঠিক একজন চিত্রতারকার মতোই।

বুশম্যান তাঁর সেলে বসে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ডেভিড টেরির সঙ্গে কথা বলছেন। এই ভদ্রলোক তাঁর নতুন পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করবেন।

'আপনাকে ফেডারেল উইটনেস সিকিউরিটি প্রোগ্রামটা ব্যাখ্যা করে বলি,' বললেন টেরি। 'আপনার শুনানি শেষ হবার পরেই আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব। আপনি যে-জায়গায় যেতে চান, বা যে দেশে যেতে চান, সেখানে নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও আমাদের। এখানে আপনার যে-সব আসবাবপত্র বা অস্থাবর সম্পত্তি আছে, সব ওয়াশিংটনের একটা ওয়্যারহাউসে কোড নাম্বার দিয়ে লুকিয়ে রাখা হবে। চিঠির মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। আপনার নতুন পরিচয় জানতে পারা বা পুরোনো পরিচয় সূত্র ধরে আপনাকে খুঁজে বের করার কোনো রাস্তাই থাকবে না। আপনার পছন্দমতো যে-কোনো পরিচয় আপনি বেছে নিতে পারেন, আমরা সব কাগজপত্র ঠিক করে দেব,' একটু হাসলেন তিনি। 'আর যদি চান, তবে নতুন চেহারাও পেতে পারেন। প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সেটা পরে চিন্তা করে দেখব,' চেহারার ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন কোলফ্যাক্স, কাউকেই তা জানাতে চান না।

'সাধারণত আমরা যখন কাউকে নতুন পরিচয়পত্র দিই, তখন তাকে এমন কোনো কাজে নিয়োগ করি, যেখানে সে দক্ষ। একই সঙ্গে তাকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যও করা হয়। তবে আপনার সম্ভবত টাকার প্রয়োজন নেই। তাই না, মিস্টার কোলফ্যাক্স?'

টেরি যদি কোনোভাবে জানতে পারতেন ঠিক কী পরিমাণ টাকা কোলফ্যাক্স জমিয়েছেন জার্মানি, হংকং আর সুইটজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কগুলোতে তাহলে তাঁর চেহারাটা কেমন হত, ভাবতে গিয়ে মনে মনে একচোট হেসে নিলেন কোলফ্যাক্স। তবে, সত্যি বলতে কি, সঠিক অঙ্কটা তিনি নিজেও জানেন না। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, নয় কি দশ মিলিয়ন ডলার আছে তাঁর।

'না,' বললেন কোলফ্যাক্স। 'আমার টাকার প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। এখন আপনার প্রথম কাজ, কোথায় যেতে চান, তা ঠিক করা। আপনি কি এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন?'

সহজ প্রশ্ন, যদিও অনেক কিছু নির্ভর করছে এর ওপর। আসলে প্রশ্নটা এভাবে করা উচিত ছিল— 'বাকি জীবনটা কোথায় কাটাতে চান আপনি?'

কারণ যে জায়গায় যাবেন তিনি, কোনোদিন আর সেখান থেকে নড়তে পারবেন না।

'ব্রাজিল,' একটা শব্দে উত্তর দিলেন তিনি।

এটাই একমাত্র জায়গা, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবেন তিনি। পানামানিয়ান কর্পোরেশনের নামে কেনা দুশো হাজার একরেরে বিরাট একটা খামার আছে তাঁর ব্রাজিলে। কেউ জানে না ওটার কথা। খামারবাড়িটাও প্রায় দুর্গের মতো করেই তৈরি করা হয়েছে। ওখানে যাবার পর কিছু পয়সাকড়ি খরচ করে দুর্ভেদ্য করে তুলবেন তিনি দুর্গটাকে। মোরেত্তি যদি কোনোদিন তাঁর খোঁজ পায়ও, আশেপাশে ঘেষার সুযোগ তার হবে না। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আরাম-আয়েশ কিনে নিতে পারবেন তিনি। সুন্দরী সব মেয়েকেও। বিশেষণ করে ল্যাটিন আমেরিকান মেয়েগুলোকে তাঁর খুব পছন্দ।

'কোনো সমস্যা নেই। সহজেই সব ব্যবস্থা করা যাবে। ব্রাজিলে ভালো কালেকশন আছে আমাদের', হাসিমুখে বলতে থাকলেন টেরি। 'সেখানে আপনার জন্যে ছোটখাটো একটা বাড়ি কিনে দেবেন ইউএস গভর্নমেন্ট...'

'তার কোনো প্রয়োজন হবে না', ছোটখাটো বাড়িতে থাকার কথা চিন্তা করে হাসি পেল কোলফ্যাক্সের। 'শুধু নতুন পরিচয়পত্র আর নিরাপদে যাবার ব্যবস্থা করে

দিন, আর কিছুই দরকার হবে না আমার।'

'যেমন আপনার ইচ্ছে, মিস্টার কোলফ্যাক্স,' উঠে দাঁড়ালের টেরি। 'আমি আমার কাজ শুরু করে দিচ্ছি। চিন্তা করবেন না, পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় থাকবে। মামলার শুনানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি প্লেনে চেপে বসতে পারবেন,' আশ্বাসের হাসি হাসলেন ভদ্রলোক। 'গুডলাক।'

'ধন্যবাদ।'

হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেলেন। বন্ধ দরজায় গায়ে হেলান দিয়ে খুশিতে ফেটে পড়লেন কোলফ্যাক্স। শেষপর্যন্ত সবগুলো বাধা পেরিয়ে এসেছেন দিনি। সেদিনের ছোকরা মোরেট্টি আন্ডারএস্টিমেট করেছিল তাঁকে। অবশ্য এটাই মোরেট্টির সর্বশেষ ভুল। কোলফ্যাক্স ওকে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে যাচ্ছেন, যেখান থেকে কোনোদিন আর উঠে আসতে পারবে না সে।

একটু পরেই তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হবে। ভাবতে বেশ মজা পেলেন কোলফ্যাক্স। আচ্ছা, ব্যাটারা কি তাঁর মেকআপ দেবে নাকি! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিলেন। খুব একটা খারাপ নয়। ভাবলেন তিনি, অন্ত ত এই বয়সে। কেউ তাঁকে থুত্থুড়ে বুড়ো বলতে পারবে না। আর কমবয়সী সাউথ আমেরিকান মেয়েগুলো ধূসর চুলের একটু বয়স্ক লোকই পছন্দ করে।

দরজা খোলার শব্দ শুনে ঘুরে তাকালের কোলফ্যাক্স। একজন মেরিন সার্জেন্ট দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছে। রেকর্ডিং শুরু হতে দেরি আছে। এর মধ্যে আয়েশ করে খাওয়াটা সেরে নেয়া যাবে।

প্রথমদিন খাবারের মান সম্পর্কে নালিশ জানিয়েছিলেন কোলফ্যাক্স। এরপর থেকে তাঁর পছন্দমতো মেনু এবং রেসিপি অনুযায়ী খাবার রান্না করা হয়। তাঁর একটুখানি মন্তব্য বা পরামর্শও এদের কাছে আদেশের মতো। তাঁকে একটুখানি খুশি করার জন্যে সবাই নিবেদিতপ্রাণ। এই সুযোগটুকু পুরোপুরিই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। সেলটাকে সাজিয়ে নিয়েছেন পছন্দমতো দামি দামি আসবাবপত্র, একটা টেলিভিশন সেট, স্টিরিও, আরও অনেককিছু দিয়ে। প্রতিদিনের সংবাদপত্র আর ম্যাগাজিনগুলো নিয়মিত পৌঁছে যায় তাঁর সেলে।

এককোণে ছোট গোলটেবিলের দুদিকে দুটো চেয়ার রাখা আছে। সার্জেন্ট খাবারের ট্রে-টা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। প্রতিদিনের মতো আজও বলল, 'খাবারের চেহারাটা কিন্তু খুব চমৎকার, স্যার!'

রসিক ছোকরার দিকে তাকিয়ে হাসলেন কোলফ্যাক্স। তারপর চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। রোস্ট বিফ, ম্যাশড পটেটো আর ইয়কশায়ার পুডিং এগুলোই ছিল তাঁর আজকের মেনুতে। খাবারের গন্ধে খিদে পেয়ে গেছে তাঁর। টেবিলের উল্টোদিকের

চেয়ারে বসেল সার্জেন্ট। কোনো কথা না বলে প্লেট থেকে ছুরি আর কাঁটা তুলে নিয়ে একটুকরো মাংস কেটে মুখে পুরে দিল সার্জেন্ট। এটাও মেজর জেনারেল ওয়ালেসের আইডিয়া। কোলফ্যাক্স খাবার আগে অন্য কেউ সেটা চেখে দেখবে, নিরাপত্তার জন্যে। ঠিক প্রাচীন যুগের রাজা-বাদশাদের মতো। সার্জেন্ট একে একে আলু আর পুডিংও মুখে দিল।

'রান্নাটা কেমন হয়েছে, সার্জেন্ট?'

'যদি সত্যিকথা বলার অনুমতি দেন তাহলে বলি, মাংসটা আর একটু ভাজা হলে ভালো হত।'

কোলফ্যাক্স নিজের ছুরি-কাঁটা তুলে নিলেন। মাংসটার ওপরে প্রথমে হামলে পড়লেন। সার্জেন্ট ভুল বলেছে, ভালোভাবেই ভাজা হয়েছে আসলে। আলুটাও বেশ গরম আর মোলায়েম। পুডিংটাও দারুণ হয়েছে খেতে।

ট্রে থেকে মশলার গুঁড়োভর্তি শিশিটা তুলে রোস্ট বিফের ওপর ছিটিয়ে নিলেন বুশম্যান। ঝাল সস ঢেলে নিলেন তার ওপর। ঠিক এভাবেই রোস্ট বিফ থেকে পছন্দ করেন তিনি।

দ্বিতীয় টুকরোটা পেটে চালান করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝলেন কোথাও গণ্ডগোল আছে। মুখের ভেতরটা প্রচণ্ড জ্বলতে শুরু করেছে তাঁর। ধীরে ধীরে জ্বলুনিটা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সারা গায়ে। গলার ভেতরটা অবশ হয়ে এল। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে থাকলেন কোলফ্যাক্স।

শান্ত চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মেরিন সার্জেন্ট। দুহাত গলা চেপে ধরলেন বুশম্যান, প্রাণপণে চেষ্টা করলেন সার্জেন্টকে কিছু বলতে, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। কাটা মাছের মতো তড়পাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ করেই যেন চেয়ারসহ কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। স্থির হয়ে গেল সমস্ত শরীর, চোখদুটো চেয়ে আছে সিলিঙের দিকে, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সার্জেন্ট। তারপর কোলফ্যাক্সের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে চোখের পাতাদুটো টেনে টেনে দেখল। নাহ্! কোনো সন্দেহ নেই, সত্যিই মারা গেছেন তিনি।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট। ছুটতে শুরু ওয়ালেসের রুমের দিকে খবর দিতে হবে। চকচক করছে সার্জেন্টের চোখদুটো।

উনচল্লিশ

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জেনিফার। মেঘ ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। পৃথিবী থেকে কত দূরে চলে এসেছে প্লেনটা! আকাশের কাছাকাছি। যোশুয়ার অনেক কাছে চলে এসেছে ও, ভাবতেই মনটা ভরে গেল। আচ্ছা, প্লেনটা যদি আর কখনও মাটিতে না নামে!

মাইক্রোফোনে ভেসে এল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে।

ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের দুশো ছেচল্লিশ নাম্বার ফ্লাইটটা হিথরোর রানওয়ে স্পর্শ করল। জেনিফারকে নিয়ে এফবিআই এজেন্টরা এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অফিসে না-পৌঁছানো পর্যন্ত কোনো যাত্রীকে সিট ছেড়ে উঠতে দেয়া হল না।

ওকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই জেনিফারের। শুধু বুঝতে পারছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে নিউইয়র্কে। বারবার ও সঙ্গের লোকদুটোকে অনুরোধ করেছে একটা খবরের কাগজ পড়তে দেবার জন্যে। তাহলে অন্তত কিছুটা ধারণা করতে পারত সে। কিন্তু ওরা অনুরোধে কান না দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপেই ব্যস্ত ছিল।

দু ঘণ্টা পর নিউইয়র্কগামী প্লেনে তুলে দেয়া হল ওদের তিনজনকে।

ঠিক একই সময় ফলি স্কোয়ারের ইউনাইটেড স্টেটস কোর্ট হাউসে জরুরি মিটিং শুরু হয়েছে। সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার রবার্ট ডি সিলভা এবং মেজর জেনারেল রয় ওয়ালেস ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন এফবিআই জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের আধাডজন প্রতিনিধি।

'কী করে এমন একটা ঘটনা ঘটল!' রাগে কাঁপছে সিলভারের কণ্ঠস্বর। অগ্নি দৃষ্টিতে ভস্ম করে দিতে চাইছেন জেনারেলকে। 'কোলফ্যাক্স আমাদের কাছে কতটা মূল্যবান ছিলেন, তা ভালোভাবেই বলে দেয়া হয়েছিল আপনাকে।'

দু'হাত দু'দিকে দিয়ে শ্রাগ করলেন ওয়ালেস। 'সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থাই

দেয়া হয়েছিল, স্যার। কিন্তু কীভাবে কখন যে তাঁর খাবারে সায়ানাইড দেয়া হল, সেটাও একটা বিস্ময়। আমরা ইতিমধ্যেই ইনভেস্টিগেশন...'

'আরে, রাখুন আপনার ইনভেস্টিগেশন! কোলফ্যাক্স তো আর বেঁচে উঠবেন না।' হাউমাউ করে উঠলেন ডি সিলভা।

ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি জানতে চাইলেন, 'কোলফ্যাক্সের মৃত্যুতে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে আমাদের?'

'অপূরণীয় ক্ষতি,' গর্জে উঠলেন তিনি। 'একজন সাক্ষীর বক্তব্য আর কাগজপত্রের খতিয়ান-এ দুটোর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। প্রথম শ্রেণীর যে কোনো একজন অ্যাটর্নি সেগুলোকে জাল বলে প্রমাণ করে দিতে পারবে।'

'তাহলে এ মুহূর্তে কী করা উচিত আমাদের?'

'আমরা যা করছিলাম, তাই। কাজ বন্ধ করা যাবে না। জেনিফার পার্কারকে সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ওকে ফাঁসাবার সবরকম চেষ্টাই আমরা করে যাব। আর কিছু না পারি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। মোরেত্তিকে ধরার জন্যে ওকে ব্যবহার করা যেতে পারে কোলফ্যাক্সের বদলে। কী বলেন সিনেটর?'

'মাফ করবেন, মিস্টার সিলভা। আমি একটু অসুস্থ বোধ করছি,' সবার কাছ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দ্রুত কনফারেন্সরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন সিনেটর।

চল্লিশ

লাউডস্পিকারে ভেসে এল স্টুয়ার্ডের কণ্ঠ— 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছি আমরা। গালফ এয়ারের পক্ষ থেকে আপনাদের সাবইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত কোনো যাত্রী আসন ত্যাগ করবেন না। ধন্যবাদ।'

চারদিক থেকে আপত্তি উঠতে শুরু করল। কেউ কেউ রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু করে দিল। পাঁচ মিনিট পর পেছনের দরজা খুলে গেল। ইউনিফর্ম পরা দুজন অফিসার ভেতরে ঢুকল। তাদের দেখে এফবিআই এজেন্ট দুজন উঠে দাঁড়াল।

একজন জেনিফারের দিকে ফিরে বলল, 'আসুন আমাদের সঙ্গে।'

যাত্রীদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ওরা তিনজন। লাউডস্পিকারে আবার শোনা গেল স্টুয়ার্ডের গলা— 'আপনাদের সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান। আপনারা এখন নামতে পারেন।'

এয়ারপোর্টের প্রবেশপথের মুখে একটা সরকারি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। জেনিফারকে নিয়ে সেটাতে উঠে পড়ল এজেন্ট দুজন। প্রথমে ওকে নিয়ে যাওয়া হল একশো পঞ্চাশ পার্ক রোর মেট্রোপলিটান কারেকশনাল সেন্টারে। কিন্তু ওখানকার ডিউটি অফিসার জানালেন, 'দুঃখিত, এঁকে এখানে রাখা হবে না। এইমাত্র একটা অর্ডার এসেছে যেন ভদ্রমহিলাকে রিকার্স আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

রিকার্স আইল্যান্ডে যাবার পথে কারও সঙ্গে কোনো কথা হল না জেনিফারের। গাড়ির পেছনের সিটে দুই এফবিআই এজেন্টের মাঝখানে বসানো হয়েছে ওকে। সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোনো কথা বলছে না এজেন্ট দুজন। যার জন্যে বিপদের মাত্রাটা আঁচ করতে পারছে না জেনিফার। তবে বুঝতে পারছে, বিপদটা গুরুতর। প্রথম সুযোগেই জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে— এটাই

ওর একমাত্র চিন্তা।

রিকার্স আইল্যান্ডে ঢোকার ব্রিজটা পার হচ্ছে গাড়ি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জেনিফার। কতবার এসেছে ও এই পথে মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করতে। আজও এসেছে, কিন্তু উকিল হিসেবে নয়, কয়েদি হিসেবে।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, নিজেকে আশ্বাস দিল জেনিফার, মোরেত্তি ওকে বের করে নিয়ে আসবে খুব শিগগিরই।

দুজন সঙ্গীর সাথে রিসেপশন হলে পৌঁছুল জেনিফার। একজন ওয়ারেন্টটা গার্ডের হাতে দিল। মুখে ওর নামটা উচ্চারণ করল, 'জেনিফার পার্কার।'

গার্ড একনজর দেখল ওয়ারেন্টটা। তারপর জেনিফারের আপাদমস্তক জরিপ করে বলল, 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, মিস পার্কার! ডিটেনশন সেল থ্রি-তে আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'সেলে যাবার আগে একটা টেলিফোন করার অধিকার নিশ্চয় আছে আমার।'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটার দিকে ইশারা করল গার্ড।

রিসিভার তুলে নিল জেনিফার। ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকল, মোরেত্তি যেন এই মুহূর্তে টেলিফোনের পাশেই থাকে।

মোরেত্তি ওর টেলিফোনের অপেক্ষাতেই ছিল। গত চব্বিশ ঘণ্টা এই একটা চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোনো কথা ভাবতেই পারেনি ও। লন্ডনে জেনিফারকে নামানোর পর থেকেই ওর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে মোরেত্তি। কখন হিথরো ছেড়েছে, কখন কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে সবই মোরেত্তির জানা। এ মুহূর্তে রিকার্স আইল্যান্ডের পথে রয়েছে জেনিফার। চোখ বন্ধ করে ওর চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করল মোরেত্তি। সেলে ঢোকার আগে নিশ্চয়ই একটা ফোন করার অনুমতি চাইবে জেনিফার। তারপর মোরেত্তিকে ফোন করবে। মানে মানে ঠিক এটাই চাইছে মোরেত্তি। একঘণ্টার মধ্যেই ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে সে।

অধীর আগ্রহে মোরেত্তি অপেক্ষা করছে—কখন সামনের ঐ দরজাটা দিয়ে জেনিফার এ রুমে ঢুকবে।

অমার্জনীয় অপরাধ করেছে জেনিফার। মোরেত্তির সবচেয়ে বড় শত্রুকে ভালোবেসেছে সে, তার সন্তান গর্ভে ধরেছে, মাঝে মাঝে দেখাও হত ওদের অথচ ব্যাপারটা পুরোপুরিই গোপন করে গেছে সে মোরেত্তির কাছে। এজন্যেই কি ওর ভালোবাসা ফিরিয়ে দিয়েছিল জেনিফার? কী কী তথ্য দিয়েছে সে ওয়ার্নারকে?

নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। অল্পস্বল্প কিছুতে ওয়ার্নার সন্তুষ্ট হবে না। কোলফ্যাক্স আর জেনিফার মিলে ডুবিয়েছে ওকে।

ওয়ার্নারই যে জেনিফারের সন্তানের পিতা, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই মোরেট্টির। ভালোভাবে খোঁজখবর করে দেখেছে সে, বিয়ে করেনি জেনিফার, অন্য কোনো লোকের সঙ্গে সামান্যতম ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। প্রথম থেকেই ওকে মিথ্যে বলে এসেছে মেয়েটা।

তবে, এ মুহূর্তে দারুণ একটা অস্ত্র আছে মোরেট্টির হাতে। যার এক ঘায়েই ওয়ার্নারকে কুপোকাৎ করা যাবে। জেনিফারের সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে সহজেই ব্ল্যাকমেইল করা যাবে ওয়ার্নারকে। কিন্তু এতে বিপদ আসবে অন্যদিক থেকে। যখন অন্যান্য মাফিয়া-পরিবারগুলো জানতে পারবে যে মোরেট্টির কাউন্সেলর জেনিফার সিনেটরের ভূতপূর্ব শয্যাসঙ্গিনী, তখন মোরেট্টি পরিণত হবে সবার হাসির পাত্রতে। ইতিমধ্যেই গুজব রটে গেছে, মোরেট্টি জেনিফারের প্রেমে পড়েছে। সিনেটরের সঙ্গে জেনিফারের সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে গেলে পরিবারের কর্তৃত্ব হারাবে মোরেট্টি। ডনও হতে পারবে না সে কোনোদিন। সুতরাং ব্ল্যাকমেইলের ব্যাপারটা নিজের স্বার্থেই কার্যকর করতে পারবে না ও।

অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

টেবিলের ওপরে বিছানো হাতে-আঁকা ম্যাপটার দিকে মন দিল মোরেট্টি। আজ সন্ধ্যায় ওয়ার্নার একটা ব্যক্তিগত ফান্ড-রেইজিং ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে যাবেন— এটা তারই রুট। এই ম্যাপটা হাতে পাবার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করতে হয়েছে মোরেট্টিকে। তাতে দুঃখ নেই ওর। কারণ, আসলে তো এটা ওয়ার্নারের জীবনের দাম। মাত্র পাঁচ হাজার ডলারে মোরেট্টি কিনে নিয়েছে ওয়ার্নারের জীবন।

ওকে চমকে দিয়ে টেলিফোনটা তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। খপ্ করে তুলে নিল রিসিভারটা। জেনিফার। প্রথমে কথাই বলতে পারল না মোরেট্টি, প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে সে। মনে হচ্ছে যেন হৃদয়টা ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এ-ধরনের আবেগের সঙ্গে কখনও পরিচয় ঘটেনি ওর, তাই আশ্চর্য হয়ে গেছে নিজেই। এ কী হচ্ছে ওর!

'মাইকেল, তুমিই ধরেছ তো?' দ্বিতীয়বার জানতে চাইল উত্তেজিত জেনিফার।

'হ্যাঁ, জেনিফার। আমিই। তা তুমি এখন কোথায়? ফোন করেছ কোত্থেকে?' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল মোরেট্টি।

'আমাকে গ্রেফতার করে রিকার্স আইল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মাইক,

তুমি আমার জামিনের ব্যবস্থা করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না...' ভেঙে পড়ল জেনিফার।

'এক্ষুনি তোমাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসছি, জেনিফার। শুধু স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করো। ঠিক আছে?'

'জিনোকে পাঠাচ্ছি তোমাকে নিয়ে আসার জন্যে।'

জেনিফার লাইন কেটে দেবার পর একটা নাম্বারে ডায়াল ঘোরাল মোরেত্তি। কয়েক মিনিট কথা বলল। 'যত টাকা জামিন লাগুক, ওকে জেলের বাইরে দেখতে চাই আমি,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

ডেস্কের এককোণে একটা বোতামে চাপ দিল মোরেত্তি। জিনো গ্যাল্লো দরজা ঠেলে ঘরে পা দিল।

'জেনিয়ার পার্কার রিকার্স আইল্যান্ডে আছে। এক বা বেশি হলে দুঘণ্টার মধ্যে জামিনে ছাড়া পাবে ও। ওখান থেকে ওকে তুলে সোজা এখানে নিয়ে আসবে।'

'ও কে, বস্।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল মোরেত্তি। 'ওকে বোলো, আজকের পর থেকে ওয়ার্নারকে নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না।'

খুশি হয়ে উঠল দৈত্যাকার জিনো। 'সত্যি!'

'সত্যি। সন্ধ্যায় এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে যাবে ওয়ার্নার। কিন্তু ওখানে কোনোদিনই পৌঁছুতে পারবে না। নিউ কানানের ব্রিজে একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাবে ওয়ার্নার।

হাসি কানে গিয়ে ঠেকল জিনোর। 'ওহ্! দারুণ ব্যাপার!'

মোরেত্তি দরজার দিকে ইশারা করল, 'তাড়াতাড়ি যাও।'

জেনিফারের জামিন ঠেকানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন ডি সিলভা।

'ইওর অনার,' সিলভা বললেন। 'আসামির বিরুদ্ধে খুন ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গিয়েছিল সে, তাকে ধরে আনা হয়েছে সেখান থেকেই। জামিনে ছাড়া পেলে নিঃসন্দেহে আবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। সুতরাং আমি আদালতকে অনুরোধ করছি যেন তার জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়।;'

জন লেস্টার, জেনিফারের উকিল, বললেন, 'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ভুল তথ্য দিয়েছেন। ইওর অনার, আমার মক্কেল কখনও কোথাও পালিয়ে যায়নি। ব্যবসার কাজেই সে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল। সরকার যদি তাঁকে ফিরে আসতে বলত, তবে নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছেয় ফেরত আসত। তা না করে অপমান করা হয়েছে তাকে।

যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা রয়েছে তার, সে দেশের নামকরা একজন আইনজীবী। সুতরাং পালিয়ে যাবার মতো ছেলেমানুষি মনোবৃত্তি তার থাকতে পারে না।'

তিরিশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বাদানুবাদ চলল। অবশেষে জাজ ঘোষণা করলেন জামিন মঞ্জুর করা হল, জামিনের-পরিমাণ ধার্য হল পাঁচ লাখ ডলার।

পনেরো মিনিট পরে জিনো গ্যাল্লোর সঙ্গে মার্সিডিস লিমুজিনে উঠল জেনিফার।

ওর মন এখন অন্যদিকে। সিঙ্গাপুরে ছিল বলে আসল খবর কিছুই জানে না ও। তবে বুঝতে পেরেছে, ও একা নয়, বিপদে পড়েছে মোরেট্টিও। ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে মনটা আনচান করছে। সি ডিলভা কীভাবে এত নিশ্চিত হলেন যে জেনিফার সত্যিই খুন করেছে? কেন...

'...অ্যাডাম ওয়ার্নার...' জিনোর বলা এই দুটো শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠল জেনিফার। বকবক করে যাচ্ছিল এতক্ষণ জিনো, একটা কথাও শুনছিল না জেনিফার। কী বলছে সে জিমের সম্বন্ধে?

'কী বলছ তুমি, জিনো?'

একটু অবাক হল জিনো। 'আমি বলছিলাম যে আজ থেকে সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নারের কথা আমাদেরকে আর চিন্তা করতে হবে না। মাইকেল ওর ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল জেনিফারের। 'কী বলছ! কখন?'

স্টিয়ারিং থেকে হাতটা সরিয়ে কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখে নিল জিনো। 'এই তো আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই। ব্যাপারটা দুর্ঘটনার মতো করে সাজানো হবে।'

গলা শুকিয়ে গেছে জেনিফারের। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। 'কোথায়...' কীভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছে না ও। 'মানে...কোথায় ঘটানো হবে দুর্ঘটনাটা?'

'নিউ কানানে। ব্রিজের ওপর।'

কুইনসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। সামনেই দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট শপিং সেন্টার।

'জিনো, গাড়িটা একটু থামাবে? দুএকটি টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে।'

'অবশ্যই!' শপিং সেন্টারের পার্কিং লটে ঢুকিয়ে দিল ও গাড়িটাকে।

গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল জেনিফার। ব্যাগ খুলে দেখল কয়েকটা সিঙ্গাপুরি কয়েন ছাড়া কোনো ভাংতি পয়সা নেই। এক ডলারের নোট ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিল সে। মুঠোভর্তি কয়েন নিয়ে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে দেখল, এক বৃদ্ধা মহিলা ইতিমধ্যেই ডায়াল করতে শুরু

করেছেন।

'দেখুন, আমার একটু জরুরি দরকার...' কথা শেষ করতে পারল না জেনিফার।

ওর দিকে তাচ্ছিলের দৃষ্টি বুলিয়ে ততক্ষণে কথা বলতে শুরু করেছেন মহিলা। 'হ্যালো, টিপসি? আমার রাশিতে যা বলা হয়েছিল, তা একদম মিলে গেছে। যা বাজে একটা দিন গেল! দোকানে গিয়ে দেখি, আমার সাইজের একমাত্র জুতোজোড়া বিক্রি করে দিয়েছে ব্যাটারা। একটা দিন অপেক্ষা করল না!'

রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগল জেনিফার। ইচ্ছে হল, মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়।

কিন্তু পারল না। বরং ভদ্রভাবে বলল, 'দয়া করে...'

'এটা কি তোমার বাড়ির ফোন?' জেনিফারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার গল্পে মশগুল হয়ে গেলেন তিনি। 'তোমার কি মনে আছে সেই সোয়েডের জুতোটার কথা? গত মাসে যেটা...'

অসহ্য! চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে থাকল জেনিফার। ওয়ার্নারের যেন কোনো ক্ষতি না হয়!

কতক্ষণ পর জানে না, মহিলার তিরস্কারের চমক ভাঙল ওর। 'শুধু তোমাকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে আরও একটা ফোন করা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ভাংতি পয়সা আর নেই আমার সঙ্গে। বেঁচে গেলে তুমি,' চোখের আগুনে ওকে ভস্ম করে দেবার চেষ্টা করতে করতে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

জেনিফার হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেলিফোনটার ওপর।

দুমিনিট পরে শোনা গেল ওয়ার্নারের সেক্রেটারির গলা। 'দুঃখিত, সিনেটর এক্ষুনি বেরিয়ে গেছেন।'

'আপনি কি বলতে পারেন, এ-মুহূর্তে কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে?'

'না, দুঃখিত। যদি কোনো ম্যাসেজ...'

জেনিফার রিসিভারটা আছড়ে ফেলল ক্রেডলে।

চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে চেষ্টা করল জেনিফার। পাঁচ সেকেন্ড পর একটা আইডিয়া মাথায় এল। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল একটা বিশেষ নাম্বারে।

'ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস?' থরথর করে কাঁপছে ওর সারা শরীর।

'জ্বী। কিন্তু উনি তো কনফারেন্স রুমে...'

'দেখুন। এটা সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপার। আমি অ্যাটর্নি জেনিফার পার্কার বলছি। শিগগির তাকে খবর দিন।'

জেনিফারের কণ্ঠস্বরেই সেক্রেটারি বুঝতে পারল ব্যাপারটা কত জরুরি। একটু

ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

ঠিক এক মিনিট পর সিলভারের গলা শোনা গেল। 'ইয়েস?' প্রায় ধমকে উঠলেন তিনি।

পাত্তা দিল না জেনিফার। 'শুনুন,...একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সিনেটর ওয়ার্নার আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন হতে যাচ্ছেন। নিউ কানানের ব্রিজে ঘটবে ঘটনাটা।'

আর কোনো কথা না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল জেনিফার। এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না ওর।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সবার দিকে তাকালেন ডি সিলভা। 'পাগলের কাণ্ডকারখানা!'

একজন জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার?'

'জেনিফার পার্কার। বলছে, সিনেটর ওয়ার্নারকে নাকি কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন করা হবে।'

কেন সে এ-তথ্যটা দিতে গেল?'

'কে জানে!'

'আপনি কি ভাবছেন যে তথ্যটা ভুল?'

'তা হবে কেন? জেনিফার পার্কার না-জেনে কিছু বলে না,' রাগতস্বরে বললেন ডি সিলভা।

মোরেট্টির অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল জেনিফার। আরও একবার ওর রূপ দেখে মুগ্ধ হল মোরেট্টি। প্রতিবার এই একই অনুভূতি হয় ওর। জেনিফার এত সুন্দর! সারাজীবনে কোথাও এত রূপ দেখেনি ও।

কিন্তু ওর ভেরতটা! সাপের চেয়েও জঘন্য!

'ওহ্! মাইকেল! তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে আমার। ব্যাপার কী?'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি, জেনিফার,' একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোরেট্টি।

একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল জেনিফার। 'খুলে বলো তো, কী হচ্ছে এখানে!'

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ঘৃণায় রিরি করে উঠল মোরেট্টির অন্ত র।

কোনো উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেন ওরা আমাকে গ্রেফতার

করে নিয়ে এল? তুমি কি কিছু জানো?'

অবশ্যই! কেন জানব না? ওদেরকে সব তথ্য তো জানানো হয়নি এখনও। সেগুলো জানাতে হবে না? মনে মনে ভাবল মোরেট্টি।

ওর শীতল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে টের পেল জেনিফার, কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। 'কী ব্যাপার, মাইক? তুমি ঠিক আছ তো?'

'ঠিক আছে মানে? এত ভালো আর কখনও বোধ করিনি!' চেয়ারে হেলান দিল মোরেট্টি। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'মানে?' জেনিফার এমন ভাব দেখাল, যেন কিছুই জানে না ও।

'সিনেটর ওয়ার্নার একটা দুর্ঘটনায় পড়তে যাচ্ছেন,' কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল মোরেট্টি। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ফোন আশা করছি।'

মোরেট্টির কথা বলার ভঙ্গি, হাবভাব, আর শীতল দৃষ্টি কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিল জেনিফারের মনে। ওর ইচ্ছে হল একছুটে ওখান থেকে পালিয়ে যায় কোথাও।

উঠে দাঁড়াল জেনিফার। 'আমি এখনও বাড়ি যাইনি। সবকিছু গোছগাছ করে...'

'বসো!' ধমকে উঠল মোরেট্টি।

শিরশিরে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। কলের পুতুলের মতো ধপ করে আবার বসে পড়ল জেনিফার। দরজার দিকে চোখ গেল। পিঠ দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে জিনো গ্যাল্লো। নিস্পাপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে জেনিফারের দিকে।

'তুমি এখান থেকে কোথাও যাচ্ছ না,' শান্তভাবেই বলল মোরেট্টি।

'কিন্তু আমি কিছুই...'

'চুপ! আর একটা কথাও নয়।'

চুপচাপ একে অন্যের দিকে নিস্পলক চেয়ে রইল দুজন। অপেক্ষা করছে। দেয়ালঘড়ির মৃদু টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। ঘড়িটার গলা টিপে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে জেনিফারের।

মোরেট্টির চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করল জেনিফার। কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে চারদিকে। কিন্তু সেখানে কোনোকিছু লেখা নেই। ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ।

টেলিফোনের শব্দে কেঁপে উঠল জেনিফার।

ঝট করে রিসিভার তুলে নিল মোরেট্টি। 'হ্যালো?...তুমি কি নিশ্চিত?...ঠিক আছে,' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিউ কানানের

ব্রিজটা পুলিশে ছেয়ে গেছে।'

এতক্ষণের চেপে রাখা দুশ্চিন্তা একটা মাত্র নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল, মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ জানাল জেনিফার। হঠাৎ লক্ষ করল, মোরেত্তি ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে আবেগটা গোপন করতে চেষ্টা করল সে। 'এর মানে কী?'

'কিছুই না। কারণ ওয়ার্নারকে ওখানে হত্যা করার কোনো প্ল্যান আমার ছিল না।'

একচল্লিশ

ওয়ার্নারের লিমুজিনটা এ-মুহূর্তে পার্থ এমবয়তে রয়েছে, ছুটছে ডানদিকের ব্রিজের উদ্দেশে। নিউ কানান এখনও বেশ দূরে।

পেছনের সিটে বসেছেন ওয়ার্নার। পাশে একজন, আর সামনে দুজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

ক্লে রেডিন সিনেটরের ডিউটিতে বহাল হয়েছে ছয়মাস আগে। ইতিমধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার একটা ধারণা হয়ে গেছে ওর। দেবতার মতো ভক্তি করে ও সিনেটরকে। দেশের আগামী প্রেসিডেন্ট যে তিনিই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর। সিনেটরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ওর ওপর। প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও দ্বিধা নেই। কিন্তু মনে মনে ও জানে, তেমন পরিস্থিতি কোনোদিন আসবে না।

পাশে বসা সিনেটরের দিকে তাকাল সে। আজ সারাদিনই তাকে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে। সদাহাস্যময় সিনেটর আজ খুব কম কথা বলেছেন। কী হয়েছে তাঁর?

সত্যিই ওয়ার্নারের মনমেজাজ ভালো নেই আজ। ডি সিলভা তাঁকে ফোনে জানিয়েছেন, জেনিফারকে গ্রেফতার করে সেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি কিছুতেই চিন্তা করতে পারছেন না, পশুর মতো আটকে রাখা হয়েছে জেনিফারকে একদল গুণ্ডাপাণ্ডার মধ্যে!

সামনের সিটের একজন এজেন্ট পেছন ফিরে বলল, 'আমরা সময়মতোই আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছে যাব, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

মিস্টার প্রেসিডেন্ট! মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে গেল তাঁর। এরা পেয়েছে কী? সবাই ধরে নিয়েছে যে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েই গেছেন! অথচ একটা মানুষের জীবনে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক ব্যাপার থাকতে পারে, তা কি এরা জানে না?

ছোট্ট একটা ব্রিজ দেখা গেল সামনে। সবাই টুইন ব্রিজ বলে। কারণ এর একটু পরেই আছে ঠিক এরকম দেখতে আরেকটা ব্রিজ।

মেইনরোড ছাড়াও একটা সাইডরোড এসে মিলেছে ব্রিজটার গোড়ায়, সেখানে

দাঁড়িয়ে আছে ট্রেলারওয়ালা দৈত্যের মতো বিশাল এক ট্রাক। লিমুজিনটা কাছে আসতেই স্টার্ট নিল ট্রাক, চলতে শুরু করল ধীরে ধীরে। ফলে একইসঙ্গে ব্রিজে উঠে পড়ল লিমুজিন আর ট্রাকটা।

সিক্রেট সার্ভিসের ড্রাইভার গতি কমিয়ে দিয়ে ব্রেক করল। 'ব্যাটা কি গাধা নাকি!'

ঠিক এ সময় গাড়িতে ফিট করা শর্টওয়েভ রেডিওটা চিৎকার করে উঠল, 'বিকন ওয়ান! কাম ইন, বিকন ওয়ান!'

ড্রাইভারের পাশের এজেন্ট ঝট করে তুলে নিল ট্র্যান্সমিটার। 'দিস ইজ বিকন ওয়ান।'

ট্রাকটা আবার ওদের সমান্তরালে চলে এসেছে। ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যেতে চাইল। কিন্তু ট্রাকটাও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্রমেই চেপে আসছে লিমুজিনের দিকে।

'ব্যাটার মতলব কী?' ঘাম দেখা দিয়েছে ড্রাইভারের কপালে।

আবার সচল হয়ে উঠল স্পিকার। 'আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে একটা জরুরী ফোন পেয়েছি। ফক্স ওয়ান বিপদের মধ্যে আছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?'

কোনোরকম আভাস না দিয়ে হঠাৎ ডানদিকে চেপে ড্রাইভারের দরজার ওপর ধাক্কা মারল ট্রাকটা। সঙ্গে সঙ্গে এজেন্ট তিনজন তাদের অস্ত্র বের করে ফেলল।

'মাথা নামান!' চিৎকার করে উঠল ক্লে সিনেটরের উদ্দেশে। হেঁচকা টানে তাঁকে গাড়ির মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল।

সামনের দুজন গুলি করল। কিন্তু ট্রাকের ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না, জানালাটা সিল করা।

আর একবার লিমুজিনের পেটে গুঁতো মারল ট্রাক। ব্রিজের রেলিঙের সাথে আটকে গেল গাড়ি। আরও চেপে এসেছে ট্রাকটা। দুশো ফুট নিচে রারিটান নদীর বরফঠাণ্ডা জল অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

ড্রাইভারের পাশে বসা এজেন্ট খাবলা মেরে তুলে নিল রেডিও মাইক্রোফোনটা। 'দিস ইজ বিকন ওয়ান! মে ডে! মে ডে! কাম ইন অল ইউনিটস!'

কিন্তু প্রত্যেকেই ওরা জানে, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন আর কিছুই করার নেই।

আরেকটা ধাক্কায় কেঁপে উঠল স্টিলের তৈরি রেলিং। লিমুজিনের সামনের ডান দিকের চাকাটা চলে গেছে ব্রিজের বাইরে। কতক্ষণ টিকবে এই পলকা রেলিং!

মৃত্যুর এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন যেন ওয়ার্নারের মনে হল,

জেনিফারের সন্তানের পিতা তিনি নিজেই। হঠাৎ এই আবিষ্কারে এত খুশি হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত অন্তর যে মৃত্যুকেও খারাপ মনে হল না।

শান্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন ওয়ার্নার।

আরেকটা ধাক্কায় কড়মড় আওয়াজ করে ভেঙে গেল রেলিং, ব্রিজের বাইরে আরও সরে এসেছে গাড়িটা। বলতে গেলে ঝুলছে শূন্যে। এখনও কেন পড়ে যায়নি, সেটাই বিস্ময়।

হঠাৎ মাথার ওপর হেলিকপ্টারের গুঞ্জন শুনতে পেল ওয়ার্নার। ইচ্ছে থাকলেও একচুল নড়ল না কেউ। ভারসাম্য হারালেই নিচে গড়িয়ে পড়বে লিমুজিন।

মেশিনগানের গুলির শব্দ ভেসে এল। হঠাৎ করেই থেমে গেল ট্রাকের গতি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল গোবেচারার মতো।

মাথার ওপরে গোল করে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। যদিও দেখা যাচ্ছে না, শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে।

বহুদূর থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। তিন মিনিট পরে অসংখ্য পুলিশের গাড়িতে ভরে গেল ব্রিজটা। আরও কিছুক্ষণ পর লিমুজিনের গায়ের ওপর থেকে আস্তে আস্তে ট্রাকটা সামনে এগিয়ে গেল। পুলিশের ট্রেইন্ড ড্রাইভার এত সাবধানে কাজটা সারল যে লিমুজিনটা টেরও পেল না।

জানালায় একজন পুলিশের চেহারা দেখা গেল। 'দরজাগুলো জ্যাম হয়ে গেছে। কিছুতেই খোলা যাবে না। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, সিনেটর, তবে জানালা দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হবে আপনাকে।'

লিমুজিনের ভারসাম্য এতটুকুও নষ্ট না করে যত্নের সঙ্গে ওয়ার্নারকে বের করে নিয়ে এল তারা। তারপর অন্য তিনজনকেও।

পুলিশ ক্যাপ্টেন দৌড়ে এলেন, 'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার?'

ওয়ার্নার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত লিমুজিনটার দিকে চাইলেন, তারপর চোখ ফেললেন অনেক নিচে বয়ে যাওয়া নদীর ঠাণ্ডা কালো জলের দিকে।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'আমি ঠিকই আছি।'

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল মোরেট্টি। 'এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে,' জেনিফারের দিকে ফিরল। 'তোমার শয্যাসঙ্গী এখন নদীর জলে খাবি খাচ্ছে।'

রক্ত সরে গেছে জেনিফারের মুখ থেকে। 'তুমি কিছুতেই...'

'চিন্তা কোরো না, তোমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে,' জিনোর দিকে ফিরে তাকাল মোরেট্টি। 'তুমি কি জেনিফারকে বলেছ যে নিউ কানানে দুর্ঘটনায় পড়ে যাচ্ছেন সিনেটর?'

'আপনি যা যা বলতে বলেছেন, ঠিক তা-ই বলেছি আমি।'

জেনিফারের দিকে সরাসরি তাকাল মোরেত্তি। ঠাণ্ডা দৃষ্টি তার চোখে। বিচার শেষ।

উঠে এসে আচমকা জেনিফারের গায়ে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে থাপ্পড় মারল। একটুও নড়ল না জেনিফার। আবার মারল। আবার।

আর সহ্য করতে পারল না জেনিফার। কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। ওর শার্টের কলার ধরে আবার টেনে তুলল মোরেত্তি। 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম,' ফিসফিস করে জেনিফারের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল সে।

আবার মারল।

পড়ে গেল জেনিফার। নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। আবার ওকে টেনে তুলল মোরেত্তি। মুখে বলল, 'দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। আমরা এক জায়গায় যাচ্ছি।'

জিনো দৌড়ে এল। 'ওকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন, বস্। এ যে মারা পড়বে!'

'না। তুমি গাড়িটাকে পেছনের দরজায় নিয়ে যাও। ওখানেই অপেক্ষা করো।'

'ঠিক আছে, বস্,' বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেল জিনো।

ওরা দুজন রুমে একা।

'কেন, জেনিফার?' জানতে চাইল মোরেত্তি। 'আমার গোটা পৃথিবীটাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমি, আর তাকে তুমি আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিলে? কেন?'

উত্তর দেবার মতো অবস্থা নেই জেনিফারের। টলছে ও। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট।

প্রচণ্ড জোরে ওকে ঝাঁকাল মোরেত্তি। 'ওই একই নদীতে প্রেমিকের কাছে পাঠাচ্ছি তোমাকে। ওখানে তাকে ভালোভাবেই সঙ্গ দিতে পারবে।'

জিনো দরজা ঠেলে ঢুকল পাগলের মতো। 'বস! বাইরে...'

প্রচণ্ড শব্দে কী যেন ভেঙে পড়ল বাইরে। জেনিফারকে ছেড়ে ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করে নিল মোরেত্তি। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। অস্ত্র হাতে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল দুজন ফেডারেল এজেন্ট। 'ফ্রিজ!'

এক সেকেন্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল মোরেত্তি। ঘুরে দাঁড়িয়ে কার্পেটে শোয়া জেনিফারকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুড়ল ও। এজেন্ট দুজন গুলি করার ঠিক এক সেকেন্ড আগে মোরেত্তির চোখের সামনে গুলি দুটো ঢুকল জেনিফারের শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের ধাক্কা খেল মোরেত্তি। পরপর দুবার। পড়ে যেতে যেতে ও ভাবল কেন এত কষ্ট হচ্ছে ওর— জেনিফারের জন্যে, নাকি ওর নিজের জন্যে! আরও একটা বুলেট এসে ঢুকল ওর ডান চোখে।

বেয়াল্লিশ

অপারেটিং রুম থেকে জেনিফারকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে আসা হয়েছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম-পরা একজন পুলিশ। হাসপাতালের করিডোরে পুলিশ, ডিটেকটিভ আর রিপোর্টারদের ভিড়।

করিডোরে এসে ঢুকলেন সিনেটর অ্যাডাম ওয়ার্নার। চারদিকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের বেষ্টনী।

একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন। 'এদিকে, সিনেটর,' একটা ছোট অফিস রুমে নিয়ে এলেন তাঁকে।

'ও কেমন আছে?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'আশাবাদীদের দলে নেই আমি। ওর শরীর থেকে দুটো বুলেট বের করা হয়েছে।'

রবার্ট ডি সিলভা ঢুকলেন অফিস রুমে। সিনেটরকে দেখে তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোথাও আঘাত পাননি আপনি।'

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, মিস্টার সিলভা। কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে?'

'জেনিফার পার্কার ফোনে বলেছিল আমাকে। অবশ্য ও নিউ কানান ব্রিজের কথা বলেছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে দুর্ঘটনাটা অন্য কোথাও ঘটবে। আমাদেরকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে চেয়েছিল হয়তো।' সিনেটরের মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন। 'অবশ্য পরে আমার ভুল ভেঙে যায়। মোরেট্টিই একটা চাল চেলেছিল জেনিফারকে ফাঁদে ফেলে। তবে সাবধানের মার নেই, নিউ কানান ব্রিজেও পুলিশবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তারপর আপনার রুটে দুটো হেলিকপ্টার পাঠিয়েছিলাম নজর রাখার জন্যে। ধন্যবাদটা আমাকে না দিয়ে জেনিফারকেই দেয়া উচিত,' ডাক্তারের দিকে ফিরলেন ডি সিলভা। 'ওর বেঁচে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'বলতে গেলে শূন্য।'

অনুতপ্ত চোখে সিনেটরের দিকে তাকালেন ডি সিলভা। 'জেনিফারের প্রতি অবিচার করেছি আমরা। ওর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ইতিমধ্যেই তুলে নেয়া হয়েছে। অবশ্য চাইলেও কেউ ওর অপরাধ প্রমাণ করতে পারত না। কোলফ্যাক্স, মোরেত্তি— দুজনেই মৃত। আসলে, মেয়েটা অবস্থার শিকার। আমার ধারণা ওকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে।'

সিনেটরের বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল। 'আমি জেনিফার পার্কারকে একবার দেখতে চাই।'

একটু ইতস্তত করে রাজি হলেন ডাক্তার। 'মেয়েটা এখনও কোমাতে আছে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

ডাক্তারের পেছন পেছন ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চলে এলেন সিনেটর।

দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে যেতে দিলেন ডাক্তার। 'তিন নাম্বার রুমে আছে ও।'

দ্রুত এগোলেন ওয়ার্নার।

সাদা বালিশের ওপর ছড়িয়ে থাকা কালো চুলের ফ্রেমে পাণ্ডুর মুখটা বন্দি। বন্ধ চোখের কোলে কেমন যেন বিষণ্নতার ছায়া। একটা বাচ্চামেয়ের মতো দেখাচ্ছে জেনিফারকে। নিষ্পাপ, অসহায়।

অনেক কথা মনে পড়ে গেল ওয়ার্নারের। অনেক দিনের স্মৃতি!

জোর করে ডাক্তারের দিকে মুখ ফেরালেন। 'যদি...মানে...কিছু একটা ঘটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।'

'অবশ্যই, সিনেটর।'

শেষবারের মতো জেনিফারকে দেখলেন ওয়ার্নার। নীরবে মনে মনে বিদায় জানালেন। তারপর বেরিয়ে এসে রিপোর্টারদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

অনেক পরে...ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকল জেনিফার। মনে হচ্ছে, চারপাশে কারা যেন কথা বলছে— অনেক দূর থেকে। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারা ওরা?

মনে হচ্ছে, যেন গভীর পানির নিচে আছে ও। আরে! নিচে তো নয়! অ্যাডামের সঙ্গে নৌকোয় ভাসছে ও। হঠাৎ স্কি করে ওদেরকে ধাওয়া করতে শুরু করল মোরেত্তি। পালাচ্ছে! পালাচ্ছে ওরা! আরে, মোরেত্তি নয়, এ যে যোশুয়া! মায়ের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে হাত নাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। আকাশ বাতাস চমকে উঠল জেনিফারের চিৎকারে। যোশুয়া উল্টে পড়ে

যাচ্ছে...পড়ে যাচ্ছে...বিরাট একটা ঢেউ এসে ঢেকে দিল যোশুয়ার ছোট্ট দেহটা।

হঠাৎ করেই জেগে উঠল জেনিফার।

যোশুয়া নেই!

অ্যাডাম নেই!

মোরেট্টি নেই!

একা। সম্পূর্ণ একা জেনিফার।

তেতাল্লিশ

জানুয়ারির এক হিমেল সকালে যুক্তরাষ্ট্রের বেয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিচ্ছেন অ্যাডাম ওয়ার্নার। অনুষ্ঠানে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী মাথায় দামি একটা সেবল হ্যাট পরে এসেছেন, সাজসজ্জা মূল্যবান, কিন্তু অনাড়ম্বর। যে সেবল কোটটা তিনি পরেছেন, তাতে প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো দেখতে সাত বছরের মেয়েটা। দুজনে গর্বের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছে, শপথ নিচ্ছে অ্যাডাম ওয়ার্নার। শুধু এই দুজন নয়, সারা দেশের লোক এই গর্বের অংশীদার।

ওয়াশিংটনের কেলসো'র ছোট একটি ল অফিসে বসে আছে জেনিফার পার্কার। একা। টিভিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান দেখছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত দেখল ও। অ্যাডাম, মেরী বেথ এবং সামান্থা স্টেজ ছেড়ে চলে গেল।

টিভির সুইচ অফ করে দিল জেনিফার। যেন অতীতটাকে সুইচ অফ করে দিয়েছে ও। ওর জীবনে যা ঘটেছে সব বন্ধ করে দিয়েছে। ভালোবাসা, মৃত্যু, আনন্দ এবং বেদনা। কোনও কিছু ওকে ধ্বংস করতে পারেনি। ও একজন সারভাইভার।

হ্যাট এবং কোট রেখে অফিসের বাইরে চলে এল জেনিফার। তাকাল সাইনবোর্ডের দিকে *জেনিফার পার্কার, অ্যাটর্নি অ্যাট ল।* জুরির কথা মনে পড়ল যিনি ওকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছেন। ও এখনও একজন আইনজীবী, ওর বাবাও তা-ই ছিলেন। জেনিফার সবসময় সত্যের পক্ষে থাকবে। ঘুরল ও, পা বাড়াল কোর্ট হাউজে।

দমকা হাওয়া বইছে। জনশূন্য রাস্তা। ধীর পায়ে হাঁটছে জেনিফার। হালকা তুষার ঝরছে, পৃথিবীটাকে মুড়ে দিচ্ছে শিফনের ঘোমটায়। কাছের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে ভেসে এল উল্লাসধ্বনি। বড্ড অপরিচিত শোনাল শব্দটা। আওয়াজ শোনার জন্য একটু থেমে দাঁড়াল জেনিফার। শক্ত করে বাঁধল কোট। তারপর কদম ফেলে চলতে লাগল। দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের বরফের পর্দায়, যেন ভবিষ্যৎটাকে দেখতে চাইছে জেনিফার।

কিন্তু ও দেখছে অতীত, বুঝবার চেষ্টা করছে কবে সকল হাসি-আনন্দের অপমৃত্যু ঘটল।
